ওঁ

সাধন-সহায়

লেখক ঃ

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ—
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

অহং হরিঃ, সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো, নান্যত্ততঃ কারণ-কার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্ মনো যস্য, ন তস্য ভূয়ো, ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বরোগা ভবন্তি॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ১-২২৫-৮

প্রকাশক—
শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন, এম-এ (ডবল), এম-ডি-এইচ্, এম-আর-এ-এস,
জ্যোতির্ভূষণ, জ্যোতিবিদ্যার্ণব, তন্ত্রাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদবাচস্পতি,
সদস্য ও পরীক্ষক—ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অফ
আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট।

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—৩

তৃতীয় সংস্করণ | মাঘ ১৩৬০

ধর্ম্মাবতার বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

—প্রিয় বাক্য বলিবার লোক অনেকই পাওয়া যায়, কিন্তু হিতকর অপ্রিয় বাক্যের বক্তাও বিরল, শ্রোতাও বিরল।

সাধন-সহায়

বৈরাগ্যোপরতির্যত্র প্রেম-নির্ব্বাণ-বৃংহিতম্।
বৈভবঞ্চ সদা দেবি সা ভক্তিঃ পরিগীয়তে॥
—পীঠমালাতন্ত্রে।

লেখক—
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্কর তীর্থ জীউ মহারাজ

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে।

প্রকাশক—
শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন, এম-এ (ডবল), এম-ডি-এইচ,এম-আর-এ-এস,
জ্যোতির্ভূষণ, জ্যোতির্বিদ্যার্ণব, তন্ত্রাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদ-বাচস্পতি,
সদস্য ও পরীক্ষক—ষ্টেট ফ্যাকাল্‌টি অফ
আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট।

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥"

(দেবীভাগবত)

—ষড়ঙ্গসমন্বিত বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও যদি কেহ আচার-বর্জিত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বেদও তাঁহাকে পবিত্র করেন না। জাতপক্ষ বিহগ-শিশু যেমন মাতৃকুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অধীত বেদরাশিও মৃত্যুকালে এই অনাচারী বেদপাঠীকে পরিত্যাগ করেন।

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান—

১। প্রকাশক,
৩০নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

২। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-টি,
সহাধ্যক্ষ, রামদয়ালু ডিগ্রী কলেজ,
মুজঃফরপুর (বিহার)।

৩। শ্রীমিহিরকুমার সেন, এম-এ,
অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ,
কলিকাতা।

৪। শ্রীসুধেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ, এম-এ,
১।২, হাজি জ্যাকেরিয়া লেন,
মাণিকতলা, কলিকাতা।

৫। শ্রীসরোজকুমার রায়,
ফ্যাশান হাউস, মোতিঝিল,
মুজঃফরপুর।

৬। শ্রীনরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
দম্ দম্ পুস্তকালয়,
নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮।

মুদ্রাকর—
গোপাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রেমকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৯৬, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

সরকারী বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক, বহুকুটুম্বপালক, উদারচরিত্র ও পরোপকারব্রতী স্বর্গীয় তারকনাথ সেন মহাশয়ের কন্যা ; প্রখ্যাতনামা ইংরাজীর 'নোট' লেখক, 'বিদ্যাসাগর কলেজের' ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীমনিমোহন সেন, ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত এফ-এ এবং 'বাঙ্গালোর সরকারী এয়ার ক্র্যাফ্‌টের' জেনারেল ম্যানেজার স্বর্গীয় মোহিতকুমার সেন, প্রবীণ ডাক্তার শ্রীসুধীর কুমার সেন, ভারত সরকারের সহকারী রাষ্ট্রদূত শ্রীপঙ্কজ কুমার সেন, প্রভৃতির ভগ্নী ; এবং পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভার-সিয়ার আমরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, উদারপ্রাণ, পরমগুরুভক্ত ও সজ্ঞানে 'জয়গুরু' বলিয়া দেহত্যাগকারী স্বর্গীয় **সরোজ প্রকাশ রায়** মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী গুরুগতপ্রাণা, বিশিষ্ট উদার-চরিত্রা, পরোপকাররতা ও সদাচারপরায়ণা **সরলা দেবী** স্বীয় স্বর্গত পতিদেবের আত্মার চিরশান্তিকামনায় এই গ্রন্থ মুদ্রণের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিয়া নিজ আস্তিকতার ও গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছে। আমাদের প্রার্থনা, পরমাত্মা শ্রীমতীর হৃদয়ে বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপে আবির্ভূত থাকিয়া তাহার এই দুর্লভ মানব-জনম সফল করুন এবং তাহার স্বর্গীয় পতিদেবের আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

'অন্নদা নিবাস'
বিলাসীনগর
বৈদ্যনাথ ধাম।
১৪-১-৫৪

শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৬০।
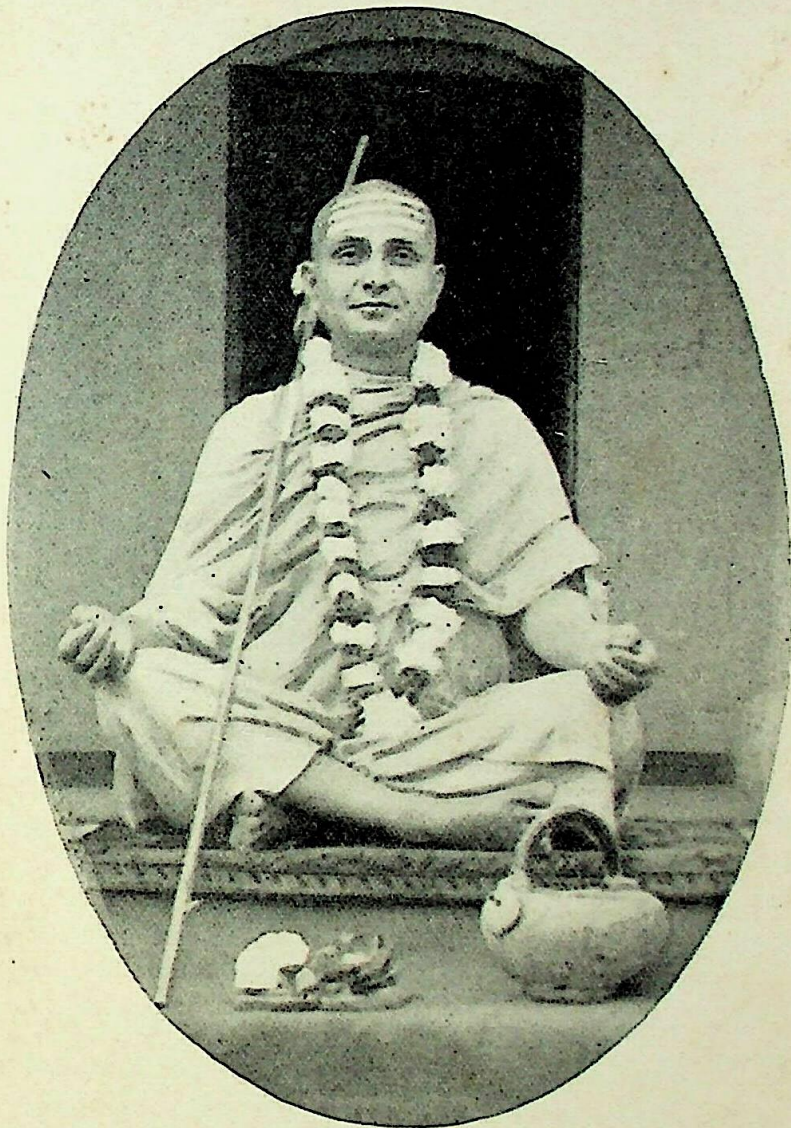
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয়
ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুচরণ-শরণম্ ॥

—প্রকাশকের নিবেদন—

পরমারাধ্যচরণ পরমশ্রদ্ধেয় অনিকেতনবাসী শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামিপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ-লিখিত একাদশটি প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া সাধন-সহায় নামে প্রকাশিত করা হইল। 'মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য' নামক প্রবন্ধটি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সনাতনী বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা 'উৎসবে' ১৩৪৬ সালের ভাদ্র সংখ্যায়; 'সাধনার পথে মহাত্মা শিহ্লনাচার্য্য' প্রবন্ধটি 'শ্রীভারতী'র মাঘ সংখ্যায় ১৩৪৭ সালে; 'সাধন-সহায়,' 'বিমুক্তি বা মোক্ষ,' 'কুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন' এবং 'প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব'—এই চারিটি প্রবন্ধ কলিকাতা গড়-পারের শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠের সনাতনধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মুখপত্র 'সত্যপ্রদীপ' নামক বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাতে ১৩৪৭, ১৩৪৮ ও ১৩৫০ সালে ধারা-বাহিকরূপে; 'নাম-সাধন,' 'কলিযুগে তন্ত্রমন্তে ও মদ্য-মাংসাদি দ্বারা সাধনা নিষিদ্ধ' এবং 'সাধন-সহায়' প্রবন্ধের 'আসন' শীর্ষক নিবন্ধটি কাশী-ধামের সুপ্রসিদ্ধ, বিচারমূলক, পূর্ণ সনাতনী হিন্দী সাপ্তাহিক 'সিদ্ধান্ত' নামক পত্রিকাতে ১৩৫৫ ও ১৩৫৭ সালে; এবং 'স্ত্রী-শূদ্রাদির উপনয়ন ও বেদাধিকার?' প্রবন্ধটি 'দৈনিক বসুমতী'র এক রবিবাসরীয় আলোচনীতে ১৩৫৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'উপাস্য—ধ্যান ও

স্মরণের বস্তু,' এবং 'বেদান্তদর্শনে অপশূদ্রাধিকরণ' নামক দুইটী প্রবন্ধ নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ অনিকেতনবাসী স্বামীজীউ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়ও পুস্তকের প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইল।

এই পুস্তকের 'পরিশিষ্ট'-অংশ, ৪১নং গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ঠিকানার 'শ্রীজগদীশ প্রেস' হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমস্ত অংশের মুদ্রণ হইয়াছে ৯৬নং আপার চিৎপুর রোডস্থ 'রেম্‌কো প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে'।

"সাধন-সহায়" ইংরাজী ১৯৩৫ সালে 'শিমলা সৎসঙ্গ' হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রথমবার শ্রদ্ধালু সাধকগণের কল্যাণার্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল; এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪৮ সালে 'লখনৌ বৰ্দ্ধমান সাহিত্যমন্দির' হইতে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত করিয়া শ্রদ্ধাবান্ অভ্যাসিদিগের মঙ্গলার্থ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল;—এইবার ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 'সাধন-সহায়' বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দুঃখের বিষয়, সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য 'সাধন-সহায়'-কে পূর্ণ দুই বৎসর মুদ্রণালয়ে বাস করিতে হইয়াছে!

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রথমেই 'শুদ্ধিপত্র' দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া নেন।

দ্বিতীয়বারের 'প্রাক্‌কথন' হইতে অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া মদীয় নিবেদন শেষ করিতেছি।—

"শ্রীশ্রীগুরুপাদারবিন্দসেবী, বৈরাগ্যযুক্ত, নিত্য সাধনাভ্যাসী, আস্তিক, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান্ ভক্তগণের নিমিত্ত এই সকল প্রবন্ধ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ অমৃতস্বরূপ। শ্রীসদ্‌গুরুকৃপাপ্রাপ্ত সাধকের দৈনন্দিনী সাধনপ্রণালী, অন্তর্বহিরনুভব ও জীবন-লক্ষ্য ইহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরমকারুণিক মহাপুরুষ যদ্যপি অনন্তশাস্ত্রের সার-বর্ণন অতি সংক্ষেপে

সূত্ররূপে 'গাগরে সাগর' ভরিবার ন্যায় করিয়াছেন, তথাপি এই সকল উপদেশ বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত সরল ও সুখবোধ্য এবং পালন-পক্ষে অত্যন্ত সুগম, সরস ও সুখকর—ইহা আশু কল্যাণকারী ও পরমলাভদায়ক সাধন-সারসর্ব্বস্ব। আশা করি, এই পুস্তক অধিকারী সাধকবৃন্দকে তাঁহাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরে স্থিতিলাভ করাইতে বিশেষ সহায়ক হইবে, এবং নিজের 'সাধন-সহায়' নামও সার্থক করিবে।"

উপর্য্যুক্ত প্রতি কথাটি সত্য। অলমতিবিস্তারেণ, অত্রৈব শুভম্। "সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু"।

৩০, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২-২-১৯৫৪

প্রকাশক—
শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়
বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, ১৩৬০।২৯ মাঘ।

বিষয়-সূচী

(ক) অনিকেতনবাসী পরমপূজ্যপাদ শ্রী১০০৮ শ্রীমৎস্বামী শঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজের

(১) সাধন-সহায়

(২)

মন্ত্র-চৈতন্য বা কুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ওঁ

অনিকেতবাসী

পরম পূজ্যপাদ

শ্রী ১০০৮ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ জীউ

মহারাজের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

যাঁহার সংক্ষিপ্ত পরমপূত জীবন-পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত এই প্রয়াস, তাঁহার স্বরচিত পাঁচটি গান লিখিয়া উহা আরম্ভ করিলাম—

(১)

কত নামে রূপে আসি,
কত ভাবে হৃদে ভাসি,
দিচ্ছ দেখা কতবার।
তথাপি বিরহে ভরি,
ব্যাকুল হৃদয়ে মরি,
ভাবি—হারানু এবার ॥

(২)

ওহে বিশ্বাধার! প্রার্থনা আমার
তব শ্রীচরণতলে।
এ নব বরষে নবীন হরষে
তব সঙ্গ যেন চলে॥
ওহে বিশ্বরূপ! পরায়ে নূপুর
নাচাও তোমার লাগি।
তোমারি আলোকে ফুটায়ে পুলকে
আঁখিতে আঁখিটি রাখি॥

(৩)

ভাসাও মোরে চোখের জলে॥
আপন কর মোরে তুমি,
ওগো সবার হৃদয়-স্বামি,
জাগাও মোরে প্রেমে গলে॥
প্রেমের আঁখি দিয়ে তব,
প্রেমের জগৎ দেখাও নব,
কাঁদাও মোরে লীলার ছলে॥
তুমি তোমার অভয় পদ
বেদের কথা পরমপদ,
দেখাও মোরে জ্ঞানের বলে॥

ঐ পদেতে অভেদ-স্থিতি,
দিয়ে মোরে পরমগতি,
রেখো মোরে ঐ চরণতলে ॥

(৪)

মনের ভাবে এঁকেছি গো,
তোমার মোহন পট।
স্মৃতি দিয়ে গড়েছি গো,
তোমার গোপন মঠ ॥
স্বপ্ন দিয়ে বেদী গড়ি,
স্থাপি তোমা সেথা হরি,
অশ্রু-জলে পূর্ণ করি
তোমার পূজার ঘট।
শিহরণের সুরটি তুলে,
অর্চ্চনা 'মার আপন ভুলে,
এবার আমার পূর্ণ হ'ল
ওহে নাগর নট ॥

(৫)

আমি যাত্রা করে বসে আছি,
সময় এলে যাব চলে।

সেথার সাথী কেউ রবে না,
যেতে হবে আপন বলে ॥ ১
সোঽহং তত্ত্বের ভাবনা নিয়ে
চলবো আমি অবহেলে।
আসবো না আর ফিরে হেথা
কোন কিছু ভোগের ছলে ॥ ২
(তাই) বাহির ভিতর খালি করি
একা থাকি তাঁরি বলে।
কাল কাটে মোর তাঁরি ভাবে
তাঁরি নামে প্রেমে গলে ॥ ৩
সবই সময় যাবার সময়,
(তাই) জেগে থাকি পলে পলে।
নিশার শয়ন ছুটে গেছে
যাবার নেশা প্রবল বলে ॥ ৪
'জাগ্‌তে রহো' ডাকছেন গুরু,
'কে জানে কব্ যাবে চলে।
আপন স্বরূপ পাবে তুমি
তাঁর নামেতে জাগার ফলে' ॥ ৫

সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়

৺কাশীধামের 'শ্রীসুমেরু মঠের' মঠাধীশ অনন্তশ্রীজগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীসত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দ তীর্থস্বামী, তত্ত্বদর্শী, তন্ত্রবিশারদ, রাজগুরু মহারাজ জীউ (যিনি সাধারণে শ্রীমৎ সত্যানন্দতীর্থস্বামী জীউ নামে পরিচিত ছিলেন) পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-দীক্ষার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ছিলেন। অষ্টাদশমহাবিদ্যা-সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺ব্রহ্মানন্দ গিরির বংশধর হওয়াতে তন্ত্রবিদ্যায় তিনি বিশেষ বুৎপন্ন ত ছিলেনই, অধিকন্তু বেদান্তবিদ্যাও তাঁহাতে বিশেষরূপে ফলীভূত হইয়াছিল—তিনি তন্ত্র ও বেদান্তের সমন্বয় মূর্ত্তি ছিলেন।

বঙ্গদেশের 'শ্রীসুমেরু মঠের' পরিচয় অতি অল্পলোকেই জানেন ; এই কারণে এইস্থলে উক্ত মঠের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

৺কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ সনাতনী বিচারমূলক হিন্দী সাপ্তাহিক 'সিদ্ধান্ত' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ ৪৮তম অঙ্কে (৬ই এপ্রিল, ১৯৪৩ সংখ্যায়) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ লিখিত "ব্রাহ্মণ পরিচয়" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে 'শ্রীসুমেরু মঠের' কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ-পরিচয়

ব্রাহ্মণের সর্ব্বকর্ম্মে ওঁকারের বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। সুতরাং ওঁকারকে জানাই ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ত্তব্য। ওঁকারকে না জানিলে ব্রাহ্মণের কর্ম্মসমূহ ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়ে। নিষ্ফলকর্ম্মা ব্রাহ্মণের

শক্তি ও তেজ নিষ্প্রভ হইয়া যায়—তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হন এবং ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য হইয়া দুঃখপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য হন। এই হেতু উক্ত হইয়াছে যে, সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ এবং ত্রিপাদ বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা-স্বরূপ ওঁকারকে যে ব্রাহ্মণ জানেন না, তিনি কিরূপে যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন?

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥
(নাদবিন্দূপনিষৎ ১৩)

অপরপ্রণব, পরপ্রণব এবং মহাপ্রণব-ভেদে ওঁকার অর্থাৎ প্রণব ত্রিবিধ। ওঁকারের 'ওঁ' অথবা 'প্রণব' নাম হইবার হেতু কি?

"অবনাদোমিতি খ্যাতং সর্ব্বস্যাস্য প্রসাদতঃ।
ভক্তমুন্নয়তে যস্মাত্তস্মাদোমিতি ঈরিতঃ॥"

অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের অবন অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়া, এবং ইঁহার প্রসাদে ভক্তগণ মোক্ষমার্গে উন্নীত হয়েন বলিয়া ইঁহাকে "ওঁ" বলা হয়।

"প্রপূয়তে যতঃ সর্ব্বৈঃ পরনির্ব্বাণ-কামুকৈঃ।
সর্ব্বোভ্যাহপ্যধিক স্তস্মাৎ প্রণবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ পরমনির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী ভক্ত সাধকগণ প্রণব বা ওঙ্কারের সম্যক্-রূপে স্তব করেন বলিয়াই এবং ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়াই ইঁহাকে "প্রণব" বলা হয়।

ওঙ্কারেরই এক নাম "প্রণব" এবং ইহাই ছান্দোগ্যোপনিষদের "উদ্গীথ"।

---

(১)

অপর প্রণব

(ক) অপর প্রণবের সাত অঙ্গ—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা ও কলাতীত। 'অ'=রাজসিক ব্রহ্মারূপ ; 'উ'= সাত্ত্বিক বিষ্ণুরূপ ; 'ম'=তামসিক রুদ্ররূপ ; 'নাদ'=সাত্ত্বিক রামাশক্তি, রাজসিক জ্যেষ্ঠাশক্তি এবং তামসিক রৌদ্রী শক্তি—এই তিন শক্তি অর্থাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তির আদি অক্রিয় অবস্থাই নাদ। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মক অবস্থার লিঙ্গ বা সংজ্ঞাই 'বিন্দু'। এই শিবশক্তি উভয়াত্মক এবং ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধরূপ বিন্দুকে 'অর্দ্ধনারীশ্বর' ও বলা হয়। এই বিন্দুর চিদচিন্মিশ্রিতাংশই 'নাদ'। 'বিন্দু'=সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারসমষ্টি। এই বিন্দুত্রয় হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। 'কলা'=বীজ= অঙ্কুর=(বিন্দুর চিদংশ)=(১) রুদ্ররূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চতন্মাত্রা এবং তৎ-তৎ-জাত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চভূত ; (২) রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই শক্তিপঞ্চক এবং বাক্, পাণি (হাত) পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ ভৌতিক কর্ম্মেন্দ্রিয় ; (৩) সাত্ত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দাদি পঞ্চজ্ঞান এবং কর্ণাদি পঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চারিভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ ও 'কলা' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'কলাতীত' শব্দের অর্থ এতৎ সমুদয়ে অনুপ্রবিষ্ট অধিষ্ঠান চৈতন্য।

(খ) অপর প্রণবের চতুষ্পাদ—স্থূল সূক্ষ্ম, বীজ (কারণ) ও সাক্ষী।

(১) স্থূল—যাহা স্থূল-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাকে "স্থূলপাদ" বা **বিশ্ব** বলে।

(২) সূক্ষ্ম—যাহা স্থূল-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাকে "সূক্ষ্মপাদ" বা **তৈজস** বলে।

(৩) বীজ—গুণমাত্রে স্থিত হইলে তাহাকে "বীজ" বা **প্রাজ্ঞ** বলে।

(৪) সাক্ষী—গুণাতীত অবস্থাকে "সাক্ষী" বা **তুরীয়** বলে।

'পাদ' শব্দের অর্থ—স্পন্দনরূপ শক্তিপ্রবাহের পরিমাপক তারতম্য। এই পাদ বা মাত্রার তারতম্যেই এক অখণ্ড চৈতন্য যেন বহুবৎ প্রতীয়মান হন এবং সাধক নিজের অস্তিত্ব ও প্রাণশক্তির অনুভবে সমর্থ হন।

(গ) **অপর প্রণবের ত্রিস্থান**—(১) প্রথমস্থান= জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ (বিশ্ব) এবং জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ (বিরাট্) অর্থাৎ সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চসহিত চেতন পুরুষ; (২) দ্বিতীয় স্থান= স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ (তৈজস) এবং স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ)। ইনি স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজসপুরুষাভিমানী আত্মা, ইনি অন্তর্বিষয়াবভাসক, মনোমাত্র আশ্রয়। 'তৈজস' শব্দের অর্থ—তেজোনামক বিষয়শূন্য বাসনাময়। (৩) তৃতীয় স্থান=সুষুপ্তি-অবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ (অব্যাকৃত) এবং সুষুপ্তি-অভিমানী পুরুষ (প্রাজ্ঞ —ঈশ্বর)। অর্থাৎ জীবের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপর প্রণবের তিন স্থান।

(ঘ) **অপর প্রণবের পঞ্চদেবতা**—উক্ত হইয়াছে „ওঁকারং পঞ্চদেবময়ং সদা" অর্থাৎ ওঁকার সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময়। 'অথর্ব্ব শিখোপনিষদে' বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ। পঞ্চধা পঞ্চদৈবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব (মহেশ্বর)—এই পঞ্চ-দেবময় প্রণব।

(২)

পরপ্রণব বা পরব্রহ্ম

পরপ্রণবের অঙ্গাদি সমুদয় লয় প্রাপ্ত হইয়া আছে, সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের অতীত। "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত একমোঙ্কারঃ"॥

(৩)

মহাপ্রণব

(ক) **মহাপ্রণবের সাত অঙ্গ**—সাত আম্নায়ই মহাপ্রণবের সাত অঙ্গ। মহাপ্রণবরূপ শিবের সপ্ত মুখই সপ্ত আম্নায়। তন্মধ্যে দুই মুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ ব্যক্ত রহিয়াছে। এইজন্য শিবকে "পঞ্চবাক্ত্র," "পঞ্চানন" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। "ওঁ"—এই মহাপ্রণবের ও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু—এই পঞ্চ অঙ্গ ব্যক্ত আছে; কলা ও কলাতীত—এই দুই অঙ্গ অব্যক্ত (গুপ্ত) রহিয়াছে বা থাকে।

সপ্ত আম্নায়ের অর্থাৎ শিবের সপ্ত মুখের নাম—তৎপুরুষ (অকার), অঘোর (উকার), সদ্যোজাত (মকার), বামদেব (নাদ), ঈশ্বর (বিন্দু), নীলকণ্ঠ (কলা) ও চৈতন্য (কলাতীত)।

তৎপুরুষকে 'পূর্ব্বমুখ', অঘোরকে 'দক্ষিণমুখ', সদ্যোজাতকে 'পশ্চিমমুখ', বামদেবকে 'উত্তরমুখ', ঈশ্বরকে 'ঊর্দ্ধমুখ', নীলকণ্ঠকে 'গুপ্তঅধোমুখ', এবং চৈতন্যকে 'সর্ব্বমুখের মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম মুখ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বাম্নায়ের 'গুরু' ব্রহ্মা, 'জ্ঞেয়' বা গম্য কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি।

দক্ষিণাম্নায়ের 'গুরু' বিষ্ণু, 'জ্ঞেয়' বা গম্য পরমাত্মা।

পশ্চিমাম্নায়ের 'গুরু' রুদ্র, 'জ্ঞেয়' বা গম্য কাল।

উত্তরাম্নায়ের 'গুরু' ঈশ্বর, 'জ্ঞেয়' বা গম্য বিজ্ঞান।

উর্দ্ধাম্নায়ের 'গুরু' মহেশ্বর (সদাশিব), 'গম্য' শূন্য।

গুপ্ত অধঃ আম্নায়ের 'গুরু' পরমশিব, 'গম্য' ব্রহ্ম।

সপ্তম আম্নায়ের 'গুরু' পরমাশক্তি, 'গম্য' পরমব্রহ্ম।

পূর্ব্বাম্নায়ের 'ঋষি' তৎপুরুষ, 'উপদেশ' সৃষ্টি, 'ক্রিয়া' মন্ত্র ও হঠযোগ।

দক্ষিণাম্নায়ের 'ঋষি' অঘোর, 'উপদেশ' স্থিতি, 'ক্রিয়া' ভক্তি ও লয়যোগ।

পশ্চিমাম্নায়ের 'ঋষি' সদ্যোজাত, 'উপদেশ' সংহার, 'ক্রিয়া' ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্যযোগ।

উত্তরাম্নায়ের 'ঋষি' বামদেব, 'উপদেশ' অনুগ্রহ, 'ক্রিয়া' জ্ঞানযোগ ও উরগযোগ।

উর্দ্ধাম্নায়ের 'ঋষি' ঈশান, 'উপদেশ' অনুভব, 'ক্রিয়া' বাসনাযোগ, পরাযোগ ও সন্ন্যাস।

গুপ্তঅধঃ-আম্নায়ের 'ঋষি' নীলকণ্ঠ, 'উপদেশ' অনুভব, 'ক্রিয়া বা সাধন শাম্ভবীমুদ্রা দ্বারা অমনস্কযোগ।

সপ্তম আম্নায়ের 'ঋষি' চৈতন্য, 'উপদেশ' পরমব্যোম, 'ক্রিয়া' সহজস্থিতি ও মোক্ষ।

পূর্ব্বাম্নায়ের 'আশ্রম' পূর্ব্ব, 'মঠ' গোবর্দ্ধন, 'ক্ষেত্র' পুরুষোত্তম, 'সম্প্রদায়' ভোগবার, 'দেব' জগন্নাথ, 'দেবী' বিমলা, 'তীর্থ' মহোদধি, 'আচার্য্য' তুঙ্গাচার্য্য (পদ্মপাদ), 'ব্রহ্মচারী' প্রকাশ, 'কার্য' "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" চিন্তন, 'বেদ' ঋক্।

দক্ষিণাম্নায়ের 'আশ্রম' দক্ষিণ, 'মঠ' শৃঙ্গেরী, 'ক্ষেত্র' রামেশ্বর (বালেশ্বর),

'সম্প্রদায়' ভূরীবার, 'দেব' বরাহ, 'দেবী' কামাক্ষী, 'তীর্থ' তুঙ্গভদ্রা, 'আচার্য্য' বিশ্বরূপ (সুরেশ্বর), 'ব্রহ্মচারী' চৈতন্য 'কার্য্য' যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" চিন্তন 'বেদ' ঋজুঃ।

পশ্চিমাম্নায়ের 'আশ্রম' পশ্চিম, 'মঠ' সারদা, 'ক্ষেত্র' দ্বারকা, 'সম্প্রদায়' কীটবার, 'দেব' সিদ্ধেশ্বর, 'দেবী' ভদ্রকালী, 'তীর্থ' গোমতী, 'আচার্য্য' পৃথিব্যাচার্য্য (হস্তামলক), 'ব্রহ্মচারী' স্বরূপ, 'কার্য্য' "তত্ত্বমসি" বিচার, 'বেদ' সাম।

উত্তরাম্নায়ের 'আশ্রম' উত্তর, 'মঠ' জ্যোতিঃ, 'ক্ষেত্র' বদরিকা, 'সম্প্রদায়' আনন্দবার, 'দেব' নারায়ণ, 'দেবী' পুণ্যাগিরি, 'তীর্থ' অলকানন্দা, 'আচার্য্য' ত্রোটক, 'ব্রহ্মচারী' আনন্দ, 'কার্য্য' "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" চিন্তন, বেদ, অথর্ব্ব।

উৰ্দ্ধাম্নায়ের 'আশ্রম' উৰ্দ্ধ (ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করের ত্রিশূলের উৰ্দ্ধ), 'মঠ' সুমেরু, 'ক্ষেত্র' কৈলাস (কাশী), 'সম্প্রদায়' অঘোবার বা কাশিকা, 'দেব' নিরঞ্জন, 'দেবী' মায়া (ত্রিশক্তি), 'তীর্থ' মানস সরোবর, 'আচার্য্য' ঈশ্বর (ঈশ্বরাচার্য্য), 'ব্রহ্মচারী' অনন্ত, 'কার্য্য' সংহারক্রমে সন্ন্যাস, 'বেদ' সর্ব্ববেদ।

গুপ্তঅধঃ-আম্নায়ের 'আশ্রম' আত্মা, 'মঠ' পরমাত্মা, 'ক্ষেত্র' আকাশ সরোবর, 'সম্প্রদায়' •সত্যসন্তোষ, 'দেব' •পরমহংস, 'দেবী' মানসী মায়া, 'তীর্থ' ত্রিপুটী (ত্রিকোটি), 'আচার্য্য' অদ্বিতীয় চৈতন্য, 'ব্রহ্মচারী' ব্রহ্মচর্য্যাতীত 'কার্য্য' মহাসন্ন্যাস।

সপ্তমাম্নায়ের 'আশ্রম' নিষ্কল, 'মঠ' সহস্রার্কদ্যুতিঃ, 'ক্ষেত্র' অনুভব, 'সম্প্রদায়' সৎশিষ্য, 'দেব' বিশ্বরূপ, 'দেবী' চিৎশক্তি, 'তীর্থ' অনাহতশ্রবণ, 'আচার্য্য' সদ্‌গুরু, 'ব্রহ্মচারী' ব্রহ্মচর্য্যাতীত, 'কার্য্য' পূর্ণানন্দক্রমে মহাসন্ন্যাস।

(খ) **মহাপ্রণবের চতুষ্পাদ**=ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

(গ) **মহাপ্রণবের ত্রিস্থান**=সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ।

(ঘ) **মহাপ্রণবের পঞ্চদেবতা**=(১) হিরণ্যগর্ভ (শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা, শক্তিযুক্ত বিষ্ণু ও শক্তিযুক্ত রুদ্রের সমষ্টি)। (২) শক্তিযুক্ত ঈশ্বর। (৩) শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর (সদাশিব)। (৪) শক্তির সহিত মিলিত (একীভূত) পরশিব। (৫) ব্যোম্ বা পরব্রহ্ম।

এইরূপ সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ এবং ত্রিস্থান-বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতাস্বরূপ ওঁকারকে যে ব্রাহ্মণ জানেন, তিনি যথার্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ। ইত্যাদি ইত্যাদি॥

[ইতি 'ব্রাহ্মণ-পরিচয়' সমাপ্ত]

নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহেও 'শ্রীসুমেরুমঠের' পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

(১) ৺কাশীধামস্থ 'শ্রীকামরূপ মঠ' হইতে প্রকাশিত 'যতিধর্ম্ম-নির্ণয়ঃ', উত্তরভাগঃ, ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"পঞ্চমস্তূর্দ্ধ আম্নায়ঃ **সুমেরুমঠ** উত্তমঃ।
সম্প্রদায়োৎস্য কাশী স্যাৎ সত্যজ্ঞানভিদে পদে॥
কৈলাসঃ ক্ষেত্রামিত্যুক্তং দেবতাঽস্য নিরঞ্জনঃ॥
দেবী মায়া তথাচার্য্য ঈশ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
তীর্থং সুম্যনসং প্রোক্তং ত্রৈলোক্যশরণং মহৎ।
তত্র সংহারমার্গেণ সংন্যাসং মহদাশ্রয়েৎ॥"

(২) উজ্জয়িনী-নিবাসী দাজী, নাগেশ ধর্ম্মাধিকারী মহোদয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বম্বে 'নির্ণয়সাগর প্রেসে' মুদ্রিত করাইয়া যে 'মঠাম্নায়' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে—

"অথোহর্দ্ধং শেব আম্নায়াস্তে বিজ্ঞানৈকবিগ্রহাঃ।
পঞ্চমস্তূর্দ্ধ আম্নায়ঃ **সুমেরুমঠ** উচ্যতে॥
সম্প্রদায়োহস্য কাশী স্যাৎ সত্যজ্ঞানভিদে পদে।
কৈলাসঃ ক্ষেত্রমিত্যুক্তং দেবতাহস্য নিরঞ্জনঃ॥
দেবী মায়া তথাচার্য্য ঈশ্বরোহস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
তীর্থং তু মানসং প্রোক্তং ব্রহ্মতত্ত্বাবগাহি তৎ॥
তত্র সংহার মার্গেন সংন্যাসং সমুপাশ্রয়েৎ॥"

(৩) 'শ্রীশ্রমণনাথ-জ্ঞানমন্দির' হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত, সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবলদেব শর্ম্মা উপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম-এ (প্রধান অধ্যাপক—সংস্কৃত ও পালী বিভাগ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী) দ্বারা অনুবাদিত 'শ্রীশঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকাতে ৭৩ তম পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"মঠাম্নায়-সেতু'কে অনুসার অদ্বৈতমতকে সাত আম্নায় হৈঁ তথা প্রত্যেক আম্নয়কে সম্প্রদায়, মঠ, অঙ্কিত নাম, ক্ষেত্র; দেব-দেবী, আচার্য্য, তীর্থ, ব্রহ্মচারী, বেদ, মহাবাক্য, স্থান, গোত্র তথা শাসনাধীন দেশকে নাম ভিন্ন ভিন্ন হৈঁ।"

"উর্দ্ধাম্নায়কে অন্তর্গত **কাশিকা সুমেরুমঠ** মানা জাতা হৈ, জহাঁ আচার্য্য শঙ্করনে মহেশ্বর (ঈশ্বর) নামক শিষ্যকো অধ্যক্ষ পদপর নিযুক্ত কিয়া। অন্তিম দোনোঁ আম্নায়োঁ—আত্মাম্নায় তথা নিষ্কলাম্নায়কা রহস্য গূঢ় হৈ। ইনকা সম্বন্ধ ভৌতিক জগৎকে ন হোকর আধ্যাত্মিক জগৎসে হৈ।"

(৪) উপর্য্যুক্ত সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবলদেব শর্ম্মা উপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম-এ মহাশয়ের কথন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'মঠাম্নায়-সেতু' নামক গ্রন্থেও সাত আম্নায়ের সাতমঠের পরিচয় আছে। সুতরাং তাহাতেও **সুমেরু মঠের** পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) ৺কাশীধামের 'যোগাশ্রম' হইতে প্রকাশিত ৺স্বামী কৃষ্ণানন্দ লিখিত 'সংন্যাস' পুস্তিকায়ও সপ্ত আম্নায়স্থ সপ্ত মঠের উল্লেখ আছে। অতএব তাহাতেও **সুমেরু মঠের** পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) কলিকাতা 'বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার বিভাগ' হইতে প্রকাশিত, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা'র ভূমিকাতে তিনি সপ্ত আম্নায় ও তৎপ্রসঙ্গে **সুমেরুমঠের** পরিচয় দিয়াছেন।

(৭) মাদ্রাসপ্রান্তীয় 'অড্য়ার পুস্তকালয়স্থ' পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা সম্পাদিত "অপ্রকাশিতা উপনিষদঃ" গ্রন্থে 'মঠাম্নায়োপনিষদে' উর্দ্ধাম্নায়স্থ 'শ্রীসুমেরুমঠের' নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

"ওঁ পঞ্চমে উর্দ্ধাম্নায়ঃ **সুমেরুমঠঃ** কাশীসম্প্রদায়ঃ, জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-শুক-বামদেবাদি-জীবন্মুক্তা এতৎ সনক-সনন্দন-কপিল-নারদাদি-ব্রহ্মনিষ্ঠা নিত্যব্রহ্মচারিণঃ, কৈলাসক্ষেত্রং, মানসসরোবরং তীর্থং, নিরঞ্জনো দেবতা, মায়া দেবী, ঈশ্বরাচার্য্যঃ, অনন্ত ব্রহ্মচারী, শুকদেব-বামদেবাদি-জীবন্মুক্তানাং সুসংবেদ-প্রপঠনং পরোরজসে সাবদোং "সংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যবিচারঃ, নিত্যানিত্যবিবেকেনাত্মনোপাস্তিমাত্মতীর্থে আত্মোদ্ধারার্থে সাক্ষাৎকারার্থে সংন্যাসগ্রহণং করিষ্যে। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি"॥

বঙ্গীয় সন ১৩৩৩ সালের (ইংরাজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের) শুভ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের 'শ্রীপাদুকাপীঠ' ৺কাশীধামের উর্দ্ধাম্নায়স্থ 'শ্রীসুমেরু মঠের' তদানীন্তন মঠাধীশ পরমারাধ্য শ্রীজগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য অনন্ত শ্রীবিভুষিত শ্রীশ্রীসত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দতীর্থ স্বামিপাদ মহারাজ জীউর নিকট হইতে স্বামীজী মহারাজের সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ হইয়াছিল। ১৩৪০ সালে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে) পরমারাধ্য শ্রীচরণ

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভগবান্ ৺কাশীধামস্থ নিজ মঠেই স্বকীয় শ্রীদেহ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলীন হইয়া যান। ৺কাশীলাভের কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন তিনি স্বামীজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—'শঙ্কর! তোর মধ্যে তান্ত্রিক সংস্কার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কার প্রবল। (নিজ শরীর দেখাইয়া) আমি এই দেহ ত্যাগ করিলে পর তুই গোবর্দ্ধন মঠের পুরুষোত্তম তীর্থের অধীন থাকিস'। এই আদেশ পালনের জন্য তাঁর ৺কাশীপ্রাপ্তির পর স্বামীজী মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের উক্ত স্বামিপাদ মহারাজজীর নিকট হইতে 'সিদ্ধযোগোপদেশ' ও 'মহাবাক্যোপদেশ' প্রাপ্তিপূর্ব্বক একটী নূতন দণ্ড অভিষেকাদি সংস্কার করাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি ইহার শিষ্যরূপেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

নিম্নে কয়েকটি লেখার প্রতিলিপি ও অনুবাদ দেওয়া হইল,—ইহা হইতে স্বামীজীউ মহারাজের জীবনীর দিগ্দর্শন পাওয়া যাইবে।

(১)

'প্রুডেন্সিয়াল্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর' পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং অধুনালুপ্ত ঢাকার 'সোম বানার্জি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর' ম্যানেজিং প্রোপাইটার শ্রীসুধেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ৬৮।৪, প্রতাপাদিত্য রোড্ কলিকাতা—২৬ হইতে ৫-৯-১৯৪৯ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"শিশুকাল হইতেই সাধুজীর মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল আর পাওয়া গিয়াছিল তাঁর ধীরতা, স্থিরতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয়। নিজের ভাব গোপন রাখা তাঁর জন্মসিদ্ধ সংস্কার ছিল। বন্ধু, বান্ধব ও পরিচিতদের বাঁচাইবার জন্য সব রকমের অপমান, গর্জনা, তর্জনা নীরবে সহ্য করা সাধুজীর এক স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক ছিল। কার্য্যকালের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তাঁহার কোন ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত না। নীরবে গম্ভীরভাবে

(৫) ৺কাশীধামের 'যোগাশ্রম' হইতে প্রকাশিত ৺স্বামী কৃষ্ণানন্দ লিখিত 'সংন্যাস' পুস্তিকায়ও সপ্ত আম্নায়স্থ সপ্ত মঠের উল্লেখ আছে। অতএব তাহাতেও **সুমেরু মঠের** পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) কলিকাতা 'বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার বিভাগ' হইতে প্রকাশিত, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা'র ভূমিকাতে তিনি সপ্ত আম্নায় ও তৎপ্রসঙ্গে **সুমেরুমঠের** পরিচয় দিয়াছেন।

(৭) মাদ্রাসপ্রান্তীয় 'অড্য়ার পুস্তকালয়স্থ' পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা সম্পাদিত "অপ্রকাশিতা উপনিষদঃ" গ্রন্থে 'মঠাম্নায়োপনিষদে' উৰ্দ্ধাম্নায়স্থ 'শ্রীসুমেরুমঠের' নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

"ওঁ পঞ্চমে উৰ্দ্ধাম্নায়ঃ **সুমেরুমঠঃ** কাশীসম্প্রদায়ঃ, জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-শুক-বামদেবাদি-জীবন্মুক্তা এতৎ সনক-সনন্দন-কপিল-নারদাদি-ব্রহ্মনিষ্ঠা নিত্যব্রহ্মচারিণঃ, কৈলাসক্ষেত্রং, মানসসরোবরং তীর্থং, নিরঞ্জনো দেবতা, মায়া দেবী, ঈশ্বরাচার্য্যঃ, অনন্ত ব্রহ্মচারী, শুকদেব-বামদেবাদি-জীবন্মুক্তানাং সুসংবেদ-প্রপঠনং পরোরজসে সাবদোং "সংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যবিচারঃ, নিত্যানিত্যবিবেকেনাত্মনোপান্তিমাত্মতীর্থে আত্মোদ্ধারার্থে সাক্ষাৎকারার্থে সংন্যাসগ্রহণং করিষ্যে। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি"॥

বঙ্গীয় সন ১৩৩৩ সালের (ইংরাজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের) শুভ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের 'শ্রীপাদুকাপীঠ' ৺কাশী-ধামের উৰ্দ্ধাম্নায়স্থ 'শ্রীসুমেরু মঠের' তদানীন্তন মঠাধীশ পরমারাধ্য শ্রীজগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য অনন্ত শ্রীবিভুষিত শ্রীশ্রীসত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দতীর্থ স্বামিপাদ মহারাজ জীউর নিকট হইতে স্বামীজী মহারাজের সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ হইয়াছিল। ১৩৪০ সালে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে) পরমারাধ্য শ্রীচরণ

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভগবান্ ৺কাশীধামস্থ নিজ মঠেই স্বকীয় শ্রীদেহ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলীন হইয়া যান। ৺কাশীলাভের কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন তিনি স্বামীজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—'শঙ্কর! তোর মধ্যে তান্ত্রিক সংস্কার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কার প্রবল। (নিজ শরীর দেখাইয়া) আমি এই দেহ ত্যাগ করিলে পর তুই গোবর্দ্ধন মঠের পুরুষোত্তম তীর্থের অধীন থাকিস'। এই আদেশ পালনের জন্য তাঁর ৺কাশীপ্রাপ্তির পর স্বামীজী মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের উক্ত স্বামিপাদ মহারাজজীর নিকট হইতে 'সিদ্ধযোগোপদেশ' ও 'মহাবাক্যোপদেশ' প্রাপ্তিপূর্ব্বক একটী নূতন দণ্ড অভিষেকাদি সংস্কার করাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি ইহার শিষ্যরূপেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

নিম্নে কয়েকটি লেখার প্রতিলিপি ও অনুবাদ দেওয়া হইল,—ইহা হইতে স্বামীজীউ মহারাজের জীবনীর দিগ্দর্শন পাওয়া যাইবে।

(১)

'প্রুডেন্সিয়াল্ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর' পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এবং অধুনালুপ্ত ঢাকার 'সোম বানার্জি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর' ম্যানেজিং প্রোপাইটার শ্রীসুধেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ ৬৮।৪, প্রতাপাদিত্য রোড্ কলিকাতা—২৬ হইতে ৫-৯-১৯৪৯ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"শিশুকাল হইতেই সাধুজীর মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল আর পাওয়া গিয়াছিল তাঁর ধীরতা, স্থিরতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয়। নিজের ভাব গোপন রাখা তাঁর জন্মসিদ্ধ সংস্কার ছিল। বন্ধু, বান্ধব ও পরিচিতদের বাঁচাইবার জন্য সব রকমের অপমান, গর্জনা, তর্জনা নীরবে সহ্য করা সাধুজীর এক স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক ছিল। কার্য্যকালের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তাঁহার কোন ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত না। নীরবে গম্ভীরভাবে

পরিস্থিতি মাত্রকে নিজের অনুকূল করিয়া নেওয়া তাঁহার এক সহজ বিশেষতা ছিল। বিশেষ অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও চক্ষে সাধুজীর নিত্য-সঙ্গী মধুরভাবের নিত্য দর্শন প্রায়ই দুর্ঘট হইত। সরলতার ঘর ছিলেন তিনি। ঠাট্টা, তামাসা হইতে তিনি সদা দূরে থাকিতেন। রাত জাগিতে বড়ই কুশল ছিলেন। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে এমন কাহাকেও আমি দেখি নাই, যিনি সাধুজীর বাল্য, কৈশোর ও নবযৌবনের সরল, অকপট, মধুর হাসিমাখা মুখশ্রী এবং আপন-পর-ভোলা উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হন নাই। সাধুজী এক নম্বরের হঠী ছিলেন। যে কথা মুখ হইতে একবার বাহির হইত তাহা পূরণ করা এবং কাজে হাত দিলে তাহা শেষ করিয়া ফেলা তাঁহার ব্রত ছিল,—তাহাতে অন্য দিকে হাজার ক্ষতি হইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। 'যাহার বাত ঠিক নাই, তাহার বাপ ঠিক নাই' 'সাধু হওয়া ভাল, সাধু সাজা ভাল নয়'—এই কথা দু'টী তাঁর মুখে প্রায়ই শুনা যাইত।

একদিন সাধুজীদের কালীঘাটের বাড়ীর সামনে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জ্যোতিষি-পণ্ডিত সাধুজীর হাত দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—'এই জাতক ভবিষ্যতে একজন খুব বড় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবে। সংসারে থাকিলে স্থপতিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া খ্যাতি লাভ করিবে আর সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলে একজন মহাযোগী সন্ন্যাসী হইবে। ইহার সংসার-তাগের সম্ভাবনাই অধিক। এই জাতকের দেহত্যাগ সজ্ঞানে গঙ্গাতটে হইবে'। তখন সাধুজীর বয়স ১২ কি ১৩ বৎসর ছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সংসার ত্যাগের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। সাধুজীর জন্ম-পত্রিকায় দেখা যায়, তাঁহার দশম অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে তুলারাশিতে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র রহিয়াছেন। বেদ-নয়ন জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে ইহাকে 'প্রব্রজ্যাযোগ' বলে।

"গ্রহচতুষ্টয়াদি একাক্ষিগং প্রব্রজ্যাকরম্। যাবন্তো বলিনস্তাবন্তঃ স্বস্ব-প্রব্রজ্যাকরাঃ॥ তাপসঃ কাপালিকো রক্তপট্ট আজীবী। ত্রিদণ্ডী চক্রধরো নগ্নঃ সূর্য্যাদিতঃ॥ জীবজ্ঞযোগে রাজমান্যঃ॥" "তৃতীয়ে গুরু-শুক্রাভ্যাং যোগে জ্ঞানেন বৈ মৃতিঃ"। অতএব, জ্যোতিষের সন্ন্যাস বিষয়ক বচনও সত্য হইয়াছে।

আমরা দুইজনে বাল্যসঙ্গী ছিলাম, এই কারণে আমাদের উভয়ের পারস্পরিক প্রীতিও অধিক ছিল। সংসার সম্বন্ধে আমি তাঁর মামা আর সাধুজী আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়। এখানে বলিয়া রাখি, সাধুজীর চারিটী সহোদর ভাই এর মধ্যে দুটী আকুমার সাধু। সাধুজী ও আমি উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক, আমি সাধুজী অপেক্ষা তিন মাসের ছোট। বাল্যকালের খেলাধূলা, খাওয়া দাওয়া, চলা-ফিরা এবং ভবিষ্য জীবনের চিত্রাঙ্কণ সব একসঙ্গেই হইত। সে সময়ে আমি বুঝিতে পারি নাই যে, হিমালয়-বাসকামী সাধুজী সর্ব্বত্যাগী আচার্য্য-সন্ন্যাসী হইবেন।

পাঠাবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় এক বৎসর সাধুজী ঢাকায় ছিলেন। সে সময় তাঁহার সাধনা অতিগোপনে অত্যন্ত তীব্রভাবে চলিতেছিল—তিনি ঢাকা হইতে চলিয়া যাইবার পর আমি ইহা জানিতে পারি। প্রতিদিনই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বিছানা ত্যাগ করিয়া শৌচ-স্নানান্তে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক শিবস্তোত্র ও শ্রীকৃষ্ণস্তব পাঠ করিতেন। দেবদেবীগণের স্তবাদি পাঠে তাঁর এক জন্মগত আকর্ষণ ছিল। ৯ বৎসর বয়সে তাঁর উপবীত-সংস্কার হইয়াছিল।

প্রথমেই আমি বলিয়াছি, সাধুজী আজন্ম মেধাবী ছিলেন। তিনি ঢাকা হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা চলিয়া যান এবং সেখানে কলেজে ভর্ত্তি হন। কলিকাতায় কালীঘাট (সাহানগর) অঞ্চলে তাঁহাদের নিজেদের বাড়ী ছিল। শিশুকাল হইতেই

বিলাসিতার প্রতি সাধুজীর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা দেখিয়াছি। তাঁহার কলেজ জীবনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই তরঙ্গে সাধুজী ও তাঁর ঠিক পরের ছোট ভাই কালু (শ্রীঅতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ, A member of the All India Congress Committee from Faridpur before partition. Now a Head-master of an H. E. School in Pakistan) ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (গুপ্তের) কোন definite scheme হয় নাই। তাঁহাকে কর্ম্মপদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গ্রামে গিয়া গ্রামসেবার আদেশ দিলেন।

সাধুজী নিজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ-বণিতার, বিশেষতঃ আমরা যাহাদিগকে পতিত বলি, তাহাদের সেবা আরম্ভ করিলেন। যুবকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালনের উপদেশ দিয়া, তাহাদিগকে ব্যায়াম চর্চ্চায় লাগাইয়া এবং নৈতিক ও ধার্ম্মিক পুস্তক পড়াইয়া তাহাদিগের চরিত্র-গঠনে ও চরিত্রের উন্নতিসাধনে সহায়ক হন, আর এই উদ্দেশ্যে এক অবৈতনিক গ্রন্থাগারের পুষ্টিতে দত্তচিত্ত হইলেন। হোমিও-প্যাথি ঔষধ দ্বারা দরিদ্র রোগিদিগের সেবা করিতে থাকেন। বালক-দিগের শিক্ষার জন্য একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ংই তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট ঠিক করা, পুষ্করিণী ও জঙ্গল পরিষ্কার করা কাজেও ধীরে ধীরে লাগিয়া গেলেন। এই সকল কার্য্যে অর্থ ও সহায়ক সেবকগণের অভাব মোটেই হয় নাই। ঈশ্বরের প্রেরণায় জীবসেবাকে শিবসেবা ভাবিয়া যেখানে জাগতিক নিঃস্বার্থভাবে মনুষ্যমাত্রেরই যথাশক্তি সর্ব্বপ্রকার সেবা চলিতে থাকে, সেখানে ধন ও জনের অভাব থাকিতে পারে না। সর্ব্বহৃদয়বাসী সর্ব্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছায় এই সকলের পূরণ সর্ব্বদাই হইতে থাকে। কংগ্রেস-পক্ষীয়

হওয়ার দরুণ সাধুজীর গ্রেফ্তারি warrant নিয়া পুলিশ মধ্যে মধ্যে আসিত, কিন্তু কি জানি কেন প্রতিবারই তাঁহাকে গ্রেফতার না করিয়া চলিয়া যাইত। সাধুজী নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা সকলেরই মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন সত্যই!

ইহার পরই সাধুজীর ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। দুই বৎসর গ্রামসেবা করিবার পর কিছুদিন কলিকাতা থাকিয়া তিনি ৺কাশীধামে চলিয়া যান। সেখানেই তাঁর শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ হয়। কয়েকমাস তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষালাভান্তে কিছু সময়ের জন্য Coal field এ কুলিবস্তির সেবার জন্য আসানসোলে ছিলেন। মানবসেবাকে তিনি বরাবরই মূর্ত্তিধারী ভগবানের সেবা বলিতেন এবং করিয়া দেখাইয়াছেন।

সাধুজী মাঝে মাঝে ঢাকাতে নিজের মামাবাড়ীতে আসিতেন,—তাহাই তাঁহার জন্মস্থান ছিল কি না! সে সময় 'গেণ্ডেরিয়া'তে (ঢাকা নগরের সহরতলী) রাজমোহন নামে একজন পাগল থাকিত, তত্ত্বগীতি গাহিয়া সে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত। সাধুজীর প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল,—সে প্রায়ই সাধুজীকে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গান শুনাইত। সেই কালে সাধুজী অতি গুপ্তভাবে সমস্ত রাত সাধনায় কাটাইতেন—তাঁহার মুখে এক দিব্য জ্যোতির প্রকাশ দেখা যাইত। একদিন রাজমোহন নিজের মতই একজন ফকিরের কাছে একখানা কাপড় চাহিয়া বসিল। সাধুজী একমাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিতেন,— তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাপড় আধা ভাগ করিয়া রাজমোহনকে দিলেন এবং শেষ আধা টুক্‌রা পরিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

ভয় বলিয়া কোন জিনিষ সাধুজীর ভিতরে দেখা যায় নাই। একা থাকা, একা চলা-ফেরা করা, শ্মশানে একাই যাওয়া এবং রাত পর্য্যন্ত শ্মশানে থাকা সাধুজীর জন্মগত সংস্কার ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার

এই সংস্কারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যদি কেহ কখন ও ভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিত, তিনি বলিতেন,—রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি ? সত্যই ত ভগবদ্ভক্তের ভয় কোথা হইতে হইবে ?

সংন্যাসাশ্রম-প্রবেশের সময় মাতার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োজন হয়, ইহা শাস্ত্র শাসন। সংন্যাস-গ্রহণে আদেশ দিবার অধিকার মাতারই আছে —পিতার নহে অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিতার আদেশের প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না। এই কারণে যে সময় আমার একমাত্র জ্যেষ্ঠা দিদির নিকট সংন্যাসাশ্রম-প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সাধুজী চিঠি লিখিয়া ছিলেন, তখন আমার পূজ্যা দিদি উত্তর দিলেন—'তুমি নিঃসঙ্কোচে সন্ন্যাস গ্রহণ কর, তোমার মত পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করিয়া আমি ধন্যা। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমার অন্তরের শুভকামনা পূর্ণ করুন।' কোন প্রকার দুঃখ নাই, কান্নাকাটি নাই, অনুনয় বিনয় নাই, বুক থাপরানি নাই ;— এই আমার পূজ্যা মহীয়সী দিদি, সাধুজীর পূজনীয়া মা জননী ! এইরূপ স্থিতিতেই ত ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের পরম পূজনীয়া মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজ্যা জননী শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে কতই না বিলাপ করিয়াছিলেন !—পরন্তু আমার পূজনীয়া দিদি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেন নাই ! সম্ভবতঃ দিদি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার আজন্ম ব্রহ্মচারী পুত্ররত্ন মহাসন্ন্যাসী হইবেন— "অনিকেতঃ," "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী," 'অসংগ্রহী' ও সম্পূর্ণ-ঈশ্বর নির্ভরশীল সন্ন্যাসী হইবেন,—এই কারণেই তিনি কোন প্রকার মায়াজাল বিস্তার করেন নাই, প্রসন্নচিত্তে শুভাশীর্ব্বাদসহ সন্ন্যাসগ্রহণে আদেশ দিয়াছিলেন। ধন্য মাতা ! ধন্য পুত্র !"

শ্রীসুধেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৫-৯-১৯৪৯

(২)

ভারত সরকারের মিলিটারী ফাইনান্সের এ-এফ্-এ শ্রীহারাণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, শিমলা হইতে লিখিয়াছেন—

"পূজ্যচরণ স্বামীজী মহারাজের উপদেশ, প্রবন্ধ ও ব্যবহার হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, তিনি সনাতন বৈদিক আর্য্য-সংস্কার নিয়া এই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্ববাঙ্গলার রাজধানী ঢাক সহরের উপকণ্ঠ 'গেণ্ডেরিয়া'তে নিজের পূর্ব্বাশ্রমের মাতামহ স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের (বাঙ্গলা ১৩০৬ সনের) শ্রীদুর্গাষ্টমীর শেষপাদে তিনি এই সংসারে প্রকট হন। তাঁহার শরীর কান্যকুব্জীয় সামবেদী কাশ্যপ গোত্রীয় এক কুলীন সম্ভ্রান্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বদান্য ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পূজ্য পিতৃদেব, বহুকুটুম্বপালক ও বহুজন-আশ্রয়দাতা স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এবং পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীঅবনী দেবী মহোদয়া নিজেদের বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ কাল হইতেই কুল-গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-পূজা-পাঠাত্মক ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতেন—ইহার প্রভাব এবং সংস্কার স্বামীজী মহারাজের উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেবের স্বর্গবাস হয়, মাতৃদেবী এখনও ৺কাশীবাস করিতেছেন। স্বামীজীর স্কুল ও কলেজের পড়াশুনা কলিকাতাতেই হইয়াছিল,—কেবল প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার বৎসর তিনি ঢাকাতে ছিলেন।

কলিকাতাতে 'কালীঘাট মিডিল ইংলিশ স্কুল' ও সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল, ভবানিপুর'-এর বিদ্যার্থীরূপে থাকিবার সময় স্বামীজীর পরোপকার-বৃত্তি,

তন্ত্রসাধনার অন্তিম দীক্ষা ; উহার দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই মনুষ্য যথার্থ আচার্য্য, অতিবর্ণাশ্রমী এবং শিবস্বরূপ কথিত হন।

ঐ বৎসরই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নিজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে স্বামীজী ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। উক্ত একাকী ভ্রমণকালে কতভাবে কতবারই না তাঁহার ঈশ্বরাস্তিত্য ও ঈশ্বর-কৃপার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণে প্রত্যক্ষরূপে জানা গিয়াছিল যে "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্" এবং "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" প্রতিজ্ঞা ভগবান্ সর্ব্বদা কিরূপে রক্ষা করিতেছেন, ইহার অনুভবও বহুবার তাঁহার হইয়াছিল—যাহার ফলে তিনি ঈশ্বরে, শাস্ত্রে এবং ধর্ম্মাচরণের ফলস্বরূপ ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ তাঁহার জীবনে পরম লাভজনক হইয়াছিল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে (১৩৪০ সালে) স্বামীজী মহারাজের পরমারাধ্যচরণ শ্রীশ্রীগুরুদেব ভগবান্ ৺কাশীধামে নিজ মঠেই স্বীয় শ্রীদেহ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলীন হইয়া যান। ৺কাশীপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন তিনি স্বামীজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—'শঙ্কর! তোর মধ্যে তান্ত্রিক সংস্কার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কার প্রবল। (নিজ শরীর দেখাইয়া) আমি এই দেহ ত্যাগ করিলে পর তুই গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শ্রীজগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীভারতীকৃষ্ণ তীর্থ স্বামীজী মহারাজের প্রধান সংন্যাসি-শিষ্য পুরুষোত্তম তীর্থের অধীন থাকিস্।' এই আদেশ পালনের জন্য, তাঁর ৺কাশীলাভের পর, স্বামীজী মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের উক্ত স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে 'সিদ্ধযোগোপদেশ' ও 'মহাবাক্যোপদেশ' প্রাপ্তিপূর্ব্বক এক দণ্ড-নারায়ণকে অভিষেকাদি সংস্কারপূর্ব্বক তাঁহার হাত হইতে প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইঁহার শিষ্যরূপেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

ইঁহার নিকট দীক্ষালাভের পর হইতে স্বামীজী মহারাজের মানসিক ও আত্মিক উন্নতি আরও বিশেষভাবে বাড়িতে লাগিল, শাম্ভবী মুদ্রায় সর্ব্বদা স্থিতি যেন আপনা হইতেই থাকিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুশক্তির অপার মহিমা অনুভব করিয়া তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও শাস্ত্র-বিশ্বাসী হইয়া কৃতকৃত্য হইতে লাগিলেন।

জীবন্মুক্তর 'বালকবৎ' ভাব মহারাজজীতে দেখিয়া আমার চিত্ত হইতে ভারতের বৈদিক সনাতন আর্য্যজাতির দুর্ভাগ্যের দুশ্চিন্তা দূর হইয়া গিয়াছে এবং ভারত যে একদিন পুনঃ সর্ব্বজগতের আধ্যাত্মিক গুরু হইবেন এই আশা ও বিশ্বাস আমার ভিতর দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে।

তাঁর এমন শিষ্য বা শিষ্যা আমি দেখি নাই যাঁর ভিতর শাস্ত্র-শ্রদ্ধা, সদাচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আতিথেয়তা, দয়া, দাক্ষিণ্য ও আত্মবিচার নাই, যিনি ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া ভোজন করেন, যিনি প্রতিদিন ভোজন-সম ভজন ও কীর্ত্তন করেন না। তাঁর সমস্ত শিষ্য, শিষ্যা পরোপকার-ব্রতী। যেমন বীজ তেমন গাছ। গুরুতে এই সমস্ত সদ্‌গুণ থাকাতেই শিষ্য, শিষ্যাতেও ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের বিকাস দেখা দিয়াছে। যেখানে সেখানে খাওয়া, যা তা খাওয়া, যখন তখন খাওয়া, ভগবানকে নিবেদন না করিয়া খাওয়া—এই সমস্ত অসংযত ব্যবহারকে তিনি পশু-ব্যবহার বলেন।

'নিষ্কাম কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে তার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি—"কর্ম্মযোগীর পক্ষে পরমাত্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত প্রদেশে

গিয়া ভজন-ধ্যান করিতেই হইবে এমন কোন আবশ্যক নিয়ম নাই। পরন্তু যদি কোন কর্ম্মযোগী ভজন-ধ্যান করেন তাহাতে লাভ ছাড়া হানি নাই। ভজন-ধ্যান ত সদা-সর্ব্বদাই পরম কল্যাণকর। কিন্তু একান্তে ভজন-ধ্যান না করিয়াও ভগবচ্চিন্তন সহিত শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরন্তর করিতে করিতে পরমাত্মার কৃপায় চিত্তশুদ্ধি, শরণাগতি ও জ্ঞান লাভ করিয়া সাধক পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদা-দবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগ-মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
(১৮।৫৬, ৫৭)

অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই যিনি আশ্রয় করিয়াছেন এরূপ মৎপরায়ণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়াও আমার প্রসাদে (কৃপায়) সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, অতএব সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল মনে মনে আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া সমত্ববুদ্ধিরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া রাখ।

বস্তুতঃ কর্ম্ম মনুষ্যের বন্ধনের হেতু নহে, কর্ম্মফলের ইচ্ছা এবং কর্ম্মাসক্তিই বন্ধনের কারণ। ফলেচ্ছা এবং আসক্তি না থাকিলে কোনরূপ কর্ম্ম মনুষ্যের বন্ধন-কারক হইতে পারে না। ভগবান্ স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম অনুসারে কর্ত্তব্য-রত মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, অবশ্য কর্ম্ম করিবার সময় মনুষ্যের লক্ষ্য পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে থাকা চাই।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
(১৮।৪৬, গীতা)

অর্থাৎ যে পরমাত্মা হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা দ্বারা এই সংপূর্ণ জগৎ জলের দ্বারা বরফের ন্যায় ব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বরকে নিজ বর্ণাশ্রম-বিহিত (স্বাভাবিক) কর্ম্মদ্বারা পূজা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

যেমন পতিব্রতা স্ত্রী নিজ পতিকেই সর্ব্বস্ব মানিয়া পতি-চিন্তন-পরায়ণা থাকিয়া, পতির আজ্ঞানুসারে, পতির নিমিত্তই মন, বাণী ও শরীর দ্বারা সর্ব্বদা সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিতে করিতে পতির প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন, সেইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী একমাত্র পরমাত্মাকেই নিজ সর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার চিন্তন করিতে করিতে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে মন, বাণী ও শরীর দ্বারা সেই পরমাত্মার নিমিত্ত নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন এবং পরে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।

রাজ-সভার এক সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত বেদ-গান শুনাইয়া রাজাকে যেরূপ প্রসন্ন করিতে পারেন, রাজপ্রাসাদের রাজার আজ্ঞাকারী সামান্য বেতনের ভৃত্য ঝাড়ুদারও রাজ-মহল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া রাজাকে সেইরূপ প্রসন্ন করিতে পারে। নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবার কাহারও প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে প্রভুকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রভুকে সমর্পণ করিবার। ইহাই নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা পরমাত্মার পূজা আর এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারাই পরমাত্ম-প্রাপ্তি হইয়া যায়।

কেবল এক পরমাত্মাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী 'আট প্রহর ৬৪ ঘণ্টা' মন, বাণী ও শরীর দ্বারা সেই সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন যাহা দ্বারা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হ'ন, তিনি ভুলিয়াও পরমাত্ম-প্রাপ্তির বাধক চুরী, জারী (ব্যভিচার), মিথ্যা, কপটতা, মাদক দ্রব্য সেবন

এবং অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন না, তিনি সর্ব্বদা সেই সমস্ত ন্যায়যুক্ত ও শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন যাহা তাঁহার চরম ও পরম লক্ষ্য পরমাত্ম-প্রাপ্তির অনুকূল ও সহায়ক হয়। চুপচাপ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চলা তাঁর স্বভাব। তিনি ইহা ভাবেনও না, দেখেনও না যে, অমুক কর্ম্ম বড়, অমুক কর্ম্ম ছোট, কারণ তিনি ইহা জানেন যে, কর্ম্মের স্বরূপ পরমাত্ম-প্রাপ্তির হেতু নহে, পরমাত্ম-লাভের হেতু অন্তঃকরণের ভাব। ভাবের ফলেই মনুষ্যের উত্থান বা পতন হয়। এইজন্য তিনি কাহারও দেখা-দেখি এরূপ কোনও শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করেন না যাহা তাঁহার জন্য শাস্ত্র-বিহিত নহে। তিনি ইহা দেখেন না যে, তাঁর কর্ম্মে অমুক দোষ আছে, অমুকের অমুক কর্ম্ম সর্ব্বথা নির্দ্দোষ। তিনি জানেন যে, অপরের সর্ব্বগুণযুক্ত উত্তম কর্ম্ম (ধর্ম্ম) অপেক্ষা নিজ গুণ রহিত কর্ম্মও তাঁর জন্য শ্রেষ্ঠ ও আচরণ-যোগ্য এবং স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা মনুষ্য কখনও পাপ-লিপ্ত হয় না (গীতা, ১৮।৪৭)। অধুনা এই নিষ্কাম কর্ম্মের রহস্য না বুঝিবার দরুণই নেতাগণ সকলকে একাকার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি-রিবাবৃতাঃ॥
(১৮।৪৮, গীতা)

অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা আবৃত থাকে তেমনি সমস্ত কর্ম্মই কোন-না-কোন দোষ দ্বারা আবৃত থাকে।

যে মনুষ্য যে বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বর্ণোচিত কর্ম্মই 'স্বধর্ম্ম',

ভারতবর্ষের সুব্যবস্থিত বর্ণ ব্যবস্থার ইহা পরম আদর্শ। যাঁহারা এই বিজ্ঞানসম্মত অতিপ্রাচীন বহু বহু পরীক্ষিত বিশেষহিতকর বর্ণ ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাঁহারা বড় ভুল করিতেছেন। সৃষ্টি ভেদমূলক। অভেদ অবস্থায় অর্থাৎ ভেদ না থাকিলে সৃষ্টি কোথায় এবং কিরূপে সম্ভবে? জগতে ভেদ ত মিটিবার নয়, যে দিন ভেদ মিটিয়া যাইবে সে দিন সৃষ্টিরও অন্ত হইবে। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, জাতিভেদ থাকা ততদিন স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম। সাংখ্য দর্শনের "সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্" (৬।৪২) এই সুপ্রাচীন উপদেশ অবহেলা করিয়া এক জাতি গড়িবার প্রযত্নেত ব্যক্তিক, সামাজিক ও সামুহিক দেশগত বিশৃঙ্খলা এবং দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনাটন, রোগ-শোক দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

যে জাতি বা সমুদায়ে মনুষ্য উৎপন্ন হয়, যে মাতা-পিতার রজ-বীর্য্য হইতে তাহার শরীর গঠিত হয়, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য বুঝিবার বুদ্ধি উদয় হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংস্কার দ্বারা তাহার পালন-পোষণ হয়, প্রায়ঃ সেই সকল সংস্কারের অনুকূল কর্ম্মসমুহে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হইয়া থাকে, এই জন্য ঐরূপ প্রবৃত্তি এবং উৎসাহকেই তাহার 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলা হয় এবং এই স্বভাব বা প্রকৃতির অনুকূল বিহিত কর্ম্মসমূহকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে 'স্বধর্ম্ম' সহজকর্ম্ম 'স্বকর্ম্ম' নিয়ত-কর্ম্ম, স্বভাবজকর্ম্ম, স্বভাব নিয়তকর্ম্ম প্রভৃতি নামে বলা হইয়াছে। এই স্বধর্ম্ম-অনুসারে আসক্তি ও স্বার্থরহিত হইয়া, স্বর্ণালঙ্কারে স্বর্ণবৎ অখিল জগতে পরমাত্মাই ব্যাপক রহিয়াছেন বুঝিয়া, সকলের সেবায় পরমাত্মারই সেবা হয় এই ভাব নিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই আচরণীয় —ইহা দ্বারাই তাহার পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

কর্ম্ম যখন স্বার্থবুদ্ধিতে না হইয়া কেবল পরমাত্মার সেবার নিমিত্ত

নির্ম্মল ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তখনই তাহা 'নিষ্কাম কর্ম্মযোগ' নাম পায়। কর্ম্মত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে মনের ভাব পরিবর্ত্তনের, স্বার্থ ও কামনার কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিবার। যেদিন সাংসারিক স্বার্থের স্থানে মনে পরমাত্মার স্থান হইবে, সেদিন তাহার সমস্ত কর্ম্ম যাহা এতদিন বন্ধনের কারণ ছিল, স্বরূপতঃ সেইরূপ থাকিয়া গেলেও, পরমাত্ম-লাভের কারণ হইয়া যায়।

যে পারা এবং সংখিয়া খাইলে মনুষ্য মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সেই পারা অথবা সংখিয়া হইতে বিষভাগ বাহির হইয়া গেলে তাহা অমৃতস্বরূপ হইয়া যায়। চতুর বৈদ্য দ্বারা শোধিত পারা বা সংখিয়া অমৃতের সমান ফলদান করে। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে স্বার্থ ও আসক্তি থাকে সে পর্য্যন্ত উহা বন্ধন অথবা মৃত্যুর হেতু হয়, কিন্তু যে দিন স্বার্থ ও আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, সেই দিনই উহা অমৃতস্বরূপ হইয়া যায় এবং মনুষ্যের পক্ষে পরমাত্মার অমর পদ প্রাপ্তির কারণ হইয়া উঠে। অতএব কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগের আবশ্যকতা নাই, আবশ্যকতা আছে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর মনে লোভ অথবা আসক্তি (ফলাসক্তি) কখন থাকিতে পারে না, এই কারণে তাঁহার দ্বারা পাপকর্ম্ম অথবা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম কখন হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর প্রত্যেক কর্ম্ম ভগবদর্পণ হয় বলিয়া তিনি পরমাত্মার সর্ব্বথা কৃপাপাত্র হইয়া জীবন যাপন করেন।"

এখন ত উপরামতা মহারাজ জীর স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। পরন্তু এখন ও কীর্ত্তনে স্বামীজীর বিশেষ প্রেম দেখা যায়। নিজে নিজে প্রায়ই কীর্ত্তন করেন, কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায়ই ভাবে ডুবিয়া যান, দুই গাল চোখের জলে ভিজিয়া যায়। শিষ্য, শিষ্যা ও ভক্তদিগকে ভজন আরম্ভের

পূর্ব্বে ও ভজনের শেষে কিছু সময় কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রায়ই দিয়া থাকেন।

নিজের এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ধর্ম্মপ্রাণ, জীবন্মুক্ত, অনিকেতনবাসী, কীর্ত্তন প্রেমী, পরোপকারী কিশোর ও যৌবন সখার এই সংক্ষিপ্ত পবিত্র জীবনী লিখিবার সুযোগ পাইয়া আমি আজ নিজেকে কৃতার্থ ও পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি এবং আমার আত্মা আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেছে।"

২৪-৪-১৯৩৭ ইং
শিমলা

শ্রীহারাণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম-এ,
এ-এফ্-এ, মিলিটারী ফাইনান্স,
ভারত সরকার, শিমলা—দিল্লী।

(৩)

বহু হিন্দী মাসিক পত্রিকার লেখক, 'মানস-গীতা-বেদান্ত-তত্ত্বার্থী,' স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রীশ্রীগুরুভক্ত, কবি শ্রীবাবুলাল গুপ্ত 'শ্যাম' শ্রীশীতলামন্দির, সণ্ডীলা (হরদোঈ) হইতে লিখিয়াছেন—

"১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সময় পর্য্যন্ত সংন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময় মহারাজজীর উত্তরাখণ্ডে বিশেষতঃ উত্তর কাশীতে (হিমালয়ে) এবং প্রসিদ্ধ মহাপীঠ জ্বালামুখী পাহাড়ে (কাঙ্গড়া জেলায়) ব্যতীত হইয়াছে। এই সময়েও তিনি উত্তরকাশীতে 'শ্রীশঙ্কর মঠে' বাস করিতেছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আপনার সুচিন্তিত, গম্ভীর, সনাতন শাস্ত্রানুগত, মননীয়,

বিদ্বত্তাপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধসমূহ বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা 'উৎসব' 'সত্যপ্রদীপ' ও 'শ্রীভারতীতে', হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ মাসিক 'কল্যাণে' ও শ্রেষ্ঠ বিচারমূলক সাপ্তাহিক 'সিদ্ধান্তে' এবং ইংরাজী মাসিক 'Satsang' পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতার 'উদ্বোধনে' ৩টি এবং 'শিবম্' মাসিকে ১টি প্রবন্ধ বহুপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। এখন ও কাশীর বিচারপূর্ণ প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'সিদ্ধান্ত' মাসিক 'কল্যাণ' এবং 'মহাশক্তি' তে আপনার গম্ভীর, মাননীয়, ধার্ম্মিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাকী পত্রিকাগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আপনি সনাতন ঋষি-মার্গাবলম্বী একান্তসেবী, ধ্যানশীল, বিচার-পরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং কীর্ত্তন-প্রেমী একজন আচার্য্য 'একদণ্ডী' পরমহংস সংন্যাসী। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ। জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন 'একদণ্ডী' স উচ্যতে॥" (পরমহংসোপনিষৎ) অর্থাৎ যিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা-জাল পরিত্যাগ করিয়া পরম অদ্বৈত ব্রহ্মে স্থিত রহিয়াছেন এবং যিনি জ্ঞানরূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'একদণ্ডী' বলে॥—ইহা প্রশংসার নিমিত্ত অত্যুক্তি নহে, অপি তু অতি সত্য কথা। আপনি তন্ত্র শাস্ত্রের ও রহস্যের পূর্ণ জ্ঞাতা' জ্ঞানের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ণাত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও পূর্ণযোগী এবং আদর্শ মহাত্মা। "অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টিঃ" অনুসারে 'শাম্ভবী-মুদ্রা'তে তো আপনার স্থিতি স্বাভাবিকই সর্ব্বদা থাকে। 'সিদ্ধযোগ' দীক্ষা-দানকালে যখন আপনি শক্তি সঞ্চার করেন, তখন উহার অনুভব শিষ্যের তৎকালেই প্রত্যক্ষ হয়, আমরা ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—ইহার কৃপায় আমরা কৃতকৃত্য ও নির্ভয় হইয়াছি।

যিনিই একবার ইঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, যিনিই একবার ইঁহার

দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনিই প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই এবং তিনি ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন যে, বাস্তবিক যাঁহাকে মহাত্মা (মহাপুরুষ) বলা হয় এবং যাঁহারা ভারতের গৌরবস্থল এবং আদর্শ, এইরূপ একজন পরম বৈরাগ্যবান্, সদার্দ্র চিত্ত, নিত্যপ্রসন্ন, কৃপানিধি, ঋষিপন্থী মহাপুরুষের দর্শন আমি সৌভাগ্যবশে পাইলাম। আপনি শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাপন করিতে সদা সচেষ্ট থাকেন, জঙ্গলে পর্ব্বতোপরি একান্ত তপস্যাময় আদর্শ সংন্যাস-জীবন যাপন করেন। সভা, সমিতি প্রভৃতিতে যাইয়া ব্যাখ্যান (বক্তৃতা) দেওয়া, বস্তিতে বস্তিতে ভ্রমণ ও নিবাস, সংস্থা-স্থাপন (মঠ, মিশন, আশ্রম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও অন্ন সংগ্রহ) প্রভৃতি কার্য্য হইতে, যাহা সংন্যাসাশ্রমীর জন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে সুস্পষ্টশব্দে নিষিদ্ধ রহিয়াছে, আপনি সদাই দূরে থাকেন। পরন্তু কোন অধিকারী মনুষ্য আপনার শ্রীচরণে জিজ্ঞাসু ভাবে উপস্থিত হইলে, আপনি তাহাকে অবশ্য উপদেশদানে কৃতার্থ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। আহারে, বিচারে, ব্যবহারে সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিমাত্রই জিজ্ঞাসু হইলে আপনার কৃপালাভে কৃতার্থ হন। জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ ও বয়সের বিচার আপনি করেন না—অবশ্য অধিকারী কিনা এই বিষয়ে পরীক্ষা আপনি পূর্ণরূপেই করিয়া নেন—ইহাতে ১,২,৩ বৎসর সময়ও লাগিয়া যায়।

আপনার ব্যক্তিত্ব মহান্। আপনার শ্রীমুখ হইতে প্রায়ই শুনা যায়,—"নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত নিয়ম পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কেননা তদনুসারে না চলিলে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভঙ্গ হয়, মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারীকে অপমানিত হইতে হয় এবং তাহার উপর হইতে জন-সাধারণের শ্রদ্ধাও নষ্ট হইয়া যায়। নিজ হাতে বাজারকারী, নিজ হাতে রন্ধনকারী, অর্থপ্রার্থী, অর্থসংগ্রহী এবং নিজ নামে জমি-ক্রয়কারী

সাধুবেশধারীকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, তাহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী, পরধর্ম্মগ্রাহী, পতিত জানিয়া তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। "যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা দাতাঽপি নরকং ব্রজেৎ" অর্থাৎ সংন্যাস-বেষীকে অর্থ ও বিত্ত দিলে দাতারও নরক গমন হয়— এই শাস্ত্র বাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তদনুকূল ব্যবহার করিবে"। [হিন্দী 'সাধন-সহায়' পুস্তকের 'স্বামীজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়' হইতে]

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"মহারাজ জীউর সমগ্র জীবনে সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ব্যবহারই আধিক্যতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহা যেন তাঁহার সহজ ভাব। তিনি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্বামীজীর ব্যবহারে সংকল্প বিকল্পের রূপ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বেচ্ছায় কোনও কার্য্য করিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক সময় শুনা যায়—"অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ" "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।"

"কখন কখন কেহ কেহ মহারাজ জীউর সকাশ হইতে একটু তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া যান। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, স্বামীজীর তিরস্কারের মধ্যেও পুরস্কার আছে —তাঁহার তিরস্কার কত করুণা ও প্রেমমূলক ; কারণ আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি যে, তিরস্কৃত ব্যক্তির অসাক্ষাতে স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রশংসাসূচক বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার প্রকৃতিতে যদি দুই একটা দোষ লক্ষিত হয়, তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া তাহা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া

শুভানুধ্যায়ীর পক্ষে প্রাকৃতিক। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মানদান করে, মিষ্টবচনে তুষ্ট করে, কিন্তু তাঁহার দোষ সহজে কেহ দেখাইয়া দেয় না বা দিতে সাহস করে না, তাই ঈদৃশ ব্যক্তিগণের কল্যাণার্থ স্বামীজী কখন কখন তাঁহাদিগকে একটু তিরস্কার করিয়া থাকেন। পরমপদ-লিপ্সুর পক্ষে, প্রকৃত সুখেপ্সুর পক্ষে অভিমান যে মহাশত্রু, ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীজী সদাই চেষ্টিত থাকেন; বিদ্যার উচ্চ পর্ব্বে স্থিত হইলেও, যোগসম্পদের অনেকতঃ লাভ হইয়া থাকিলেও, অভিমান যে মুমুক্ষুকে তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য হইতে দূরে রক্ষা করে, তাহা সর্ব্বদাই বুঝাইয়া দিতে প্রয়াসী হয়েন।

ধনী হউন, দরিদ্র হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, যে কেহ একবার স্বামীজীর চরণ-সন্নিধানে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অলৌকিক কারুণ্য ও প্রেম উপলব্ধি করিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং ততঃপর চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইয়া থাকিয়াছেন।

স্বামীজীর জীবনের একটি বিশিষ্টতা এই যে, জীবনে তিনি কখনও, নিতান্ত অসম্ভব না হইলে, কাহারও মনে কোনরূপ আঘাত দেন না, একেবারে অসম্ভব না হইলে কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না, অহিংসা ধর্ম্মপালনের সর্ব্বভৌমরূপ "সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ" (যোগসূত্রভাষ্য) তাঁহার জীবনেই দেখিতেছি, জ্ঞানতঃ কোন প্রাণীকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহরূপ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মজ্ঞের উত্তম বৃত্তির দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতেছি ("অদ্রোহেনৈব ভূতানাম্" —মনুসংহিতা), যতিধর্ম্মপালনের প্রকৃষ্টরূপ ("সত্যবাক্ শুচিরদ্রোহী"—নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ) তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারেই লক্ষ্য করিতেছি। যে বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ অধিকার, যদি কোনরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, যে অধিকারের ব্যবহার করিতে যাইলে অন্য কোন ব্যক্তি, শরীরের কথা

ত দূরে থাকুক, মনেও বিন্দুমাত্র বাধা অনুভব করিবে, তাহা হইলে সে অধিকার তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি—"ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, তাঁহার কৃপা হইলে কিছুই অসাধ্য নহে, ইত্যাদি কথা আমরা বহুশঃ শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু এ সকল কথার আমরা যে সম্যক্ উপযোগ করিতে পারি না, তাহার কারণ কি? এই সকল কথায় আমাদের হৃদ্দি বিশ্বাস জন্মে না, ইহাই তাহার কারণ। কেবল শ্রবণ করিলে, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলে, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করণোপযোগী পূর্ব্বসংস্কার না থাকিলে কাহারও কোন তত্ত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে না, কেহ কোন তত্ত্বদ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারে না। তাহার পর, 'ভগবানের কৃপায় অসম্ভব ও সম্ভব হইতে পারে' এই কথাটির অর্থও আমরা ঠিক বুঝি না, এই নিমিত্ত অনেক সময় ইহাতে ঠিক বিশ্বাস ও আমাদের হয় না। আমরা মনে ভাবি, 'অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাহা কখনই হইতে পারে না'। কথা সত্যই, অসম্ভব কখন সম্ভব হইতে পারে না, কখন হয় নাই, কখন হইবেও না। কিন্তু আমরা যাহাকে অসম্ভব বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহাই বস্তুতঃ অসম্ভব নহে। আমাদের হৃদয়ে 'ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব,' ইত্যাকার যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, আমরা সহজে তাহা অপনোদন করিতে পারি না, আমাদের এইরূপ ধারণা বা সংস্কার দ্বারা নিরূপিত সম্ভব্যতার সীমাই যে সম্ভাব্যতার প্রকৃত সীমা নহে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

মহাত্মাগণের জীবনে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখা যায় তাহা বস্তুতঃ

'অসম্ভব' সম্ভব হওয়ার দৃষ্টান্তস্থল নহে। সকলই ঐশ বা প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে, নিয়ম অতিক্রম করিয়া কিছু হয় না, যাহা কিছু হয় নিয়মানুসারেই হয়। অতএব মহাত্মা যে মহাত্মা হন তাহা কোন নিয়মানুসারেই হইয়া থাকেন, তিনি যে মহাত্মোচিত (সাধারণের অসাধ্য) কার্য্যসকল সাধন করিয়া থাকেন, তাহাও নিয়মানুসারেই করিয়া থাকেন। কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি মহাত্মা হইতে পারিয়াছেন, পূর্ণভাবে দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিয়াছেন, পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা আমাদিগের জ্ঞাতব্য এবং কেবল তাহাই জানিলে হইবে না, কিরূপে তাহাদের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাও অন্বেষ্টব্য। এই নিমিত্তই মহাপুরুষের জীবনীর এত প্রয়োজন, এই নিমিত্তই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে মহাপুরুষের জীবনীর এত যত্ন ও আদরের সহিত লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, এবং তাঁহার স্মৃতি চিরদিন রক্ষিত হইয়া থাকে। জগতের প্রকৃত কল্যাণ মহাত্মার জীবনী দ্বারা যেরূপ সাধিত হয়, এরূপ আর অন্য কোন উপায়ে হয় না।

আমি যাহা করিতে পারি নাই, অথচ যাহা করিতে পারিলে, মনে বিশ্বাস, সুখী হইব, শান্তি পাইব, যদি দেখিতে পাই, তাহা কেহ করিয়াছেন এবং করিয়া সুখ-শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে, মনে বড় আনন্দ হয়, মুমূর্ষু আশা পুনরুজ্জীবিত হয়, মনে হয়, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা বস্তুতই সত্য, তাহা কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে, তাহা প্রবঞ্চন-বাক্য নহে, শাস্ত্র মিথ্যা নহে, শাস্ত্র বস্তুতই সত্য। প্রাপ্তব্য আজ না পাই, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা যে সৎ পদার্থ, তাহা যে একদিন পাইতে পারিব, এই জ্ঞানই প্রাণবন্ধন হয়, জানি না ইহা হইতে অধিক প্রাণদায়ক আর কিছু আছে কিনা।"

পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সুকৃতি না থাকিলে কাহারও পক্ষে প্রকৃত মহাত্মার

দর্শন বা সঙ্গলাভ ঘটে না। আমার তাদৃশ কিঞ্চিৎ সুকৃতি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্কৃতিও কিছু আছে যাহার ফলে সুকৃতির পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে এখনও সমর্থ হই নাই,—কিছু দীর্ঘকাল শ্রীচরণসঙ্গ করিয়া পূর্ণ সাফল্য লাভের সময় ও সুযোগ পাইতেছি না।

মহারাজ জীউর শ্রীচরণসঙ্গ লাভ করিবার পর হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বহুসঞ্চিত সুকৃতি এইবার ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, নচেৎ আমি এরূপ মহাপুরুষের শ্রীচরণসঙ্গ লাভে ধন্য হইতে পারিতাম না। কিন্তু বলা বাহুল্য, যথার্থ চরণসঙ্গ আমি করিতে পারি নাই। চরণ সন্নিহিত হইতে পারিলেই প্রকৃত সঙ্গ করা হয় না, তন্নিমিত্ত বিশিষ্ট যোগ্যতার আবশ্যক ; আমার সে যোগ্যতা নাই, অতএব আমি সঙ্গের পূর্ণ ফললাভ করিতে পারিতেছিনা ; পূর্ণভাবে নিরভিমানতাদি-গুণবিশিষ্ট না হইলে কেহ মহাত্মা-চরণসঙ্গের যথার্থ ফললাভে সমর্থ হন না।

স্বামীজীর শ্রীচরণসঙ্গ করিতে করিতে তাঁহার কৃপায় কিছু বিমল দৃষ্টি লাভ হইয়াছে, বেদ ও শাস্ত্রের কিছু ক্ষীণ আভাস আমার বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যজাতির স্বরূপ ও পূর্ব্ব-গৌরব কিছু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই দৃষ্টির সাহায্যে ভারতের দিনে দিনে উপচীয়মান দুর্গত অবস্থা যতই উপলব্ধি করিতেছি, ভারতের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে স্বধর্ম্মত্যাগ ও সদাচারবর্জ্জন যতই নয়নের বিষয়ীভূত হইতেছে, পর-ধর্ম্ম ও অনাচারের খরপ্রবাহ যতই দৃগ্‌গোচর হইতেছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসেতু কালপ্রভাবে যতই দুর্ব্বল ও ভগ্নপ্রায় হইতে দেখা যাইতেছে, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের যতই অনার্য্যোচিত ব্যবহার প্রত্যক্ষ হইতেছে, ততই মনে হইতেছে বর্ত্তমান ভারত ভগবানের প্রসাদ হারাইয়াছে, তাঁহার কোপভাজন হইয়াছে।

প্রত্যক্ষতঃ ব্যাপকভাবে জগৎ-কল্যাণ-ক্ষেত্রে অবতরণপূর্ব্বক কার্য্য করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকবার বিশেষ প্রার্থনা করিলে পরমারাধ্য স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"শাস্ত্ররীতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কাহারও কল্যাণ করিবার চেষ্টা করিলে সে ফলবতী হয় না ; জ্ঞানপিপাসা যাহার উদ্রিক্ত হয় নাই, তাহাকে জ্ঞান দানপূর্ব্বক জ্ঞানী করিতে যাইলে সে প্রযত্ন সফল হয় না, সে ব্যক্তি জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করে না, যাহার পিপাসা নাই, তাহাকে সুবাসিত, সুশীতল ও সুমিষ্ট জল দিলেও সে তাহা পান করে না ; শাস্ত্রে এই নিমিত্ত অধিকারী বিচারপূর্ব্বক উপদেশ দিতে বলিয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রের অনুদারতা প্রকাশ করা হয় নাই, বরং ইহা দ্বারা যাহা প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিধান শাস্ত্র তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি জীবনে ইতঃপূর্ব্বে এরূপ চেষ্টা কিছু করিয়াছি, নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাগত জনগণকে জ্ঞানোপদেশসকল শ্রবণ করাইয়াছি, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কাহারও কিছু উপকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত নহি। কাল নিজ প্রভাব বিস্তার করিবেই, একালে কাহারও প্রকৃত কল্যাণ করিতে পারা সুকঠিন হইবে, একালে প্রকৃত কল্যাণহেতু বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিগুপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব প্রাণপণে শাস্ত্রানুগত জীবন যাপন করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়াই জাতীর যথার্থ সেবা, কারণ শতসহস্র বক্তৃতা বা উপদেশ অপেক্ষা একটি আদর্শ জীবনের প্রভাব অত্যধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

জাগতিক কল্যাণ অনিত্য, একটু বিচার করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী কতবার আসিল গেল, প্লাবন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে, মানব প্রত্যক্ষ চেষ্টা না করিলেও ইহারা আইসে, মানব বরাবর রাখিতে চেষ্টা করিলেও ইহারা থাকে না,

ইহারা আপন মনে আপন বিহার ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার জীব আপাতমনোহর সুখের মোহে পড়িয়া যে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করিয়াছিল সেই দুষ্কৃতির আকর্ষণ লুপ্ত হইলে ইহারা চলিয়া যায়। ইহারা আগমাপায়ী, যাতায়াত ইহাদের স্বভাব—এইজন্য ইহা সহ্য করিয়া স্থায়ীকল্যাণ লাভের জন্য প্রয়াস করাই শ্রুতির অনুমোদিত। শ্রীভগবান্‌ও গীতামুখে বলিয়াছেন—"আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত!"

জগতে বহু দুঃখ আছে প্রতীকার ত অনেক হইতেছে কিন্তু তাহাতে কি স্থায়ী ফল হইতেছে? যে অবস্থার সংযোগে দুঃখ আসিয়াছে মানব কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া সে অবস্থার প্রতিকারার্থ প্রত্যক্ষ ও আনুমানিক উপায়ে ত কত চেষ্টাই করিতেছে; ব্যষ্টি শক্তি বিফল মনোরথ হইলে সমষ্টি শক্তি গঠন করিয়া তাহার প্রতিকার করিতেছে; কিন্তু ব্যষ্টি শক্তিই হউক অথবা সমষ্টি শক্তিই হউক—অসাধক সাধকের শক্তি সীমাবদ্ধ, এই সীমাবদ্ধ শক্তির কার্য্য-ফলও সীমাবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে মানবের অবস্থা যখন কর্ম্মফলের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে, তখনই পুনরায় দুঃখরাশি পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে বা নবীন মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হয়। এই জন্যই ভারতের মহর্ষিগণ লৌকিক উপায়ে উদাসীন হইয়া—গুরূপদেশ লব্ধ অলৌকিক উপায়ের শরণাপন্ন হইয়া দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপন দুঃখ খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখ খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ, ব্যষ্টির সমষ্টিই জাতি অতএব ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যষ্টির সংশোধনই সমাজের এবং জাতির সংশোধন। এই জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত চরিত্র-গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়া গিয়াছেন। আর অধুনাতন জীব আপন দুষ্কৃতিবশে অলৌকিক উপায়ে শ্রদ্ধাহীন সুতরাং অলৌকিক উপায় সেবনের উপযোগী একাগ্রতা, একনিষ্ঠা ও সংযমের অভাজন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম

অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অসমর্থের সম্বল বচন মাত্র। সুতরাং আধুনিক জীব স্বীয় অসমার্থ্য বচন-মায়ায় গোপন করিয়া সনাতন পন্থার দোষানুসন্ধান-পরায়ণ, ইহারাই জনহিতকর কর্ম্মযোগ্যতা লাভের জন্য সাধনাকে স্বার্থপরতা মনে করেন। ফলতঃ যোগ্যতালাভের সাধনা স্বার্থপরতা নহে—কারণ তাহা হইলে বিদ্যার্থী যখন জাগতিক সর্ব্ববিধ দুঃখের প্রতীকারার্থ বিদ্যানুশীলন করেন, তাহাও স্বার্থপরতা বলিতে হয়, অথচ এই স্বার্থপরতায় যাঁহারা অসিদ্ধ, এমন মূর্খজনের চেষ্টায় কোন্ দুঃখের প্রতিকার হওয়া সম্ভব? **প্রত্যক্ষতঃ ঈশ্বর-আদেশ প্রাপ্ত না হইয়া জগৎ-কল্যাণ করিতে যাওয়া স্ব-পর-হানিকর।**

আপৎকালে শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামী-পাদ মহারাজ জীউর শ্রীমুখ হইতে নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্ত উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইয়াছিলাম—

"বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয়োঽধ্যায় প্রথম-ব্রাহ্মণে দেখা যায়—অমুখ্য (সগুণ)-ব্রহ্মমাত্র-দর্শী গার্গ্য, পরমব্রহ্ম-তত্ত্বশ্রবণোৎসুক রাজা অজাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি (গার্গ্য) স্বয়ং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে মুখ্যভাবে কিছুই জানেন না; সুতরাং মুখ্যব্রহ্ম-তত্ত্ব-শ্রবণোৎসুক অজাতশত্রু অমুখ্যব্রহ্মজ্ঞ গার্গ্যকে বলিলেন, তুমি যখন এইরূপ হইয়াও আমাকে মুখ্য ব্রহ্মোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব 'আমার বোধ হইতেছে যে, তোমার সে ব্রহ্মজ্ঞান নাই। "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি"—এইপর্য্যন্ত জানিলেই পরমব্রহ্ম জ্ঞাত হন না। এস্থলে রাজা অজাতশত্রু "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি" এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মই তোমার জ্ঞাত সগুণ ব্রহ্মের

অতীত, যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম আছেন, তিনিই জীবগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

গার্গ্য জানেন—যে শিষ্য গুরুর (অধ্যাপকের) নিকট উপসন্ন না হন অর্থাৎ যথাবিধি স্নানাচমন পূর্ব্বক কুশহস্তে শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, 'ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন' এইরূপ প্রার্থনা না করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ করিতে নাই, এজন্য বেদ-বিধিজ্ঞ গার্গ্য স্বয়ংই অজাতশত্রুকে বলিলেন যে, অপরাপর শিষ্যগণ যে ভাবে গুরু-সমীপে উপস্থিত হন, আমি তদ্রূপে ব্রহ্ম-তত্ত্বলাভার্থ আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি, অতএব আপনি আমাকে পরব্রহ্ম-তত্ত্বউপদেশ করুন—"স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বায়ানীতি।" (বৃহদা° ২।১।১৪)

অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন "প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়-মুপেয়াদ্ "ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি' ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি"। (বৃহদা° ২।১।১৫) অর্থাৎ স্বয়ং শ্রুতি অজাতশত্রুর মুখে বলিতেছেন—তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ বেদদীক্ষাদি-আচার্য্য-কার্য্যে অধিকারী, তাঁহার পক্ষে স্বভাবতঃ অনাচার্য্য (অর্থাৎ বেদদীক্ষাদি-আচার্য্য-কার্য্যে অনধিকারী) ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক 'আমাকে ইনি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিবেন,' এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া বড়ই বিপরীত কার্য্য এবং বেদদীক্ষাদি-আচার-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহেও ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, তুমি আচার্য্যভাবেই অবস্থান কর ; যাহা অবগত হইলে অবশ্য-জ্ঞাতব্য সেই পরমব্রহ্ম পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারা যায়, আমি তোমাকে সেই মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ করিবই॥ এই বলিয়া রাজা অজাতশত্রু গার্গ্যকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কর গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিলেন এবং একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা গার্গ্যকে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। (ইহা **আপৎকালের ব্যবহার**)—"স হোবাচাজাতশত্রুঃ

প্রতিলোমং বিপরীতঞ্চ, তৎ কিং, তদ্ যদ্‌ব্রাহ্মণ উত্তমবর্ণ আচার্য্যত্বেঽধিকৃতঃ সন্ ক্ষত্রিয়মনাচার্য্য স্বভাবম্ উপেয়াৎ উপগচ্ছেৎ শিষ্যবৃত্ত্যা 'ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি' এতৎ আচারবিধিশাস্ত্রেষু নিষিদ্ধম্। তস্মাৎ তিষ্ঠ ত্বম্ আচার্য্য এব সন্। বিজ্ঞপয়িষ্যামি এব ত্বামহম্। যস্মিন্ বিদিতে ব্রহ্ম বিদিতং ভবতি। যত্তম্মুখ্যং ব্রহ্ম বেদ্যং তং গার্গ্যং সলজ্জমালক্ষ্য বিশ্রম্ভজননায় পাণৌ হস্ত আদায় গৃহীত্বা উত্তস্থাবুত্থিতবান্।" (শাঙ্করভাষ্য)।

উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠোঽধ্যায় দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণে গৌতম ও জৈবিলি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—গৌতম এই প্রকারে বলিলে পর রাজা জৈবিলি তাঁহাকে বলিলেন—গৌতম! শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে তুমি আমার নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা কর। অনন্তর গৌতম বলিলেন যে, আমি শাস্ত্রবিহিত নিয়ম অনুসারে আপনার নিকট (বিদ্যা)-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি—"স বৈ গৌতম! তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি।" (বৃহদা° ৬।২।৭) "স ত্বং বৈ হে গৌতম! তীর্থেন ন্যায়েন শাস্ত্রবিহিতেন বিদ্যাং মত্ত ইচ্ছাসৈ ইচ্ছস্ব আপ্তুম্, ইত্যুক্তো গৌতম আহ-তীর্থে উপৈমি উপগচ্ছামি শিষ্যত্বেন অহং ভবন্তমিতি।" (শাঙ্করভাষ্য)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণও আপৎকালে অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া ক্ষত্রিয়কে, এমন কি, বৈশ্যকে বিদ্যাগুরুত্বে বরণ করিতেন। কিন্তু এই শিষ্যত্ব-স্বীকার দ্বারাই তাঁহারা বিদ্যাগ্রহণ করিতেন। নচেৎ এ বিষয়ে উচ্চবর্ণ শিষ্য নীচবর্ণ গুরুকে উপঢৌকন ও শুশ্রূষার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন না। এই জন্য গৌতম উপঢৌকন ও শুশ্রূষার নাম মাত্র কীর্ত্তন করিয়াই রাজার নিকট বাস করিয়াছিলেন—"বাচা হ স্মৈব পূর্ব্ব উপযন্তি স

হোপায়নকীর্ত্ত্যা উবাস।” (বৃহদা০ ৬।২।৭) “বাচা হ স্ম এব কিল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিদ্যার্থিনঃ সন্তো বৈশ্যান্ বা, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যান্ আপদ্দি উপযন্তি শিষ্যবৃত্ত্যা হ্যপগচ্ছন্তি ন উপায়ন-শুশ্রূষাভিঃ। অতঃ স গৌতমঃ হ উপায়নকীর্ত্ত্যা উপগমন-কীর্ত্তনমাত্রেণ এব উবাস উষিতবান্ উপনয়নং চকার।” (শাঙ্করভাষ্য)। (এস্থলেও আপৎকালের ব্যবহারই পাওয়া যাইতেছে)।

আপৎকালে কোন ব্রাহ্মণবিদ্যার্থী যখন কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিতেন; তখন সেই ব্রাহ্মণবিদ্যার্থী শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় উচ্চারণমাত্র করিয়াই অপেক্ষাকৃত হীনজাতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট অল্পকাল বাসপূর্ব্বক বিদ্যাগ্রহণ করিতেন, [যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—“বাচা হ স্ম এব উপযন্তি সঃ” (বৃহদা০ ৬।২।৭) এবং স্মৃতি বলিতেছেন— “নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ” (মনু০ ২।২৪২) অর্থাৎ অব্রাহ্মণ গুরুর নিকট [ব্রাহ্মণ]-শিষ্য দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিদ্যালাভার্থ বাস করিবেন না], এবং উচ্চবর্ণ শিষ্য নীচবর্ণ গুরুকে অনুগমন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শুশ্রূষার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন না (“নোপায়নশুশ্রূষাভিঃ”—শাঙ্করভাষ্য), এবং উচ্চবর্ণের শিষ্যকে পুনঃ উপনয়ন সংস্কার করাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনও করান হইত না। এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন—“তান্ হ অনুপনীয় এব এতৎ উবাচ” (ছান্দোগ্য, ৫।১১।৭) অর্থাৎ অশ্বপতি সেই ছয়জন ব্রাহ্মণের নিকট যথোক্ত (পঞ্চাগ্নি)-বিদ্যার উপদেশ প্রদানে উৎসাহী হইয়া উপনয়ন না করিয়াও যথাযোগ্য বিদ্যা প্রদান করিলেন—“তেভ্যশ্চ অদাৎ বিদ্যাং বিবক্ষুঃ অনুপনীয় এব উপনয়নম্ অকৃত্বা এব তান্ যথা যোগ্যেভ্যো বিদ্যাম্ অদাৎ” (শাঙ্করভাষ্য)।

ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল এই পাঁচজন মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণ মিলিয়া আত্মাভিন্ন ব্রহ্ম মীমাংসায় অক্ষম হইয়া নিশ্চয় করিবার জন্য উদ্দালক ঋষির নিকট গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই তত্ত্ব উদ্দালকও সম্যগ্‌রূপ জানিতেন না, তাই তাঁহারা ছয়জন কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট গমন করিয়া রাজাকে বলিলেন—'সম্প্রতি, তুমি যে বৈশ্বানর আত্মাকে স্মরণ করিতেছ, তাহা তুমি আমাদিগকে বল।' কিন্তু রাজা তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রত্যেককে বলিয়াছিলেন—'আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিতেছেন?' প্রাচীনশাল প্রভৃতি প্রত্যেকে যথাক্রমে বলিয়াছিলেন—(১) 'আমি দ্যুলোককে বৈশ্বানর বলিয়া জানি অর্থাৎ উপাসনা করি'। (২) 'আমি সূর্য্যকে বৈশ্বানর বলিয়া জানি'। (৩) 'আমি বায়ুকে বৈশ্বানর বলিয়া জানি'। (৪) 'আমি আকাশকে বৈশ্বানর বলিয়া জানি'। (৫) 'আমি জলকে বৈশ্বানর বলিয়া জানি'। (৬) 'আমি পৃথিবীকে বৈশ্বানর বলিয়া জানি'। অনন্তর রাজা দ্যুলোককে সুতেজস্ত্ব গুণ, সূর্য্যকে বিশ্বরূপত্বগুণ, বায়ুকে পৃথগ্‌গতিত্বগুণ, আকাশকে ব্যাপিত্বগুণ, জলকে ধনত্বগুণ ও পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠাত্বগুণ বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দ্যুলোক, সূর্য্যপ্রভৃতি ভগবান্ বৈশ্বানরের অঙ্গসমূহে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের যথাক্রমে মস্তকপতন, অন্ধতা প্রাণগমন, দেহবিশীর্ণতা, বস্তিভেদ ও পাদশোষ হইত। এইরূপে রাজা ঐরূপ এক একটী উপাসনার নিন্দা করিয়া 'সুতেজস্ত্বগুণযুক্ত দ্যুলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, বিশ্বরূপত্বগুণযুক্ত সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, নানাগতিত্ব গুণযুক্ত বায়ু ইঁহার প্রাণ, বহুলত্ব (ব্যাপিত্ব) গুণযুক্ত আকাশ ইঁহার সন্দেহ অর্থাৎ মধ্যদেশ, ধনত্বগুণযুক্ত জল ইঁহার বস্তি (মূত্রস্থান) এবং প্রতিষ্ঠাত্ব-গুণযুক্ত পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়'—এইরূপে দ্যুলোক, সূর্য্য প্রভৃতিতে

মস্তকাদি দৃষ্টির উপদেশ দিয়া "যস্ত্বেতমেবং" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়া সমস্ত বৈশ্বানরের ধ্যানবিধি বলিয়াছিলেন।

ইহা হইতে যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, সুতরাং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন। এইরূপ আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে বলিব, ব্রাহ্মণ ব্যতীত উপদেশ দিবার অধিকার অন্যবর্ণের নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরু বা উপদেষ্টা হইতে পারে না ; তবে **আপৎকালে** অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাব হইবে, তখন ক্ষত্রিয় বা তার অভাবে বৈশ্যের নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারা যায়। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

অব্রাহ্মণা-দধ্যয়ন-মাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাব-দধ্যয়নং গুরোঃ॥ (২।২৪১)

ইহার তাৎপর্য্য এই—(সর্ব্ববর্ণের স্বভাবতঃ গুরু "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ") ব্রাহ্মণ জাতি **আপৎকালে উপস্থিত হইলেই** (অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে) ব্রাহ্মণ ভিন্ন [ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য] বর্ণের নিকট অধ্যয়ন স্বীকার করিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবেন, সেই সময় পর্য্যন্ত অনুগমনই (তাঁহার সহিত যাইবার সময় তাঁহার আগে আগে না চলিয়া তাঁহার পিছে পিছে গমনই) শুশ্রূষাস্থানীয় হইবে। এ বিষয়ে ভগবান্ ব্যাসও বলিয়াছেন—

"মন্ত্রদঃ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রৈঃ শুশ্রূষ্যোঽনুগমাদিনা।
প্রাপ্তবিদ্যো ব্রাহ্মণস্তু পুনস্তস্য গুরুঃস্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অনুগমনাদি (তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলে বসিয়া না থাকা এবং তাঁহার সহিত যাইবার

সময় তাঁহার পিছু পিছু যাওয়া) দ্বারা ক্ষত্রিয় গুরুর (অধ্যাপকের) শুশ্রূষা করিবেন। পরে সেই (জন্মতঃ সর্ব্ববর্ণের গুরু) ব্রাহ্মণ যখন (তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণদত্ত অথবা গচ্ছিত) বিদ্যা (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট হইতে) প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ হইবেন, তখন তিনি পুনরায় সেই (আপৎকালীন) ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য-আচার্য্যের গুরু হইবেন।

এস্থলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাব হওয়ায় প্রাচীনশাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় অধিপতির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। **ইহা বিশেষ বিধি, ইহা সামান্য বিধি নহে; ইহা আপদ্ধর্ম্ম; ইহা সামান্য ধর্ম্ম নহে।** এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন নগরেই ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাব হয় নাই—এখন পর্য্যন্ত সময়ানুসারে শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য আপদ্ধর্ম্ম-কাল আসে নাই। অতএব, তব্রাহ্মণ দ্বিজ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখাইয়া পাপ-অর্জ্জনে উৎসাহ কেন? কার্য্য ও অকার্য্যবিষয়ে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও প্রকরণ অনুসারেই নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্রকৃপা হইলে শাস্ত্র শ্রদ্ধার উদয় হয় তখন শাস্ত্রসমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে প্রকরণভেদে শাস্ত্রের প্রতি বাক্যটীই সার্থক।

অধিকন্তু, আপদ্ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপযুক্ত শ্রৌত দৃষ্টান্ত তিনটীই **অধ্যয়ন বিষয়ক** কিন্তু **মন্ত্রদীক্ষা বিষয়ক** নহে। 'মন্ত্রদীক্ষা' সম্বন্ধে 'নারদ পঞ্চ-রাত্রে' উপদিষ্ট হইয়াছে—

"বর্ণোত্তমেঽথবা গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বা, নাত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনঃ॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ স্বদেশে কিম্বা বিদেশে শ্রেষ্ঠবর্ণের গুরু বিদ্যমান থাকিলে অথবা বিদ্যমান আছেন শুনিলে পর, আত্মকল্যাণকামী শ্রেষ্ঠবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে নীচবর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ উচিত নহে। এইরূপ প্রতিলোমক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, উভয়ের ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব, শাস্ত্রোক্ত বিধি অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য।

"ক্ষত্র-বিট্-শূদ্র-জাতীয়ঃ প্রতিলোমং ন দীক্ষয়েৎ।" —(ঐ) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তির প্রতিলোমক্রমে দীক্ষাদান কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ নীচবর্ণের গুরুর উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে মন্ত্রদান করা উচিত নহে যেহেতু এরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য এরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়পক্ষে ইহ ও পরলোকে হানিকর)। অতএব, যে অব্রাহ্মণ-শরীরী সাধুবেষী ও গৃহাশ্রমীগণ এই তিনটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কথারজালে ভুলাইয়া 'মন্ত্রদীক্ষা' দিয়া শিষ্য করে, তাহারা যে শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ পাপকার্য্য করিয়া নিজেদের নরক গমনের রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা জানাইয়া দেওয়াই এস্থলে উক্ত শ্রুতি-কথিত দৃষ্টান্তত্রয় উল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আহার, বিহার ও ব্যবহার-কারী সাধুবেষধারীরা যে বলিয়া থাকে—'আমাদের মনোযোগের সাধন, বাহিরের আহারাদির আমরা বিচার করি না,' তাহাদের জিজ্ঞাস্য—তাহা হইলে তোমরা কেবলমাত্র **মনের** পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া চলিলেই ত পারিতে, **বাহিরের** 'বেষের' **পরিবর্ত্তন** এবং **বাহিরের** নামের পরিবর্ত্তন কেন করিয়াছ? না এরূপ না করিলে যে, খাবার থাকবার ও টাকা রোজগারের এবং সম্মান ও নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সুবিধা করা যায় না বা সুবিধা হইয়া উঠে না, কেমন? ধন্য কলি-যৌতুক। ইহামুত্র নরক-গুলজারের উপযুক্ত বুদ্ধি তোমাদের আছে বটে! ধর্ম্মের নামে দোকানদারিতে তোমরা নিপুণ বটে।"

অধুনা শ্রীশ্রীপূর্জ্যচরণ স্বামীজী মহারাজ একজন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান্ মহাপুরুষরূপে শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ নামে বিরাজিত রহিয়াছেন।

বিজয়াদশমী, সং ২০০৫
শ্রীশীতলা মন্দির,
সণ্ডীলা (হরদোঙ্গ)।

শ্রীগুরু-চরণ-শরণ
বাবুলাল গুপ্ত 'শ্যাম'

(৩)

'হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাক্‌সন্ কোম্পানি লিমিটেড্' বোম্বের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন—"ছোটবেলা হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ হৃদয়ে ছিল। তাই, বোম্বেতে 'হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাক্‌সন্ কোম্পানি'র প্রধান কেন্দ্রে কাজ করিবার কালে যখন বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশনে পরিচিত হবার সুযোগ পাইলাম, তখন মনে আনন্দ হইল। সেখানে সব মহারাজদের সঙ্গেই পরিচয় হইল, খুব জানাশুনা হইল। কিন্তু, কেন যেন আমি মনে মনে ভাবিতে পারিলাম না যে, তারা ভগবানে পৌছিবার রাস্তা বলে দিতে পারবেন। মনে মনে এই ধারণা সর্ব্বদাই হইত তাদের জিজ্ঞাসা করিতে 'আপনারা ঠিক ঠিক রাস্তা পেয়েছেন কি? 'কামিনী কাঞ্চন' থেকে "আপনাদের মন উঠে গেছে কি? নাম যশ ও বিলাসিতার পিপাসা মিটিয়াছে কি? আপনাদের ভোজনে সংযম আসিয়াছে কি?' আমি এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আলোচনা করিব না, কারণ, তার বিষয় সকলেরই

জানা আছে ; তবে, এটুকু না বলে পারব না যে, যাদের ভগবানের দরবারে পৌঁছিবার উদ্দেশ্য, তাদের স্থান রামকৃষ্ণ মিশনে নয়।

যাক্—একবার বোম্বেতে স্বামী বিরজানন্দ এলেন। দলে দলে লোক দীক্ষা নিতে আরম্ভ করল। যিনি সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে আমাকে আন্তরিক স্নেহ করতেন ও এখনও করেন, তাঁরও ইচ্ছা ছিল আমিও এসে বিরজানন্দজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেই। কিন্তু কেন জানিনা তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনে একটুও আগ্রহ হইল না। সবাই দুঃখ করিলেন আমি সুযোগ হারালাম। যাক্, শুনে এসেছিলাম সদ্‌গুরু নিজে এসে ত্রাণ করেন। তাই আশায় ছিলাম কবে তিনি আসেন। মিশনে এটুকু অভিজ্ঞতা পেলাম, তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করা যায়, রাজনীতিক আলোচনা করা যায় কিন্তু পারমার্থিক কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা সে সুযোগ আমার দীর্ঘকালেও হয় নি।

বোম্বেতে যেখানে চাকুরী করিতাম, সেখানকার উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়ে চাকরী গেল এবং সেখান থেকে আলমোড়াতে চলে গেলাম। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে দু মাস ছিলাম। সেই দু মাসে আমার মনে এ ভাব আরও দৃঢ় হইল যে, এখানে সকলেই নিজে-দের রাস্তাই চেনেন নি, অন্যকে রাস্তা দেখাবার শক্তি কোথায়? পুথিগত বিদ্যা প্রচুর আছে, তা হয়ত অনেকেই চেষ্টা করলে করতে পারেন, তাতে কি ধর্ম্ম-পিপাসুর পিপাসা মেটে? সে দেখতে চায় প্রত্যক্ষ। এমন্নি ভাবে গুরুলাভ বিষয়ে নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে এলাম।

২, ৩ মাস ঘুরে কোনারে 'হিন্দ প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং' এ চাকুরী নিলাম। ৮, ৯ মাস যখন এখানে কেটে গেছে, তখন একদিন

একখানা চিঠি পেলাম সৌরেন রায় B.A.B.com. এর কাছ থেকে সে পূর্ব্বে আমার কাছে কাজ করেছে। সে লিখল—'আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেব হাজারিবাগে যাচ্ছেন। সেখানেই শীতের ২, ৩ মাস থাকবেন। আপনি সাধুসঙ্গ ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে আনন্দ পাবেন।' হাজারিবাগ কোনার থেকে ২৬।২৭ মাইল। কাজে আমি এত ব্যস্ত ও মগ্ন থাকি যে, কাজের সময় অন্য চিন্তা মনে আসেই না। তাই হাজারিবাগ যাবার সময়ও করে উঠতে পারিনি। সৌরেনের বড় ভাই 'রেডিও এবং ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার' সমর রায়ও এখানে কোনারেই চাকুরী করে D.V.C. তে। সেও আমার পূর্ব্ব পরিচিত এবং পূর্ব্বে আমার কাছেই কাজ করেছে। হঠাৎ একদিন কাজ করতে বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি কেটে যায় এবং একদিনের জন্য বিছানা নিতে হয়। তৃতীয় দিনে সমর এল আমায় দেখতে। সে বলল 'আমি সুরিয়া (হাজারিবাগ) যাচ্ছি। শ্রীশ্রীগুরু-দেব এসেছেন।' সৌরেনের কথা মনে পড়ল। ডাক্তার আমার স্বভাব জানেন, আমি কাজ-পাগল; তাই বলেছিলেন—'একেবারে বিশ্রাম ৭ দিন, কোথাও কাজে যেতে পারবেন না।' কিন্তু মনটা সাড়া দিয়ে উঠল মহাপুরুষের দর্শন করে আসি। ডাক্তারকে অনুনয় পত্র পাঠালাম যে, তিনি যদি দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন, তবে হাজারিবাগ রোড ঘুরে আসি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে পাঠালেন 'যেতে পারেন, তবে হাতে যেন কোন Strain না পড়ে।'

সদ্‌গুরুর ডাক পড়েছে, কেউ কি আমায় আটকাতে পারে। গেলাম সেখানে, জুতো খুলে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। তিনি তখন চেয়ারে বসেছিলেন। হাসি হাসি ভাব কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোন জগতে বিচরণ কচ্ছেন। প্রণাম করলাম। পদতলে বসলাম।

এই আমার জীবনে প্রথম নিজের পিতামাতা ও গুরুজন ছাড়া অন্য কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা। সারাদিন ছিলাম। পারমার্থিক কোন আলোচনাই হয় নি কিন্তু তবু আমার মনে একটা আলোড়ন এল। আসার পূর্ব্বে আবার প্রণাম করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'পত্র দিলে জবাব দেবেন ত?' সেই হাসি হাসি মুখে জবাব দিলেন 'নিশ্চয় দেব।'

বাসায় ফিরে এসে রাত্রেই একখানা পত্র দিলাম তাঁকে। তাতে নিজ জীবনের সামান্য নক্সা এঁকে দিলাম, যাতে আমাকে জানতে তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়। উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গে। চিঠিখানা খুলতে প্রাণে আমার শিহরণ এল। ভাবলাম, তিনি কি আমাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক বলে লিখেছেন, না নিরাশ করেছেন। চিঠি পড়ে আনন্দ আর ধরে না। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন। দিনস্থির করেছেন যেদিন আমাকে শ্রীচরণে স্থান দেবেন। চলে গেলাম তাঁর কাছে। যিনি সব চেয়ে বেশী মনে মনে আমার মঙ্গল কামনা করেছেন অলক্ষ্যে এবং যাঁর একাগ্র ইচ্ছায় আমি শ্রীগুরুচরণে স্থান পেলাম, তিনি হলেন সমরের মা—আমারও মা। তাঁর গুরুভক্তি ও গুরুসেবা আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বদা অনুকরণীয়। গুরুসেবার জন্য তিনি শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না, অর্থকে অর্থ জ্ঞান করেন না আর সর্ব্বদা গুরু-কথা নিয়া থাকেন। আমি নিশ্চয় যাব বলেই তিনি সব যোগাড় করেছেন--ফুলের মালা, ফুল-বেলপাতা-তুলসী-চন্দন-ধূপ-দীপ-অর্ঘ্য-গঙ্গাজল-সব বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। এ রকম মা যদি সবার ঘরেই থাকত ও সব সন্তানেরা এমন মাকে চিনত, তবে হয়ত কোনও সংসারে কোন অভাব, অভিযোগ, দুঃখ দেখা দিত না। স্নেহ ও আদর যদিও দূর থেকে মা বর্ষিত করে থাকেনই সর্ব্বদা কিন্তু এখন মার আদর ও স্নেহ প্রত্যক্ষ পাবার সৌভাগ্য হয়েছে ও ধন্য হয়েছি।

ঠাকুর আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার যেন এক নূতন জীবন এল। শরীরের ভিতর বাহিরে এক অপূর্ব্ব শিহরণ এল, শরীরে মৃদু মধুর কম্প উপস্থিত হল। আমি তন্ময় হয়ে গেলাম। এক মুহূর্ত্তেই মনে হল যেন আমার জীবনের ধারা ঠিক হয়ে গেল এবং এক গুরু-আদিষ্ট পথ ও উপদেশ ভিন্ন আমার আর চলবার উপায় নেই। মনে মনে আমার খুব অহঙ্কার ছিল। সে অহঙ্কার আমার ক্রমে ক্রমে চূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমার বাণীতে ও ব্যবহারেও কত মধুর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

দীক্ষা নিয়ে বাসায় এলাম। রাত্রিতে বিশ্লেষণ করলাম। ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি সব সময়ই মঙ্গল করেন,—আমার আঙ্গুল কাটার মধ্যে মঙ্গল কোথায় ছিল? তখন দেখলাম, যদি আঙ্গুল আমার সামান্য কাটত, প্লাস্‌টার করতে না হত, তবে বাসায় বলতে হত না এবং সময়ও করে উঠতে পারতাম না শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন করবার। ভগবানই হাত কেটে আমাকে সেদিকে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

দীক্ষা নেবার পরদিন হতেই যেন সুরিয়ার দিকে মনটা পড়ে থাকত। কী সে টান! সর্ব্বদাই যাবার জন্য মন উতলা থাকত! যখনই সুযোগ পেয়েছি দৌড়ে গেছি। খারাপ গাড়ী নিয়ে গেছি, প্রচণ্ড বেগে গেছি যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারি, কিন্তু কোনদিন একটুও বিপদ আসেনি। তিনি যেন আমারপ্রতীক্ষা করে আছেন, এমন আমার সব সময় মনে হত।

আমার শ্রীগুরুদেবের প্রথম দিনের উপদেশ—"চুরী, জারী, মিথ্যা থেকে দূরে থেকে, ঈশ্বর-বিশ্বাস হৃদয়ে রেখে, যথাশক্তি পরোপকার ব্রত নিয়ে যদি সংসারে থাক, তবে নিশ্চয় একদিন ঈশ্বর-কৃপা অনুভব করে ধন্য হতে পারবে। সংসারে সংসারী সাজিও, সংসারী হইও না কিন্তু

সাধু হইও, সাধু সাজিও না"। —এই দুটী উপদেশ যদি সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে পারি, তবেই জীবন স্বার্থক হবে ও শ্রীগুরুর উপযুক্ত শিষ্য হতে পারব।

আমার শ্রীগুরুর অপার মহিমা কীর্ত্তন করিবার ভাষা আমার নাই। তাঁর মধুর সঙ্গ এমন লোভনীয় যে, যদিও তিনি বলেন "সংসারে থাক সংসারী হইও না"—কিন্তু তাঁর শ্রীচরণে ৭ দিন বাস করলে আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না। তিন দিনের অভিজ্ঞতার কথা আমি বলছি। আমার তিন দিন শ্রীচরণে বাস করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। চতুর্থ দিনে যখন আমি বিদায় নি—আমার যেন পা উঠে না, শরীরে বল নেই—মনে হচ্ছিল কোথায় যাচ্ছি এ স্বর্গ ছেড়ে—কি প্রয়োজন সেখানে?

শ্রীগুরুর শ্রীচরণে এই নিবেদন, তিনি যেন তার করুণা হতে কখন আমাকে বঞ্চিত না করেন। অন্যায় অনেক হবে, তিনি যেন শাসন করে, শাস্তি দিয়ে আমায় শোধন করে নেন। তিনি যখন শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন, তখন আমার বলে আমি যেন আর কিছুই না রাখি। আমার সবই যেন শ্রীগুরুর কৃপা হয়। আমি পরম সৌভাগ্যবান্, তাই এমন শ্রীগুরু পেয়েছি। তাঁহার আহারে, বিহারে ও ব্যবহারে সংযম দেখে স্তম্ভিত হইতে হয়। অফুরন্ত স্নেহভরা বুক ও ব্যবহার তাঁর। মুখে তাঁর কখনও হাঁসির অভাব দেখি নাই। আশ্রিতের প্রতি সদাই তাঁর জাগ্রত করুণা দৃষ্টি।

কেবল জপদ্বারা যে এমন সুন্দরভাবে মন স্থির হয়, তা দীক্ষার আগে কোথাও শুনতে পাইনি কিম্বা জানতেও পারিনি। শ্রীগুরু-কৃপা পেয়ে মনে হাজার গুণ বল এসেছে, মন নির্ভয় হয়েছে, প্রসন্নতা মনে বাসা বেঁধেছে, জীবনভরের দুঃখের যেন অবসান হয়ে গেছে। কৃপালাভের পর তিন

মাসে আমার যে কি সুপরিবর্ত্তন হয়েছে, তা আমিই জানি। আমি যেন এক নূতন জগতের এক নূতন মানুষ হয়ে গেছি। অন্তর, বাহির সুন্দর করে তোলার এমন সরল উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। শ্রীগুরুর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য থেকে কখনও বঞ্চিত না করেন।"

কোনার, হাজারিবাগ।
২৫।২।৫২

ইতি—
প্রণত—**নরেশ**

'দি ইণ্ডোচাল্‌ডীয়ান্‌ আষ্ট্রলজিক্যাল্‌ এণ্ড সাইকিক্যাল্‌ রিসার্চ সোসাইটী'র Director এবং মাহিনগর, চুঁচুড়া ও কলিকাতার "বৈদিক আয়ুর্ব্বিজ্ঞান মন্দিরের' অধ্যক্ষ কবিরাজ—শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায় (এম-এ, এম-আর-এ-এস, বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার্ণব, জ্যোতিভূষণ, তন্ত্রাচার্য্য, এম-ডি (হোমিও), আয়ুর্ব্বেদ-বাচস্পতি, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সদস্য—ষ্টেট ফ্যাকালটি অফ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন) লিখিয়াছেন—

"পরম পূজনীয় পূজ্যপাদ যোগিবর শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামীজীউ মহারাজ,—

আপনি আমার সভক্তি প্রণাম স্বীকার করিবেন। আমি বহুপুণ্য ফলে আপনার জন্মকুণ্ডলীর ন্যায় একখানি জন্মকুণ্ডলীর দর্শনলাভ করিলাম। শ্রীশ্রী৺চৈতন্যদেবের কোষ্ঠীতে যে যে যোগ দেখিয়াছি আপনার কোষ্ঠীতেও সেই সেই যোগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

জন্মকুণ্ডলীর প্রধান বিচার্য্য বিষয় দশম স্থান। এই ১০ম স্থান হইতেই মনুষ্য জীবনের প্রতিষ্ঠা, কর্ম্ম, সম্মান, যশ প্রভৃতি জানা যায়। দশম স্থানই আমাদের মাথার উপর। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে ইহাকে Medium cali বা mid heaven বলে। এই সূর্য্য যখন মাথার উপর অর্থাৎ দশম স্থানে আসে তখন তাহার রশ্মি অতিশয় প্রখর হইয়া উঠে। আপনার জন্মকুণ্ডলীতে সেই দশম স্থানের অধিপতি শুক্র স্বক্ষেত্রে তুলায়—

এবং ইহার সহিত সংযুক্ত ৩টি প্রধান গ্রহ—

১। ধর্ম্মাধিপতি মঙ্গল (৯ম অধিপতি),

২। ধন ও আয়ের অধিপতি বুধ (২য় ও ১১শ অধিপতি),

এবং ৩। বিদ্যা ও মৃত্যুর অধিপতি বৃহস্পতি (৫ম ও ৮ম অধিপতি)।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষ অতি বিরল।"

৩০ নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮।

আপনার অনুগত
(স্বাঃ) হরিগোপাল
১১।১১।৫১

"পরম পূজনীয় পূজ্যপাদ মহারাজ জীউ,—আপনি আমার ৺বিজয়ার প্রণাম জানিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া অপূর্ব্ব শান্তি পাইলাম, আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য মনটা দারুণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আপনার হাতের লেখাগুলির প্রত্যেক বর্ণটি যেন রাগ রাগিনীর মত মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ চল্লিশ বৎসরের উপর হিন্দুর কুষ্টি লইয়া চর্চ্চা করিতেছি।

এই লইয়াই জগতের মধ্যে বর্ত্তমানে যাঁহারা সভ্যজাতি, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি কিন্তু আপনার মত প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ভগবানের মত ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই।"

× × × ×

৭-১০-৫২
৩০ নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

আপনার চরণাশ্রিত
(স্বাঃ) হরিগোপাল।

১। তনুভাব

জাতকের সিংহলগ্নে জন্ম হওয়ায় জাতককে অত্যন্ত-স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়াছে। চিরদিন জাতকের স্বাস্থ্য সুন্দর ভাবেই চলিবে এবং স্বীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি-প্রভাবে জাতক আগন্তুক ব্যক্তি মাত্রকেই নিজ-প্রভাবে আনিয়া নিজের বশে রাখিতে সক্ষম এবং এই সকল ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ করিতে সক্ষম করিয়া তুলিতে সম্যক্‌ভাবেই পারদর্শী হইবেন। লগ্নাধিপতি সূর্য্য ধনস্থান-গত হওয়ায় জাতক সমস্ত জীবনের মধ্যে অর্থকষ্ট পাইবেন না। পার্থিব অর্থ অপেক্ষা জাতক পরমার্থেরই প্রয়োজন অধিক বলিয়া মনে করিবেন। কন্যারাশিতে সূর্য্য থাকায় জাতকের মন সর্ব্বদাই স্নেহ-রসে আপ্লুত থাকে ও থাকিবে এবং মানব জাতির দুঃখ ও দৈন্যে ইঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকে। জাতক প্রত্যেক জীবে শিবের

অস্তিত্ব-জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদাই জন-হিত ব্রতেই সচেষ্ট থাকেন। "লগ্নেশে ধনগে লাভে স্বলাভ-পীড়িতো নরঃ। সুশীলো ধর্ম্মবিন্মানী বহুপ্রজা গুণৈর্যুতঃ॥" অর্থাৎ লগ্নাধিপতি দ্বিতীয় স্থান-গত হইলে মানুষ কোন লাভের আশা করে না, সুশীল ধর্ম্মজ্ঞ সন্মানী এবং বহুপ্রজা ও বহু গুণযুক্ত হইয়া থাকেন।

২। ধনভাব

জাতকের কন্যালগ্নে দ্বিতীয় স্থান পড়িয়াছে এবং উহা সূর্য্যের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় জাতকের ধনলিপ্সা একেবারেই থাকিবে না। দ্বিতীয়াধিপতি বুধ তৃতীয়-গত হইয়া মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় জাতককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক করিয়া তুলিয়াছে। বুধ যদি বৃহস্পতি-সংযুক্ত না হইয়া তৃতীয় গৃহ-গত হইতেন তাহা হইলে জাতক প্রভূত ধনশালী হইতেন, কারণ জাতকের ধনলিপ্সা সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই থাকিত; কিন্তু বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকায় জাতক ধন বলিতে পরমধন পরমার্থকেই জ্ঞান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিতীয়স্থ সূর্য্যের আর একটি সঙ্কেত হইতেছে এই যে, জাতক পৃথিবীশুদ্ধ লোককে কুটুম্ব জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। জাতকের সূর্য্য ও বুধ সকল গ্রহের মধ্যে প্রধান মারক হইতেছেন। সূর্য্য মারক হইলে সাধারণতঃ সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ হইয়া থাকে। সূর্য্য যশের ও কারকত্তা নির্দ্দেশ করেন। দ্বিতীয় গত হইয়া সূর্য্য ইহাই জানাইতেছেন যে, জাতক অর্থত্যাগ-হেতুই সম্মান ও যশোলাভ করিবেন এবং সমগ্র জগতেই পূজনীয় ব্যক্তি বলিয়া পূজনীয় হইবেন। "ধনগত-দিননাথে পুত্রদারৈর্ব্বিহীনঃ। কৃশতনু রত্তিদীনো রক্তনেত্রঃ কুবেশঃ। সততং ন ভবতি গৃহবাসী দুঃখচেতাঃ"... জ্যোতিষকল্পলতোক্ত এই বচনটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে জাতকের জীবনে।

৩। সহজ (ভ্রাতৃ)-ভাব

তৃতীয়স্থ মঙ্গলের ফল…"সহজ নিকেতন সংস্থে ভ্রাতৃবিন্যাসং কুরুতে ভূমিপুত্রঃ। ধনসুখপরিহীনো নিচগে শত্রুগেহে। বসতি মশকপূর্ণে মন্দিরে কুৎসিতে চ॥" তৃতীয়স্থ নবমাধিপতি মঙ্গল চতুর্থাধিপতি হইয়া তৃতীয় স্থানগত হওয়ায় জাতকের সুখ স্বচ্ছন্দ যাবতীয় ব্যাপার আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের জন্য জাতক পরিব্রাজকবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সহজ বা ভ্রাতৃস্থানে আধ্যাত্মিক শক্তির কারক গ্রহ বৃহস্পতি শুক্রযুক্ত থাকায় জাতক পৃথিবীশুদ্ধ প্রাণীকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবেন, এবং জাতক জগতের লোকের কাছে বিশ্বভ্রাতৃপ্রেম (Universal Brotherhood) প্রচার করিবেন, প্রত্যেক জীবকে শিবজ্ঞানে আলিঙ্গন দিবেন।

৪। মাতৃভাব

চতুর্থ গৃহ সুখ ও সম্পদ এবং ঐশ্বর্য্যের কারক; কিন্তু সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে মানুষ যতদিন থাকে, ততদিন তাহারা পরমার্থের দিকে চাহিতে পারে না। পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দ শনি নষ্ট করেন বলিয়া শনি প্রধান তপস্বী এবং প্রব্রজ্যার কারক বলিয়া প্রখ্যাত। এই কোষ্ঠীতে শনি সুখস্থানে থাকিয়া জাতকের সুখ ঐশ্বর্য্যের লিপ্সা সমস্ত নষ্ট করিয়া পরমপদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তুলায় শনির উচ্চস্থান, কিন্তু বৃশ্চিকেও শনি খুব বলবান্। জাতক এই এক শনির প্রভাবেই জীবদ্দশাতেই ভগবদ্দর্শনে সাফল্য লাভ করিবেন, এবং অসংখ্য লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত হইবেন। শনি শত্রু ও ভার্য্যাস্থানের অধিপতি হইয়া চতুর্থগত; ইহা হইতে নির্দ্দেশ

পাওয়া যাইতেছে যে, জাতকের শত্রুও নাই বন্ধুও নাই—'শঙ্কর' নামের সার্থকতা এইখানেই পাওয়া যাইতেছে। "পুত্রে মিত্রে শত্রৌ বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহ-সন্ধৌ।"

৫। সুতস্থান

পঞ্চম গৃহ সুতস্থান। পুত্রাদির নির্দ্দেশ এইস্থান হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু জাতক চিরকুমারব্রত অবলম্বন করায় স্বীয় তেজ ও প্রতিভাবলে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে বিচরণ করেন বলিয়াই সাংসারিক লোক অপেক্ষা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিবেন।

চন্দ্র, কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরন্তু রাহু চন্দ্রের শত্রু; সেইজন্য রাহু ভাবপ্রবণতার বিরোধী। সুতরাং পঞ্চমে পুত্রভাবে রাহু থাকায় আর এক সঙ্কেত হইতেছে যে, জাতক ভাবপ্রবণতার বিরোধী বলিয়াই জাতকের সন্তানাদি হইবার কোনও সম্ভাবনা হয় নাই। আবার সন্তানস্থানে রাহু থাকিলে সন্তান অর্থাৎ কোনও আত্মজ থাকে না।

৬। রিপুস্থান

জাতকের ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র থাকায় এবং ষষ্ঠাধিপতি শনি চতুর্থগত হওয়ায় অন্তরে ও বাহিরে প্রথমে বহুশত্রুর আবির্ভাব হইয়া থাকে কিন্তু জাতক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সিংহবিক্রমে স্মরজিত (কামজয়ী) শঙ্করের ন্যায় সকল শত্রুকেই ভস্মীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং 'শঙ্কর' নামের সার্থকতাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চন্দ্র মনের কারকগ্রহ শত্রুস্থানে থাকায় জাতকের যাবতীয় শত্রু মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির

আকারে আবির্ভূত হইবার প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু এই স্থানের অধিপতি শনি, যিনি কঠোর তপস্বী নামে পরিচিত, কাম ক্রোধাদি সমস্ত মন-উৎপন্ন শত্রুদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই শনিই প্রবজ্যার কারকগ্রহ। সেই শনি এই কোষ্ঠীতে ষষ্ঠ স্থানের অধিপতি হওয়ায় জাতকের যাবতীয় মনোজ শত্রুদিগকে একেবারেই দগ্ধ করিয়া জাতককে পরমযোগী করিয়াছেন।

৭। জায়া-ভাব

সপ্তম স্থানের অর্থাৎ জায়াভাবের অধিপতি এই তপস্বীর জন্মকুণ্ডলীতে আর কেহই নহে এই গ্রহরাজ শনি ব্যতীত। সপ্তমস্থান হইতে ভার্য্যা সম্বন্ধে যাবতীয় নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। শনি সপ্তমাধিপতি হওয়ায় মানুষ যাহাকে সংসারে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বস্তু অর্থাৎ দাম্পত্য-সুখ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে এবং নিখিল বিশ্বের কবিগণ যাহা লইয়াই সঙ্গীত রচনা করেন, জাতকের জীবনে সেই ভাবপ্রবণতা একেবারেই শনির আধিপত্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাগতিক নিয়মের প্রভাবে আমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জগতে একটা Corelation of force চলিতেছে। আমরা আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে, একটা বস্তু নষ্ট হইয়া গেল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দ্রব্য নষ্ট না হইয়া অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়া যায় মাত্র—ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। শনি যেরূপ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, সেইরূপ অপার্থিব অর্থাৎ দিব্য বস্তুতে পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছে।

শনির অধিষ্ঠাত্রী কালী "শণেস্তু দক্ষিণাকালী।" কালী জগতের "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী" বৈষ্ণবী শক্তি। বৈষ্ণবী= বিষ্ণু+অন+ঈ ; আবার 'বিষ্ণু' কথার ধাতুগত অর্থ—'বিষ্' ধাতু

ণক, 'বিষ্' মানে বেষ্টন করিয়া থাকা দুধে ঘৃতের ন্যায় অর্থাৎ দুধের এমন একটী কণিকা নাই যাহাতে ঘৃতের অভাব আছে অর্থাৎ 'সর্ব্বং দুগ্ধময়ং ঘৃতং' রূপে। শনির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালী=বৈষ্ণবীশক্তি= হ্লাদিনী শক্তি। সপ্তমাধিপতি শনি জাতকের অন্তরের অন্তর হইতে যাবতীয় রিপু পরিস্কার করিয়া হ্লাদিনী শক্তিকেই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিজে সুখস্থানে অর্থাৎ চতুর্থে অবস্থান করিয়া জাতককে ঐ ধ্যানে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিয়াছেন।

৮। মৃত্যুস্থান

অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি দশমাধিপতি স্বক্ষেত্রস্থ শুক্রের সহিত লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানগত। ইহার ফলে জাতক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পর্য্যটনরত অবস্থায় শিষ্যগণ-পরিবৃত থাকিয়া সজ্ঞানে ৭২ বৎসর ৯ মাস ১৩ দিন মাত্র বয়সে এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইবেন।

৯। ধর্ম্মভাব

এই রাশিচক্রে ধর্ম্মস্থানই অনন্য সাধারণ। নবমস্থান মেষরাশি-গত। এই রাশির অধিপতি মঙ্গলগ্রহ প্রধান প্রধান স্থানের অধিপতি-গণের সহিত সংযুক্ত হইয়া, তৃতীয় ভ্রমণ-স্থানে (তৃতীয়ে) অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সকলের শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া, সমবেতভাবে নবমস্থানে ধর্ম্মস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। ইহার ফলে সংসারী মানবগণের যাহা কিছু কাম্য তৎসমুদায়ই ধর্ম্মেই লীন হইয়া জাতককে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ করিয়াছে। ধর্ম্মাধিপতি মঙ্গল তৃতীয়ে অর্থাৎ ভ্রমণের দ্যোতকস্থানে ভ্রমণাধিপতি শুক্রের সহিত যুক্ত হইয়া স্বগৃহে ধর্ম্মস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিয়া

জাতককে 'পরিব্রাজকাচার্য্য' করিয়াছেন। ধর্ম্মাধিপতি মঙ্গল সুখস্থানাধিপতি হইয়া ধনস্থান ও আয়স্থানের অধিপতি বুধের সহিত সংযুক্ত হইয়া নবমে ধর্ম্মস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতকের ধনরত্ন ও যাবতীয় উপার্জ্জন ও সুখস্বাচ্ছন্দ সমুদয়ই ধর্ম্মে লীন হইয়াছে। ধর্ম্মাধিপতি মঙ্গল পঞ্চমস্থানের অধিপতি বিদ্যা ও সন্তানসমূহের দ্যোতক এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের নির্দ্দেশক অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতির সহিত সংযুক্ত হইয়া নবমে ধর্ম্মস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতকের নশ্বর দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্মেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। জাতকের ধর্ম্মজীবন ভিন্ন অন্য কোনও সত্তা নাই।

১০। কর্ম্মস্থান

দশমাধিপতি শুক্র স্বক্ষেত্রে তুলায় নবমাধিপতি মঙ্গলের সহিত সংযুক্ত হইয়া নবমে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতকের যাবতীয় কর্ম্ম ধর্ম্মচর্চ্চাতে বিলীন হইতেছে।

১১। আয়স্থান

দশমাধিপতি বুধ ধর্ম্মাধিপতি মঙ্গলের সহিত যুক্ত হওয়ায় এবং ধর্ম্মস্থানে নবমে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতক পরকালের পাথেয় সঞ্চয় ভিন্ন অন্য কোনও আয়ের চিন্তা করিতে অক্ষম।

১২। ব্যয়স্থান

দ্বাদশাধিপতি চন্দ্র শত্রুগৃহে থাকিয়া স্বক্ষেত্রে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতক সঞ্চয় করিতে পরাঙ্‌মুখ থাকিবেন।"

৩০নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
১১-১১-৫১

শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়,
এম-এ, এম-আর-এ-এস, এম-ডি-এইচ, বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ,
তন্ত্রাচার্য্য।

পরমারাধ্য স্বামীজীউ মহারাজ আহার-সংযমব্রত পূর্ণ রাখিবার জন্য এই নিয়ম পালন করিয়া চলেন—(১) যে শিষ্য নহে, (২) যে চুরি, জারি, মিথ্যা, ক্রোধ ও কঠোর বচন ত্যাগ করে নাই এবং দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (পরের দোষ না দেখা), শৌচ, অনুদ্বেগ (আমার কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সব কিছুই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব আমার ব্যস্ত ও চিন্তিত হইবার কিছুই নাই—এই বিশ্বাসে নিজের কর্ত্তব্য নিয়মানুসারে ভগবানের নাম নিতে নিতে করিয়া যাওয়া), অকার্পণ্য (উদারতা), অস্পৃহা (নিষ্কামতা), মঙ্গল (ভগবদ্ভজন দ্বারাই আমার পরম মঙ্গল হইবে—এই বিশ্বাসে নিত্য নিয়মিত ভজনাভ্যাস) ও সন্তোষ—এই নয়টি ভাব লইয়া থাকিতে যে প্রাণপণ প্রযত্ন করে না, (৩) যে নিরামিষ ভোজন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে না, (৪) যে সকাল ও সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে নিয়মপূর্ব্বক প্রভু-ভজন করে না এবং বাকী সময় 'হাতে পায়ে কাম ও মনে মনে নাম' এই নিয়মানুসারে চলে না, (৫) যে মৌন থাকিয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে ভোগ রান্না করে না এবং (৬) অতিথি, অভ্যাগত ও প্রার্থী দেখিয়া যার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে না—তাহার হাতের রান্না তিনি ভিক্ষারূপে স্বীকার করেন না। যে স্থানে এরূপ শিষ্যের অভাব হয়, সে স্থানে 'কুকার' যোগে ভিক্ষা প্রস্তুত করাইয়া দেহ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লন। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"—এই স্থলে 'আহার' শব্দে তিনি ভাবশুদ্ধি ও ভোজনশুদ্ধি উভয়ই মানিয়া থাকেন—এই উভয়শুদ্ধি ব্যতীত অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকিতে পারে না—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ইহাদের একটীর সাধন 'অর্দ্ধজরতি' ন্যায়ের সমান ব্যর্থমাত্র। ইহারা উভয়ে মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ সাধন—ইঁহারা উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সাধন নহে—ইহাই তাঁহার মত।

'বেদাধ্যয়নে অতএব বেদান্তাধ্যয়নে বিধি ও জাতিগত অধিকার' সম্বন্ধে পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্ত নিম্নে লিখিত হইল—

"বেদ-বেদান্ত-অধ্যয়নে অধিকার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য-দেব স্বয়ং 'বেদান্ত-দর্শনের' (১।৩।৩৪—৩৮ সূত্রে) "অপশূদ্র প্রকরণে" বলিয়াছেন যে, উপনীত 'দ্বিজ' মাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে। পরন্তু শূদ্র অদ্বিজ। সুতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ তাহার বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদপ্রতিপাদ্য পদার্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিই বেদার্থে অধিকারী। শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, কারণ বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়। [শূদ্রের উপনয়ন হয় না, উপনয়ন না হইলে বেদ পাঠ করিবার অধিকার হয় না, বেদ পাঠ না করিলে তাহার অর্থও জানা যায় না, ফলে বেদোক্ত উপদেশ পালন করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না।] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই উপনয়ন হইয়া থাকে। আর যে শূদ্রের ব্রহ্ম-বিদ্যায় অর্থিত্ব বলা হইয়াছে, সামর্থ্য না থাকিলে কেবল অর্থিত্ব অধিকারের হেতু হয় না। কেবল লৌকিক সামর্থ্য অধিকার-কারণ বলা যায় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অপেক্ষা আছে। [অর্থাৎ শূদ্র মোক্ষ কামনা করিতে পারে সত্য, এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যও থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রলভ্য। সেই বেদশাস্ত্রে যখন শূদ্রের অধিকার নাই, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার নাই। শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।] আর 'শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী'—এই শ্রুতি ন্যায়মূলকত্ব-হেতু শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতেও অসামর্থ্য প্রকাশ করিতেছে। কারণ 'ন্যায়' যাগাদি কর্ম্মের মত ব্রহ্মবিদ্যাতেও সমান—"ন শূদ্রস্যাধিকারঃ, বেদা-

ধ্যয়নাভাবাৎ। অধীতবেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে। ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি। উপনয়নপূর্ব্বকত্বাৎ বেদাধ্যয়নস্য। উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং, ন তদসতি সামর্থ্যে অধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ন-নিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং "শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" (তৈ°সং ৭।১।১।৬) ইতি, তন্ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবক্লৃপ্তত্বং দ্যোৎয়তি,ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ।" [শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তদর্শনের ১।৩।৮।৩৪ সূত্রের]

তাহার পর ১।৩।৮।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে মহাভারত শান্তিপর্ব্ব শুকানু-শাসন পর্ব্বাধ্যায় হইতে স্বসিদ্ধান্তের অনুকূলে নিম্নলিখিত বাক্যটী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া—

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কর্ম্ম মহদ্‌যশঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া বর্ণচতুষ্টয়কে [ইতিহাস পুরাণ] শ্রবণ করাইবে। **ইদং** (ইতিহাস ও পুরাণ-শ্রবণ) হি (নিশ্চয়ই) [শূদ্রের পক্ষে] **বেদস্যাধ্যয়নং** (বেদপাঠের তুল্য), এই কর্ম্ম মহান্ যশের (কারণ ইহা দ্বারা শূদ্রেরও পরম কল্যাণ সাধিত হয়।)

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদ বলিলেন—

"ইতি চ ইতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদ-পূর্ব্বকস্তু নাস্তি অধিকারঃ শূদ্রাণাম্ ইতি স্থিতম্।" অর্থাৎ "শ্রাবয়ে-চ্চতুরো বর্ণান্"—এইরূপ স্মৃতিতে যে চারিবর্ণের অধিকার বলা হইয়াছে, তাহা **ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ে** বুঝিতে হইবে। শূদ্রের

বেদপূর্ব্বক অধিকার নাই—যে অধিকারে বেদের কারণতা, তাহাতে শূদ্রের অধিকার নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শূদ্র বেদ অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী নহে, কিন্তু পুরাণাদির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী।

হেতুরূপে গৃহীত "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে চারিবর্ণের ইতিহাস ও পুরাণ 'শ্রবণের' কথা বলা হইয়াছে। ('অধ্যয়নের' কথা বলা হয় নাই।) শূদ্র অনুপবীত জাতি, তাহার বেদ-শ্রবণের অধিকার নাই। কারণ **উপনীত হইয়া গুরুমুখ হইতে বেদাক্ষর গ্রহণই বেদাধ্যয়ন**। তাহা হইলে "সাধকৈঃ শূদ্রৈঃ কথং জ্ঞানং লব্ধব্যম্?" (রত্নপ্রভাটীকা)—সাধক শূদ্রের কিরূপে জ্ঞান-লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি।

শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণ হইলেও তাহা বেদশ্রবণতুল্য ফলদায়ক। অতএব, শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রমুখ করিয়া ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণরূপ অধ্যয়ন করিতে পারে, এবং সাধনসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারে—ইহাই ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের মত। অতএব, স্মার্ত্তপ্রবর মহামতি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রভৃতি, ইতিহাস-পুরাণ-প্রকরণের, "শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন" ইত্যাদি বাক্যবলে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূদ্রের ব্রাহ্মণপ্রমুখ করিয়া ইতিহাস-পুরাণ 'শ্রবণে' অধিকার আছে, 'অধ্যয়নে' অধিকার নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রমুখ করিয়া শূদ্রের বেদবেদান্তশ্রবণে অধিকার নাই,

অধ্যয়ন ত দূরের কথা—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সনাতন শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। "শ্রাবয়েৎ" ইত্যাদি বাক্যের ব্রাহ্মণপ্রমুখ করিয়া ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণ কথাটী "শ্রোতব্যং" বাক্যে না থাকিলেও সেখানে 'ব্রাহ্মণ-প্রমুখ করিয়া' কথাটি যোগ করিয়া নিতে হইবে। অধিকন্তু, 'ইতিহাস-পুরাণাধ্যয়নপ্রকরণে' "শ্রাবয়েৎ" বাক্যটী পঠিত। অতএব, শূদ্র ব্রাহ্মণ-প্রমুখ করিয়া ইতিহাস পুরাণ 'শ্রবণ' করিতে পারে—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

শাস্ত্র সর্ব্বত্রই শূদ্রকে মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার আদেশ দিতেছেন—

"বেদমন্ত্রবর্জ্জং শূদ্রস্য" ইতি ছন্দোগাহ্নিকাচারচিন্তামণিধৃতস্মৃতিঃ।
"শূদ্রোঽপ্যেবংবিধঃ কার্য্যো বিনা মন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ।
ন কেনচিৎ সমসৃজচ্ছন্দসা তং প্রজাপতিঃ॥" ইতি যমস্মৃতিঃ।
"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
"অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতঃ।
অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে॥"

ইতি বরাহপুরাণে।

বেদান্ত দর্শনের "অপশূদ্রপ্রকরণে" ভগবান্ শ্রীশ্রীব্যাসদেব ত স্পষ্ট বলিয়াছেন—"শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য" (১।৩।৮।৩৮) অর্থাৎ স্মৃতেঃ চ (ধর্ম্মশাস্ত্রেও) অস্য (শূদ্রের) শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদের অর্থজ্ঞান ও বেদোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিষেধ করা হইয়াছে।) সুতরাং জাতি শূদ্রের বেদ-বেদান্ত শ্রবণে অধিকার নাই।

এই সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের বেদান্তশ্রবণে অধিকার-স্থাপনে দুরাগ্রহ বা অপচেষ্টা কেন? উত্তর—গরজের বালাই নাই।"

মহারাজ জীউকে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়—

'এ সংসারে দুঃখ ভয় কিছুতেই যাবার নয়।
তত্ত্বজ্ঞানে চিত্তশিলা যদি না গলিত হয়॥'
'মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম তিনি বিদ্যমান।
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ॥'
'হাতে পাতে দই, তবু বলে কই কই?'
'মরণ দেখছিস্ কই? ধানটা ফুটে খই।'
'সকল কাজই তাঁর কাজ মহামায়ার পূজা।
'আমার আমার শুনলেই খড়্গ দেখান দশভুজা॥"

অন্তে তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বহুশ্রুত 'নাম-মহিমার' একটি গান লিখিয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় সমাপ্ত করিতেছি—

'আমি সাগর সেঁচিয়া, পেয়েছি অমিয়া, অমূল্য পরশমণি।
প্রাণের অতুল-আরাম, প্রাণারাম রাম, অতুল সুখের খনি॥
এ নাম করে কণ্ঠ-হার, কণ্ঠেতে আমার, রেখেছি কত না করে।
আমি কত না যতনে, বুকভরা ধনে, রাখিয়াছি বুকে ধরে॥
এ নাম রেখেছি শ্রবণে, নয়নে নয়নে, কত না আদর করে।
এ নাম প্রণাম করেছি, শিরেতে ধরেছি, বার বার ভক্তিভরে॥
আমি সেবানন্দে মাতি, প্রেমানন্দে ভাসি, কত কি বলিয়া ফেলি।
আবার হৃদি-কুঞ্জবনে, পেয়ে প্রেম-ধনে, করি কত সুখে কেলি॥

সে যে সকল ভরিয়া, উঠেছে ফুটিয়া, জীবনের সব ভাগে।
এখন উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, সেই ত পরাণে জাগে॥
সে যে কত সুখ দিতে, আসিয়াছে চিতে, এত কে জানিত আগে।
আমি যত সুধা খাই, তত মজে যাই, নব প্রেম-অনুরাগে॥
এখন যায় যাক্ প্রাণ, নাহি জানি আন, নাম কেবল নাম।
এবার নাম বুকে ধরে, অনায়াসে তরে, যাব সে আনন্দ-ধাম॥'

সংগ্রহকর্ত্তা—
প্রকাশক।

প্রথম অংশ

সাধন-সহায়

* শ্রীশ্রীগুরুচরণার বিন্দোভ্যো নমঃ *

সাধন-সহায়

প্রথম কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরু-আদিষ্ট উপায়ে 'পশ্চিমোত্তান' ও 'সর্ব্বাঙ্গ' আসন দুইটির অভ্যাস করিয়া, উত্তর বা পূর্ব মুখ হইয়া আসনে বসিয়া, দেহ-মন-প্রাণের চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য, প্রথমতঃ ১৫ মিনিট কাল ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। 'পশ্চিমোত্তান' ও 'সর্ব্বাঙ্গ' আসনের ব্যায়াম দ্বারা শরীরের জড়তা ও আলস্য নষ্ট হয়, এবং প্রাণবায়ুর সুষুম্নামার্গে প্রবেশের সহায়তা হইয়া থাকে। প্রাণবায়ুর, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করাই প্রাণায়ামের সূত্রপাত। খুব ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ শ্বাস তুলিয়া, ক্ষণকাল রোধ করিয়া, আবার ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে। ঐ অভ্যাসে হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণপূর্ণ ও মন প্রফুল্ল হয়, এবং শরীর মধ্যস্থ নানাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দ্বারাও শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

আসন

শাস্ত্রে স্বস্তিকাদি অনেক প্রকার আসনের কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে আসনে বসিলে সুখে বসা যায়, দেহ স্থির থাকে, দেহে কোনপ্রকার কষ্ট বোধ না হয় এবং চঞ্চলতা না আসে. সেই প্রকার আসন করিয়াই বসিতে হয়। হঠ করিয়া কোন বিশেষ আসনের অভ্যাসে লাগিয়া থাকা উচিত নয়। যে আসনে বসিলে যাহার জপ, সুখ, স্থিরতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি লাভ হইবে, সেইরূপ আসনই তাহার পক্ষে উপযোগী এবং অবলম্বনীয়—'যেন কেন প্রকারেণ সুখং ধৈর্য্যং চ জায়তে। তৎ সুখমাসনম্‌······॥' (জাবালদর্শন-উপনিষৎ, ৩।১২), 'আসনেন রুজং হন্তি' (যোগচূড়ামনি উপঃ ১০৯), 'স্থিরসুখমাসনম্' (সাংখ্যদর্শন, ২।২৪ এবং যোগদর্শন, ২।৪৬), 'আসনেন বপুর্দার্ঢ্যম্' (কাশীখণ্ড)। তৎপরে সাধন করিতে করিতে যদি শরীর নিজ হইতেই ঘুরিয়া মুখ অন্যদিকে হইয়া যায়, তাহা হইলে সেইদিকে মুখ করিয়া বসিয়াই সাধন করিতে থাকিবে। প্রধান কথা এই যে, দেখিতে হইবে, কিভাবে বসিলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। যে স্থানে, যে সময়ে ও যে দিকে মুখ করিয়া বসিলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেইভাবেই বসিতে হইবে—'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ' (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১১)।

আসন করিয়া বসিয়া চিত্ত একাগ্র করিতে প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি দেখা যায় কি, চিত্ত স্থির হইতেছে না, চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইতেছে না, চিত্ত ইষ্টে না লাগিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, তাহা হইলে 'প্রযত্ন-শৈথিল্য' ও 'অনন্তসমাপত্তি'-রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়—"প্রযত্নশৈথিল্যানন্ত-সমাপত্তিভ্যাম্" (যোগ-দর্শন, ২।৪৭)। পৃষ্ঠবংশকে সোজা রাখিয়া, শরীরকে মৃতদেহের সদৃশ ঢিলা ছাড়িয়া দিয়া, 'দেহই আমি' এইরূপ জ্ঞান-প্রসূত দেহ-রক্ষাবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রের যে স্বাভাবিক প্রযত্ন থাকে, সেই প্রযত্নকে শিথিল করিয়া দেওয়ার নাম 'প্রযত্নশৈথিল্য' আর অনন্ত ঈশ্বরে মনঃস্থাপন অর্থাৎ 'আমার শরীর শূন্যবৎ হইয়া অনন্ত পরমাত্মাতে মিলিয়া গিয়াছে, আমি সর্ব্বব্যাপী অনন্তস্বরূপ' এইরূপ ভাবনার অভ্যাস 'অনন্তসমাপত্তি'। অনন্ত স্বরূপের চিন্তন করিতে করিতে সান্ত, খণ্ডিত নিখিল বস্তু সমূহের বিস্মরণ হইয়া যায়—তখন আর পরিচ্ছিন্ন দেহের দিকে মন থাকে না। 'প্রযত্নশৈথিল্যের' নিমিত্ত 'দেহ এবং পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন' এই জ্ঞান দৃঢ় করিতে হয়। 'আমি দেহে আছি বটে কিন্তু আমি দেহ নহি' মনে এরূপ ভাব রাখিতে হয়। আচ্ছা, আমি যদি দেহ না হই, তবে দেহে ব্যথা লাগিলে আমার কষ্ট বোধ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'আমি দেহ' এই বোধই ঐ প্রকার কষ্টের কারণ। মন দেহে না রাখিয়া, ভগবানের দিকে লইয়া গেলে, এই দেহাত্মবোধের নাশ হয়।

সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ, ধ্যান প্রভৃতি যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করা হয়, তাহার আরম্ভ আসনশুদ্ধি হইতে। মল না থাকার

নাম 'শুদ্ধি'। 'চঞ্চলতা'ই আসনের মল। যাহার যাহা স্বভাব, তাহাতে যদি তাহার বিজাতীয় কোন পদার্থ আসিয়া লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বিপরীত পদার্থকে উহার 'মল' বলে। আসন শব্দ 'আস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ উপবেশন অথবা অবস্থান। অতএব, আসনের অর্থ স্থিরভাবে উপবেশন অথবা অবস্থান। যাহাতে স্থিরভাবে উপবেশন বা অবস্থান করা যায়, তাহাই আসন শব্দের ভাব। দেহ ও মনে চঞ্চলতা (অস্থিরতা) আসিলে পর জানিতে হইবে যে, আসনে কোথাও 'মল' লাগিয়াছে। যতক্ষণ আসনে থাকা হইবে, ততক্ষণ যদি আসন না নড়ে, দেহ ও মন আসনচ্যুত ও চঞ্চল না হয়, তবে জানা যাইবে যে আসনশুদ্ধি হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—আসন স্থির হয় কিরূপে ? আসনে স্থিরতা দিতে পারেন কে ? যিনি স্বয়ং স্থির, তিনিই স্থিরতা দিতে পারেন। যে স্বয়ং চঞ্চল, কে কখন অপরকে স্থিরত্ব দিতে পারে না। সত্ত্বরূপী বিষ্ণু-শক্তিই স্থির পদার্থ, রজস্তমই চঞ্চল পদার্থ। কিন্তু সত্ত্বরূপী বিষ্ণুর দর্শন সকলের সব সময় ত হয় না, অতএব কাহার নিকট স্থিরতা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে ? ইহার সমাধান এই যে, সাধারণতঃ আমরা চারিদিকে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কোন স্থির পদার্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কি ? না, দশদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা প্রায় সমস্ত বস্তুই চলিষ্ণু দেখিতে পাই। পৃথিবীর উপর কত না বস্তু নড়িতেছে চড়িতেছে—চলিতেছে,

ফিরিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু পৃথিবী সর্ব্বদা স্থির রহিয়াছেন। এই কারণে পৃথিবী মাতার নিকটই স্থিরতা-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে—হে মাতা, আপনি সকলকে আপনার ক্রোড়ে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যাহা আপনার ক্রোড়ে ধৃত হইয়া নাই তাহা ত পতিষ্ণু। যাহা উর্দ্ধে, শূন্যে রহিয়াছে, তাহার আসন স্থির নাই, কিন্তু যে আপনার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছে, সে ত স্থির হইয়াই গিয়াছে—তাহার আর স্থিরত্ব ভঙ্গের ভয় নাই। আমি চতুর্দ্দিকে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে একমাত্র মা, আপনিই স্থির রহিয়াছেন, বাকী সমস্তই চঞ্চলগতিশীল। কিন্তু মা, আপনাকে কে স্থির রাখিয়াছেন ? বিষ্ণুশক্তিই আপনাকে স্থির বা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মা, আপনি স্বয়ং যে শক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া আছেন, আমাকেও সেই শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা ধারিত করিয়া রাখুন, যাহাতে আমি আর চঞ্চল না হইয়া যাই। আপনার দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, আমার চঞ্চলতা দূর হইবে, স্থিরতা ঠিক থাকিবে, আমার আসনের মল দূর হইবে, আমার আসন পবিত্র হইবে—"পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ, দেবি ! ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং, পবিত্রং কুরু চাসনম্॥" যাহা সকলের আধার, যাহা সকলকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহার উপরই ত নিজের আসন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। 'ভূঃ' অর্থাৎ পৃথিবীই সকলকে ধারণ করিয়া রাখে। স্বর্গলোকেও 'ভূঃ' আছে, ভুবলোকেও 'ভূঃ' আছে। যাহা ধারণ-শক্তি, তাহাকেই 'ভূঃ'

বলা হয়। তমোগুণই ধারণ করিয়া রাখে। ন্যূনাধিক ভাবে হইলেও, সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় সর্ব্বত্র রহিয়াছে—"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥" (গীতা, ১৮।৪০)।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ু র্বায়োরগ্নি রগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী॥" এই রীতিতে প্রকৃতির পরিণাম-ক্রমের বিচার করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বশেষ পরিণাম তমোগুণ প্রধান পৃথিবী। যে পরিণামের নীচে আর পরিণাম থাকে না, তাহাই সকলের আধার। আসন শুদ্ধির উপর্য্যুক্ত মন্ত্রের প্রথমাংশে উক্ত হইয়াছে—"পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ" হে পৃথ্বি! আপনার দ্বারা সমস্ত লোক ধৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে যে, এই ধারণী-শক্তি পৃথিবীরই, ঈশ্বরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; এই হেতু আবার বলা হইল—"দেবি! ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা" হে দেবি! আপনি স্বয়ং বিষ্ণুশক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া আছেন। যাহা যে শক্তির দ্বারাই ধৃত হইয়া থাকুক না কেন, সকলের মূল আধার-শক্তি বিষ্ণুর সন্ধারণ-শক্তিই আর ইহাই প্রকৃত আসন। আধ্যাত্মিকভাবে মূলাধারাদি চক্র এক এক শক্তি বা তত্ত্বের বাচক। মূলাধার কি? ইহাই পৃথিবীতত্ত্ব। ইহার উপর জলতত্ত্ব, জলতত্ত্বের উপর অগ্নিতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্বের উপর বায়ুতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্বের উপর আকাশতত্ত্ব। এখানেও পৃথিবীতত্ত্ব সর্ব্বশেষ পরিণাম, অতএব ইহা সকলের আধার, এইকারণে ইহার এক

নাম 'মূলাধার'। অতএব, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আসন করিবার সময় পৃথিবীর সহিত সংযোগ রাখিবার আদেশ এইকারণে দেওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবী আমাকে ধারণ করিয়া স্থির রাখিবেন। শূন্যে আমাকে কে ধারণ করিয়া স্থির রাখিবেন? শূন্যে সন্ধারণ-শক্তি শূন্য হইয়া আমি পড়িয়া যাইব। এইকারণে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ কর, পৃথিবীর উপর মাটিতে আসন করিয়া তাহার উপর নিজের অভ্যস্ত আসনে উপবেশন কর।

কর্ম্মাঙ্গ উপাসনাসমূহ কর্ম্মাধীন থাকে, কর্ম্মানুসার কোথাও দাঁড়াইয়া, কোথাও বসিয়া উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ উপাসনায় আসনের নিয়ম নাই। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও আসনাদির নিয়ম থাকে না। কিন্তু জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি উপাসনা কি দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া যথেচ্ছভাবে করা যাইতে পারে অথবা আসনে বসিয়াই করিতে হয়? প্রথমতঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে, উপাসনা যখন মানসিক ব্যাপার, তখন উহাতে শরীরস্থিতির, অর্থাৎ শরীরকে কিভাবে রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে, ইহার কোন নিয়ম অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ সমানপ্রত্যয়প্রবাহের হেতু, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণতয়া উপাস্য দেবতাতে প্রবাহিত অথবা লীন করাকে (সমানরূপে প্রত্যয়ের-ধারণার প্রবাহ রাখাকে) 'উপাসনা' বলে। এইপ্রকার উপাসনা গমনশীল অথবা ধাবন অবস্থাতে সম্ভব হইতে পারে না। গমন অথবা ধাবন চিত্ত-

বিক্ষেপজনক হইয়া থাকে। দণ্ডায়মান-অবস্থাতেও দেহ মন স্থির থাকিতে পারে না, কারণ তখন সেইদিকে লক্ষ্য থাকে, মন তখন সূক্ষ্মবস্তু দর্শনে সমর্থ হয় না। শয়ন করিয়াও ধ্যানের চেষ্টা করিলে সহসা ঘুম আসিয়া পড়ে। কিন্তু আসনে বসিয়া উপাসনা করিলে এই সকল দোষ উপাসককে স্পর্শ করিতে পারে না এবং উপাসনাও নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারে। অতএব, আসনে বসিয়াই উপাসনা কর্ত্তব্য; এইজন্যই বলা হইয়াছে—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৭)। উপাসনা ও ধ্যান একার্থক। 'ধ্যায়তি' (ধ্যান করিতেছে) এই যে প্রয়োগ, ইহার অর্থ 'সমানপ্রত্যয়-প্রবাহ-করণ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে সমান ও সম্পূর্ণভাবে উপাস্য দেবতাতেই প্রবাহাকারে প্রেরিত করা। এইপ্রকার ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা অবশ্যম্ভাবিনী, কারণ, অন্য জাতীয় জ্ঞানদ্বারা অব্যবহিত (আবৃত) না হইয়া একই বিষয়ে যে চিত্তস্থাপন (একাকার প্রবাহ), তাহার নাম 'ধ্যান' আর এই অর্থেই 'ধ্যা'-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 'বক ধ্যান করিতেছে,' 'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে উপবেশন-অবস্থাতেই ধ্যান অনায়াস সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং, উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই করণীয়; এইজন্য উক্ত হইয়াছে—"ধ্যানাচ্চ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৮)। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং, ধ্যায়তীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীবাপঃ, ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ" (৭।৯) অর্থাৎ পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন

ধ্যান করিতেছে, জল যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যান করিতেছে,—এস্থলে পৃথিবী, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতির নিশ্চলভাব লক্ষ্য করিয়াই 'ধ্যান' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা নিশ্চল-ভাবে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করারই বোধক অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিলেই একাগ্রচিত্ত হইয়া পৃথিবী, পর্ব্বত প্রভৃতির সমান নিশ্চলভাবে উপাসনা সম্ভব। এইহেতু উক্ত হইয়াছে—"অচলত্বং চাপেক্ষ্য" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৯)। স্মৃতিশাস্ত্র সমূহেও উপাসকের চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত পদ্মাসনাদি বিবিধ আসনের বিধান করা হইয়াছে—"স্মরন্তি চ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১০) এই সূত্রই ইহার প্রমাণ। "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন-মাত্মনঃ" (গীতা, ৯।১১) এই শ্লোকেও ভগবান্ আসনকে উপাসনার অঙ্গ বলিতেছেন।

কিন্তু কোন বিধিই সার্ব্বভৌম হইতে পারে না। এই হেতু আসন সম্বন্ধে শাস্ত্রের এক উপদেশ আছে—"ন তত্র নিয়মঃ" (সাংখ্যদর্শন) আসন-বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। যে ভাবে থাকিলে পর চিত্ত স্থির থাকে. তাহাই আসন। দিক্. দেশ ও কাল-বিষয়ে অর্থলক্ষণই অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতারূপ প্রয়োজনই নিয়ম, ইহা ভিন্ন ইতর কোন নিয়ম নাই। একাগ্রতাতে কোন স্থান অথবা কালের উল্লেখ না থাকাতে, যে দিক্, যে দেশ, যে কাল চিত্তের একাগ্রতা ও স্বচ্ছন্দতার অনুকূল প্রতীত হইবে, সেই দিক্, সেই স্থান ও সেই কালকেই উপাসনার উপযোগী জানিতে হইবে,—চিত্ত স্থির হইলে পর দিগাদি-বিচার অনাবশ্যক।

'সমান, পবিত্র, শর্করা, অগ্নি, বালুকা প্রভৃতি রহিত স্থানে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও 'একাগ্রতা-বিধানের উপযোগী স্থানই উপাসনার উপযোগী' এই কথাই উক্ত হইয়াছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের নির্দ্দেশ করা উক্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে 'মনের অনুকূল' এই বাক্য রহিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে স্থানে চিত্ত স্থির হইবে, সে স্থানেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য—"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১১)।

সারাংশ এই যে, ভজন-পূজনের স্থান মাটির উপরই প্রশস্ত। ভূমি-সংযোগের হেতু কি ? বিষ্ণুর সন্ধারণ-শক্তি দ্বারা নিজের দেহ ও মন ধৃত, ধীর ও শান্ত বোধ করা—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত বিশেষ সূক্ষ্ম-বিচার থাকিলে, দো-তালা, তিন-তালা, পর্ব্বত-শিখর ইত্যাদি স্থানে বসিয়াও সুন্দরভাবে ভজন-পূজন হইতে পারে। উপাসনা ভাবের রাজ্য, এই রাজ্যে ভাবই প্রধানতঃ গৃহীতব্য। ভাব-তীর্থই পরম তীর্থ। এই হেতু উক্ত হইয়াছে—"ভাবেষু বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্" আর "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ইহা ত ত্রিকাল সত্যই। 'রুদ্র-যামলে'ও উক্ত হইয়াছে—"ভাবেন লভতে সর্ব্বং ভাবেন দেব দর্শনম্। ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্॥"

প্রারম্ভিক ক্রিয়া ও ভাবনা

আসনে বসিয়া প্রথমে জোড়হাতে বাম কাণের উপরিভাগের মূলদেশ স্পর্শ করিয়া, "ঐং গুরবে নমঃ" মন্ত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া, চিন্তা করিবে—'শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে শক্তি দিতেছেন, আমার ভিতরে শ্রীগুরুশক্তি জাগরিত হইতেছে।' ঐভাবে জোড়হাতে ডান কাণের উপরিভাগের মূলদেশ স্পর্শ করিয়া, "গং গণেশায় নমঃ" মন্ত্রে বিঘ্ননাশক, সিদ্ধিদাতা গণেশকে মনে মনে প্রণাম করিয়া চিন্তা করিবে—'শ্রীশ্রীগণেশ আমার সাধনকালীন আগন্তুক বিঘ্নসমূহ বিদূরিত করিয়া আমাকে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সহায়তা করিবেন।' পরে জোড়হাতে ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ স্পর্শ করিয়া, নিজ ইষ্টদেবতাকে ইষ্টমন্ত্রে প্রণাম করিয়া ভাবনা করিবে—'আমার শ্রীশ্রীইষ্টদেব স্বয়ংই আমাকে অভ্যাস কালে হাতে ধরিয়া চালাইবেন'।

সুষুম্নামার্গ-পরিষ্করণ

আত্মা একটি শুভ্র উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত রহিয়াছেন। **মস্তক ঈষৎ বামে হেলাইয়া,** হৃদয়াভ্যন্তরে ঐ শুভ্র জ্যোতিতে মনঃসংযোগ করিয়া, "হ্রীং হং সঃ" এই মন্ত্র অন্ততঃ ৫ মিনিট জপ করিবে। "হ্রীং" সহস্রারস্থ

-শক্তির উদ্বোধক, "হং" স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রস্থ শক্তির উত্তেজক, এবং "সঃ" এই মন্ত্র জপ করিলে মূলাধার-চক্রে অবস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হন। "হ্রীং হংসঃ" এই মন্ত্র জপ দ্বারা সুষুম্নামার্গ পরিষ্কৃত হয় এবং ষট্‌চক্রভেদ সুগম হইয়া উঠে।

মনঃস্থৈর্য্য-সম্পাদন

১। হৃদয়ে যে দীপশিখার ন্যায় শুভ্র জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাকেই নিজ আত্মারূপে জানিবে। মূলাধার চক্র, যেখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সর্পিণীর ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা, তথায় জীবাত্মা একটি শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় দীপশিখার ন্যায় প্রকাশমান রহিয়াছেন,—তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া তেজোরূপী ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান করিবে। ইহাকে 'তেজোধ্যান' বা 'জ্যোতির্ধ্যান' বলে। ঐরূপে উক্ত জ্যোতির ধ্যান করিতে করিতে "হ্রীং দ ও উ হ্রীং" এই মন্ত্রটি অন্ততঃ ১০ মিনিট জপ করিবে। এই মন্ত্র মানসিক স্থৈর্য্য-সম্পাদনে অমোঘ। এই মন্ত্র জপদ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মনের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হইবে।

সর্ব্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যই ঈশ্বর। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত-বিস্তৃত চৈতন্যের প্রতীক সূক্ষ্ম কল্পনায় হৃদয়াভ্যন্তরস্থ শুভ্র জ্যোতি, এবং স্থূল কল্পনায় 'লিঙ্গরূপী মহেশ্বর' কিম্বা 'শালগ্রামরূপী

বিষ্ণু' অথবা 'যন্ত্ররূপী' দেবদেবী। হস্তপদাদিযুক্ত প্রতিমা স্থূলতম কল্পনা।

২। শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে রাখিবে এবং অভ্যস্ত সিদ্ধাসনে অথবা যে কোন আসনে সরলভাবে বসিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, নাসাগ্রে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক শান্ত ও স্থিরভাবে থাকিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিবে। প্রাতে ও রাত্রে (ভোজনের পূর্ব্বে) দুইবার কমপক্ষে অর্দ্ধঘণ্টা সময় এইভাবে জপ করিবে। যতদিন না দিব্য জ্যোতির দর্শন হয়, ক্রমে সময় বাড়াইতে থাকিবে। মন স্থির করিবার ইহাও একটি অমোঘ সরল উপায়। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, আমার ইহাই প্রধান কার্য্য, এ কার্য্য আমাকে করিতেই হইবে। যতদিন না হইবে, ছাড়িবে না। এই প্রকার দৃঢ়চিত্তে কার্য্য করিলে, তবে ফললাভে ধন্য হইতে পারিবে।

সতর্কতা

সাধন করিতে করিতে যদি শরীর কৃশ হইয়া যায়, তাহাতে কোন শঙ্কা করিবে না। উহাকে নাড়ী-শুদ্ধির শুভ লক্ষণ জানিয়া, নিশ্চিন্ত মনে সাধনে লাগিয়া থাকিবে। "কৃশত্বং চ শরীরস্য তদা জায়তে নিশ্চিতম্" (যোগতত্ত্ব-উপনিষৎ, ৪৬) অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি হইলে পর অবশ্যই শরীর কৃশতা প্রাপ্ত হয়। "নাড়ীশুদ্ধি মবাপ্নোতি পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষিতঃ। শরীরলঘুতা

দীপ্তির্বহ্নের্জঠরবর্ত্তিনঃ ॥" (জাবালদর্শন-উপনিষৎ, ৫।১১) অর্থাৎ নাড়ী শুদ্ধ হইলে পর শরীর লঘু হয়, দেহের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, জঠরাগ্নি প্রবল হইয়া উঠে।

অভ্যাস করিবার সময় যদি কোন প্রকার ভয় অনুভব হয় অথবা কোন ভয়ঙ্কর রূপের দর্শন হয়, তাহাতে ভীত হইবে না। তাহাকে সাধন-পথের শুভ লক্ষণ জানিও। সে সময় শ্রীগুরুমন্ত্র অথবা ইষ্টমন্ত্র মনে মনে খুব তাড়াতাড়ি জপ করিবে, অথবা শ্রীগুরুনাম কিম্বা ইষ্টনাম কয়েকবার জোরে জোরে উচ্চারণ করিবে।

অভ্যাস-কালে যদি চোখ দিয়া জল পড়ে কিম্বা হৃদয়ে কম্প উপস্থিত হয়, অথবা সমস্ত শরীর হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে, বা কাঁপিতে থাকে, তাহাতে ভয়ভীত হইবে না। ইহারা সাধন-পথের উন্নতির শুভলক্ষণ জানিয়া আরও জোরে জপাদি করিতে থাকিবে।

শক্তিপাত লক্ষণ

শিবপুরাণ বায়ব্য-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—"লক্ষণং শক্তি-পাতস্য প্রবোধানন্দ-সম্ভবঃ। সা যস্মাৎ পরমাশক্তিঃ প্রবোধা-নন্দরূপিণী। আনন্দবোধয়োর্লিঙ্গ-মন্তঃকরণ-বিক্রিয়া। যয়াস্যুঃ কম্প-রোমাঞ্চ-স্বর-নেত্রাদি-বিক্রিয়াঃ ॥" অর্থাৎ শক্তিপাতের চিহ্ন প্রবোধ আর আনন্দ, যেহেতু সেই পরমাশক্তি প্রবোধ ও

আনন্দরূপিণী। প্রবোধ ও আনন্দের চিহ্ন দেহের ভিতরে স্ফুরণরূপ বিক্রিয়া। ইহাতে শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হয়, এবং স্বর ও নেত্র প্রভৃতি অঙ্গসমূহের বিক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগুরুর ভিতর দিয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হইলে শিষ্য প্রবোধ ও আনন্দ লাভ করে—শিষ্য এক অপূর্ব্ব লাভ ও নির্ব্বিষয় আনন্দ অনুভব করে অর্থাৎ সেই সময় শিষ্য বুঝিয়া থাকে যে, তাহার ভিতরে এক অপূর্ব্ব শক্তির প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণ হইয়াছে এবং তাহাতে সে অত্যন্ত 'আনন্দ, পাইতেছে। এই কারণে উক্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"প্রার্থয়েদ্দেশিকো দেবং শিষ্যানুগ্রহ-কাম্যয়া। প্রসীদ দেব দেবেশ দেহমাবিশ্য মামকম্। বিমোচয়ৈনং বিশ্বেশ ঘৃণয়া চ ঘৃণানিধে॥" শক্তিপাতের পর হইতে শিষ্যের শরীরের ভিতর কখন বিদ্যুতের স্ফূরণ ও প্রকাশ, কখন অন্তঃস্থ বায়ুর নানাপ্রকার গমন, কখন অন্তঃস্থ অঙ্গসমূহের কম্পন, কখন শরীরে সূচী-বেধের সমান বোধ, কখন পিঠ মাথা ও দেহের ভিতর পিপীলিকা চলনের সমান অনুভব, কখন রোম-কূপের ভিতর সামান্য তাপযুক্ত স্পন্দন, কখন হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠা, ইত্যাদি অন্তঃস্ফুরণ প্রকাশিত হইতে থাকে ; আর তাহার দেহের বাহিরে অশ্রুপাত, কম্প, রোমাঞ্চ, নাক ও মুখ দিয়া নানা-প্রকারের শব্দ, চক্ষু হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহের নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক ক্রিয়া আপনা হইতে প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয় এবং ইহাতে সে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে ও নিজের ভিতরে এক অপূর্ব্ব শক্তির জাগরণ (প্রবোধ)

সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে থাকে। 'শিবশঙ্করতন্ত্রে'ও উক্ত শক্তিপাতের বর্ণন পাওয়া যায়।

অভ্যাস-কালে সতর্কতা ও যোগনিদ্রা

অভ্যাস করিবার সময় যদি ঘাম বাহির হয়, তাহা হইলে হাত দিয়া গায়ে মাখিয়া ফেলিবে; কাপড় বা গামোছা দিয়া মুছিয়া ফেলিবে না।

নিজের কাপড়, জামা, গামোছা ও বিছানা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবে না এবং নিজেও অপর কাহারও কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না।

সাধন করিবার সময় জিহ্বাতে জল আসিলে, তাহা গিলিয়া ফেলিবে, তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিবে না, কিন্তু কফ বা কাস আসিলে, তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিবে।

সাধন অভ্যাসের সময় প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ আসিলে, আসন হইতে উঠিয়া বিষ্ঠা, মুত্র ত্যাগ করিয়া, পুনঃ শুচি হইয়া আবার আসনে বসিয়া সাধন আরম্ভ করিবে। মল, মূত্রের বেগ ধারণ করিলে নানাপ্রকার কষ্টকর কঠিন ব্যাধি হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

সাধন করিবার সময় যদি অলক্ষিতভাবে নিদ্রা আসিয়া পড়ে, আর জাগিলে পরে মন্ত্রের স্মরণ হয়, তাহা হইলে মনে করিওনা যে, সময় বৃথা নষ্ট হইল। সাধন পথের ইহা অতীব শুভ

লক্ষণ। ইহাকে 'যোগ-নিদ্রা' বলে। 'যোগনিদ্রা' আসিবার সময় বা আসিলে কেবল মাত্র মাথাটিই ভার বোধ হয়, আর সমস্ত শরীর হাল্কা থাকে।

সুপ্তব্যাধি-প্রকাশ

সাধনার ফলে দেহের ভিতরের সুপ্তব্যাধি প্রকাশিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে সাধনার প্রথম অবস্থায় বীর্য্যপাত, কামোদ্রেক, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে পর ভয়ভীত বা নিরাশ হইবে না। সাধনাতে লাগিয়া থাকিলে অর্থাৎ প্রতিদিন নিয়মমত সাধন করিয়া চলিলে, সাধনার শক্তিতেই ঐ সমস্ত উপদ্রব নিজে নিজেই শান্ত হইয়া যায়। যদি কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘকালেও আরাম না হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সাধন-সরলতা

সকল স্থানে সকল সময় ও সর্ব্ব অবস্থাতেই এই সাধন করা যাইতে পারে। শক্তি-সঞ্চারিণী দীক্ষালাভের পর সাধন করিতে শুচি, অশুচির বিচার করিবার প্রয়োজন থাকে না। পুরুষদের অশৌচকালে এবং স্ত্রীলোকদের মাসিক অবস্থাতেও এই সাধন মনে মনে করিতে কোনও নিষেধ অথবা বাধা নাই। 'এতন্মন্ত্রং

সকৃৎকৃত্বা প্রজপেদনিশং মনুম্। প্রজপেদনিশং বিদ্বাং শৌচাশৌচং ন চাচরেৎ ॥' (কামধেনু তন্ত্রে) অর্থাৎ মন্ত্রকে একবার চৈতন্যযুক্ত করিয়া নিয়া, সর্ব্বদা উহার জপ করিবে। শক্তি-পুটিত মন্ত্রজপে শুচি ও অশুচির বিচার করিতে নাই। 'জাগৃতঃ শয়ান উত্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানো গমনেঽপি বা। সিদ্ধমন্ত্রে ন দোষঃ স্যাৎ আশৌচ-নিয়মে পি চ ॥' (বিশ্বসার তন্ত্রে) অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায়, শুইয়া শুইয়া, উঠিতে উঠিতে, ভোজনের সময়, চলিতে চলিতে এবং অশুচি অবস্থায়ও সিদ্ধমন্ত্র-জপে কোন দোষ হয় না। 'সর্ব্বদৈব জপঃ কার্য্যো ন দোষস্তত্র কশ্চন' (পদ্মপুরাণে) অর্থাৎ সর্ব্বদাই জপ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন দোষ হয় না। 'ন দোষো মানসে জপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা' (স্কন্দপুরাণে)—সকল স্থানে ও সকল সময় মানস জপ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না

জপ-বর্ণনা

অঙ্গুলির পর্ব্বে, রুদ্রাক্ষাদি মালায়, ষট্‌চক্রস্থিত অকারাদি বর্ণমালায় অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসে; এবং বাচিক, উপাংশু, মানস, সগর্ভ ও সধ্যান,—এই পঞ্চবিধ জপের মধ্যে যখন যে জপে রুচি হইবে, সেইরূপেই জপ করিবে। 'বাচিক' = নিকটের লোক যদি মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে পায়; 'উপাংশু' = মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ যদি স্বয়ংই মাত্র শুনিতে পায়; 'মানস' = জপের শব্দ নিজেও যদি না

শুনিতে পায়, কিন্তু অন্তরে জপ চলিতেছে ইহা বুঝিতে পারে ; 'সগর্ভ' = মানস জপ ও প্রাণায়াম একসঙ্গে চলিলে ; 'সধ্যান' = মানস জপ ও ধ্যান একসঙ্গে চলিলে। "ঐকৈক-মঙ্গুলিভিঃস্যাৎ রেখাভির্দশধাফলম্. মালাভি ঃ শতসাহস্রং মালিন্যানন্ত-মুচ্যতে ॥" (কুলার্ণবে) "বাচিকস্ত্বেক এব স্যাদুপাংশুঃ শতমুচ্যতে। সাহস্রো মানসঃ প্রোক্তঃ সগর্ভস্তু শতাধিকঃ ॥ প্রাণায়াম-সমাযুক্তঃ সগর্ভো জপ উচ্যতে। সগর্ভাদপি সাহস্রঃ সধ্যানো জপ উচ্যতে। এবু পঞ্চবিধেষ্বেকঃ কর্ত্তব্যঃ শক্তিতো জপঃ ॥" (শিবপুরাণ, বায়ব্য সংহিতা)। আর একপ্রকার জপ আছে, তাহার নাম 'সুষুম্না-জপ'। সুষুম্নার ভিতর দিয়া প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগমন লক্ষ্য করিয়া "সোঽহং" ভাবে থাকিতে চেষ্টা করাকে 'সুষুম্না-জপ' বলে।

ভজনের স্থান

সাধকের সাধনার আসন ভূমিপর হওয়াই প্রশস্ত, তক্তপোষ অথবা খাটিয়ার উপরে ঠিক নহে। আসন কোমল, প্রীতিকর, বৃহৎ, সমতল ও সমপৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। নিজের স্বতন্ত্র বিছানাকেও সাধনের আসনরূপে ব্যবহার করা যায়। "আসনং মৃদুলং রম্যং বিপুলং সুসমং শুচি" (শৈবে বায়ব্যসংহিতায়) "সুখাসনেঽথ শয্যায়াং যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ" (শৈবে ধর্ম্মসংহিতায়)।

গুপ্তরূপে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একাকীই সাধন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু, শ্রীশ্রীগুরুদেব, গুরুভ্রাতা, গুরুভগিনী, অথবা

সম-সাধকের সহিতও এক ঘরে বসিয়া সাধন করা যাইতে পারে। অন্ধকারেই সাধন করা প্রশস্ত, কারণ তাহাতে চারিদিকের বস্তুতে ও দৃশ্যে চক্ষু ও মন গিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে না। ঘরে ধূপ ধুনা দিয়া সাধনে বসিলে, চিত্ত প্রসন্ন থাকে,—তাহাতে ভজনে মন বসিবার সুবিধা হয়।

ভোজন

অভ্যাস-কালে ভোজন-বিষয়ে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়। একবারে খুব পেট ভরিয়া কখনও খাইবে না। অল্প অল্প খাদ্য একাধিকবার ভোজন করা কর্ত্তব্য। "হিতং মিতং চ ভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা" (বরাহ-উপনিষৎ, ৫।৯) অর্থাৎ হিতকর ও পরিমিত খাদ্য অল্প অল্প করিয়া অনেকবার খাইতে হয়। "নৈকবারং সমশ্নীয়াৎ নাহৃদ্যং পূতিগন্ধযুৎ" (গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে) অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন করিবে না, এবং পচা, গলা অতৃপ্তিকর ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যও ভোজন করিবে না।—কিন্তু, অন্ন ব্যঞ্জনাদি গরিষ্ঠ আহার একবার মাত্র পরিমিতরূপে ভোজন করা কর্ত্তব্য আর ফল, মূল দুগ্ধাদি লঘু-আহার ভিন্ন দিনে দুইবার ভোজন করা উচিত নহে—"দিবা পুনর্ন ভুঞ্জীতান্যত্র, ফলমূলেভ্যঃ (আপস্তম্ব স্মৃতি)।

আহারের বিষয়ে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—'উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবজ্জীর্ণং বীর্য্যাবিরুদ্ধং ইষ্টদেশে ইষ্টসর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং

নাতিবিলম্বিতম্ ন জল্পন্ ন হসন্ স্তন্মনা ভুঞ্জীত আত্মানমভিসমীক্ষ্য সম্যক্।' (বিমান, প্রথম অধ্যায়) অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে পর, পবিত্র স্থানে পরিমিত ও (ঘৃতাদিযুক্ত) স্নিগ্ধ, মনঃপ্রীতিকর ব্যঞ্জনাদি উপযুক্ত উপকরণ-যুক্ত, অবিরুদ্ধ উষ্ণ (ঈষদুষ্ণ) অন্ন, অতি দ্রুতও নহে, অতি ধীরে ধীরেও নহে এবং বৃথা গল্প ও হাঁসি-ঠাট্টা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অর্থাৎ আত্মাতেই আহুতি দেওয়া হইতেছে এইরূপ ভাবনা করিয়া, প্রসন্ন মনে ভোজন করিবে॥ ভোজনকে 'প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞ' বলা হইয়াছে। এই শরীর অগ্নিহোত্রের বেদী, মুখ হোম-কুণ্ড, ভোজনার্থ আনীত অন্ন হোমীয় পদার্থ, অন্নকে আহুতিরূপে অর্পণ করিতে হয়, নিজের হাত হইতেছে হোমের হাতা, হোমের মন্ত্র হইতেছে—প্রাণায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ইষ্টমন্ত্র অথবা ভগবানের নাম।

হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ধুইয়া আহার করিতে বসিবে। ইহাতে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। তথাহি—মনু, ৪।৭৬

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত, নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥

—আর্দ্রপদে ভোজন করিবে, কিন্তু আর্দ্রপদে শয়ন করিবে না। আর্দ্রপদে ভোজন করিলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

ক্ষুধায় কষ্ট পাইয়া কখনও সাধন (অভ্যাস) করিবে না। আবার, 'যত পাই, তত খাই' বিধানে কেবল খাইতেই ব্যস্ত

হইও না। মনে রাখিও—(১) অতিভোজন অতীব গর্হিত ; (২) এক মিতাহার পালনে ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল যমই রক্ষা হয়।

'মিতাহারো যমম্বেকঃ।'—যোগতত্ত্বোপনিষদি।

অতিভোজন সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

'অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্য ঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥'—২।৫৭

—অতিভোজন করিলে শরীর রোগাক্রান্ত হয়, পরমায়ুঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং স্বর্গ-সাধন যাগাদি কার্য্যে অধিকার লোপ হয়। ইহা নরকের কারণ এবং অতিভোজন করিলে লোকে ঔদরিক (পেটুক) ও রাক্ষস বলিয়া নিন্দা করে। অতএব, অতিভোজন পরিত্যজ্য।

মিতাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

'যুক্তাহার-বিহারস্য……যোগো ভবতি দুঃখহা।'

—শ্রীগীতা, ৬।১৭

—নিয়মিতরূপ আহার ও বিহার-কারীর যোগ দুঃখনিবারক হয় এবং 'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।' শ্রীগীতা, ৬।১৬

—অতিভোজনকারীর অথবা অনাহারীর সমাধিলাভ হয় না। ঘেরণ্ড সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

'মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্ যোগো ন সিধ্যতি॥'

—যে ব্যক্তি পরিমিত আহার অবলম্বন না করিয়া যোগাভ্যাস আরম্ভ করে, তাহাকে নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে হয় এবং তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগসিদ্ধি লাভ হয় না।

ভোজনের সময় বার বার একটু একটু জল পান করিবে। ইহাতে পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্ত অন্ন সহজে হজম হইয়া যায়। জলপান সম্বন্ধে 'ভাবপ্রকাশে' লিখিত হইয়াছে—

'অত্যম্বুপানা ন্ন বিপচ্যতেঽন্নং, অনম্বুপানা চ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি-বিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহু র্বারি পিবেদভূরি॥'

—অধিক জল পান করিলে অথবা একেবারে জল পান না করিলে, অন্ন পরিপাক (হজম) হয় না। অতএব, পাচকাগ্নির বৃদ্ধির নিমিত্ত বার বার অল্প অল্প জল পান করিবে। অন্যত্র—

'আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং, মধ্যে বারি কফাপহম্।
অন্তে বারি পচেদন্নং, সর্ব্বং বার্য্যমৃতোপমম্॥'

—আহারের আরম্ভে জল পান করিলে পিত্তদোষ নষ্ট হয়, মধ্যভাগে জল পান করিলে কফদোষ নষ্ট হয় এবং শেষভাগে জল পান করিলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয়। অতএব, ত্রিবিধ প্রকার জল পানই অমৃত সমান।

ঠাণ্ডা জল কখনও পান করিবে না.—ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা দুধ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। রাত্রি-ভোজন করিলে লঘু আহার করিবে।

কাহারও অনুরোধে অসময়ে অক্ষুধায় খাইও না। অন্নকে ক্ষুধা ব্যাধির ঔষধ মনে করিয়া ভোজন করিবে। প্রমাণ যথা ;—

'ঔষধবদশনং প্রাশ্নীয়াৎ।'—সংন্যাসোপনিষদি।

'ক্ষুধা হি সর্ব্বরোগানাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।
স চান্নৌষধ-লেপেন নশ্যতীহ ন সংশয়ঃ॥'

শৈবে ধর্ম্মসংহিতায়াম্।

—সর্ব্বপ্রকার রোগের মধ্যে ক্ষুধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি। অন্নরূপ ঔষধ প্রয়োগে (ব্যবহারে) উহা বিনষ্ট হয় ; ইহা নিশ্চয়।

মনে রাখিও—অভক্ষ্য না খাইলে মন বিশুদ্ধ হয় ; শুদ্ধ পবিত্র আহারে মন আপনিই শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইয়া শান্ত হইলে ক্রমে জ্ঞান জন্মে এবং সর্ব্বসংশয় নাশ হইয়া যায়।

'অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যা তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ।
আহার-শুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধি র্ভবতি স্বতঃ।
চিত্ত-শুদ্ধৌ ক্রমাজ্ জ্ঞানং ত্রুট্যন্তেগ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্॥'

পাশুপতব্রহ্মোপনিষদি।

'দেবী-ভাগবতে' কথিত হইয়াছে—

'আহার-শুদ্ধ্যা নৃপতে! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম॥'—৬।১১।৫০

—হে মহারাজ! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক অতি নিকট। আহারকে ধর্ম্মের ভিত্তি

বলিতে পারা যায়। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।"—একথা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়।

'শিব-সংহিতায়' উক্ত হইয়াছে—

'চতুর্বিবধস্য চান্নস্য রস স্ত্রেধা বিভজ্যতে।
তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ॥'

অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম সার অংশে মন পুষ্ট হয়। অতএব, শুদ্ধ অন্ন গ্রহণে মন শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"অন্ন-মশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমস্তৎ মাংসম্। যোঽনিষ্ঠ স্তন্মনঃ।" (৫।১) অর্থাৎ অন্নের সূক্ষ্মতম অংশে মন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। 'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।" অতএব আহারের শুদ্ধতা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

উপবাস

প্রতি একাদশীতে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে পূর্ণ ও অর্দ্ধ উপবাস করিবে। সাময়িক উপবাসে শরীর লঘু হয় এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। উপবাসের উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি করা প্রবং পাপস্বরূপ রজস্তমো গুণের কার্য্য হইতে বিরত থাকা। 'ভবিষ্য পুরাণে' উপবাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ ॥'

অর্থাৎ সকল প্রকার পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, পাপকর্ম্ম না করিয়া, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া নিখিল সাত্ত্বিক গুণের সহিত অবস্থিতির নাম 'উপবাস';

উপবাসকারীর গুণবর্ণনপ্রসঙ্গে '**দেবী পুরাণে**' উক্ত হইয়াছে—

'তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকম্।
উপবাসকৃতা হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥'

অর্থাৎ আরাধ্য দেবতা বা উপাস্যের—ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের নাম জপ এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ মননাদি ও স্নান,—এই সকল উপবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

'সর্ব্বার্থদং তপশ্চার্থং উপবাসঃ কলৌ যুগে।' অর্থাৎ কলিযুগে উপবাস সর্ব্বার্থপ্রদ তপস্যা॥ ব্রতীর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ-বিবর্জ্জিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

অনশনে থাকিয়া সাত্ত্বিক গুণের সহিত বাস করিলেই উপবাস হয়। যাঁহারা অনশনে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

'অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয় মুপভোগ্যং ভবেৎ শুভম্ ॥'

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

অর্থাৎ দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল, মূল, দুধ ও জল উপভোগের ব্যবস্থা।

'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'তে উক্ত হইয়াছে—

'অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবি র্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচ স্তথৌষধম্॥'

অর্থাৎ দিবারাত্র উপবাস থাকিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে জল, মূল ফল, দুধ, যজ্ঞশেষ চরু, শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের আদেশে আহার্য্য, শ্রীগুরুদেবের আদেশে লঘু আহার এবং ঔষধ,—এই আট জিনিষ গ্রহণে উপবাস-ব্রত ভঙ্গ হয় না।

'উপ' এবং 'বাস' এই দুইটি শব্দ মিলিয়া 'উপবাস' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' শব্দের অর্থ নিকটে, আর 'বাস' শব্দের অর্থ অবস্থিতি। অতএব, 'উপবাস' শব্দের অর্থ—পরমাত্মার নিকটে অবস্থান অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করা, বিচার করা এবং তদ্ধ্যানে তদ্ভাবে সময় যাপন করা। কেবলমাত্র নিরাহার থাকিয়া শরীর শোষণ করিলেই উপবাস ব্রত পালন করা হয় না! তাহা হইলে তো রোগীরও উপবাস ব্রত পালন করা হয়। 'মুখ' বন্ধ রাখার সহিত 'মন'টাও বন্ধ রাখিলে অর্থাৎ বিষয় চিন্তা বন্ধ রাখিয়া আত্মচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে যথার্থ উপবাস করা হয়। তাই 'শ্রুতি' বলিয়াছেন—

"উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্॥"

অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মার সমীপে যে বাস (অবস্থান) তাহার নাম 'উপবাস'। 'উপবাস' শব্দটি 'উপ' উপসর্গপূর্ব্বক 'বস' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' সমীপে 'বাস' অবস্থান অর্থাৎ উপাস্যের (আরাধ্যের) নিকট অবস্থান 'উপবাস' শব্দের মূল অর্থ।

সাধন করিতে করিতে আপনাআপনি আহারের পরিমাণ কমিতে থাকিলে, তাহা শুভলক্ষণ জানিও। তাহাতে কোনও প্রকার আশঙ্কা করিও না। এরূপ অবস্থায় কাহারও কথায় সাধন ত্যাগ করিবে না, অথবা অধিক আহারাদি করিয়া স্থূল হইবার চেষ্টা করিবে না।

সাধনায় অগ্রসর হইতে হইতে নিজের সুযোগ সুবিধা নিজেই বুঝিতে পারিবে। সাধনার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত নিয়মসমূহও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

শ্রীগুরু আলোচনা নিষেধ

গুরুর আচরণের কখনও সমালোচনা করিবে না। যেহেতু, গুরুদত্ত সাধন পথের সহিতই তোমার সম্পর্ক, তাঁহার আচরণের সহিত নহে। অধিকন্তু তাঁহার অবস্থায় তৎকৃত আচরণ, তোমার অবস্থায় তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। তথাহি—

'ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বন্তি গতিভাষিতচেষ্টিতম্।'—মনুসংহিতা।

সাধন সম্বন্ধে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়া জানিয়া লইবে। গুরু যদি নিকটে না থাকেন, এন্‌ভেলোপ পত্রে লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইও। কাহারও সাধনার অঙ্গ অনুকরণ করিতে যাইও না।

সাধন গোপনীয়

গুরুর নিকট ভিন্ন সকলের নিকট সাধন-পন্থা, দর্শন ও অনুভব প্রভৃতি গোপন রাখিবে। গুরু ভিন্ন অপর কাহারও নিকট দর্শনাদি প্রকাশ করিলে রোগ. শোক, দুঃখাদি বিঘ্নে পড়িতে হয় এবং সাধন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

স্ব-শাস্ত্রোক্তং রহস্যাদ্যং ন বদেৎ যস্য কস্যচিৎ।
যদি ব্রূয়াৎ স সময়াৎ চ্যুত এব ন সংশয়ঃ॥

—কুলার্ণব-তন্ত্রে।

—সাধক যে শাস্ত্র অনুসারে অভ্যাস করে, তাহার রহস্যাদি যাহাকে তাহাকে বলিতে নাই। বলিলে সাধন-সঙ্কেত নিশ্চয়ই হারাইতে হয়।

যোগাযোগাৎ ভবেৎ মোক্ষো মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা।
ন প্রকাশ্য মতো যোগং ভুক্তিমুক্তি ফলায় চ॥

—রুদ্র-যামলে।

—যোগ সাধন দ্বারা মুক্তি এবং অস্খলিত মন্ত্রসিদ্ধি হয়। অতএব, ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবার জন্য যোগপন্থাকে প্রকাশ করিতে নাই।

এতৎ প্রকাশনং যচ্চ আয়ুঃক্ষয়করং স্মৃতম্।
সাধকস্য বিনাশস্তু তস্মাৎ নৈতৎ প্রকাশয়েৎ॥

—গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে।

—দর্শনাদি প্রকাশ করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং সাধকের সাধন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, উহা প্রকাশ করিতে নাই।

আয়ু বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপো দানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

—দক্ষসংহিতা।

—নিজের আয়ু, ধনের পরিমাণ, নিজ গৃহের দোষ, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান ও অপমান,—এই নয় বিষয় গোপন রাখিতে হয়।

কেহ সাধন রহস্য জানিতে চাহিলে 'গুরুদেবের আদেশ ও নির্দ্দেশ মত জপ করি।'—এই কথামাত্র বলিতে পার।

সিদ্ধিসমূহ বিঘ্নস্বরূপ

'গুরুদেবের আদেশ পালন করিতেছি।'—এই ভাব লইয়া কোন কামনা না রাখিয়া সাধন করিবে। কোনরূপ ঐশ্বর্য্য বা

শক্তিলাভের দিকে মন দিবে না। স্বতঃ কোন শক্তিলাভ হইলে, তাহা গোপন রাখিবে। উহাকে আত্মদর্শনের মহাবিঘ্ন ভাবিয়া উপেক্ষা করিবে। তাহা হইলেই পরিণামে অক্ষয় পরম ঐশ্বর্য্য আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবে। উক্তং—

অকামানাং পদং মোক্ষঃ। - মহানির্ব্বাণতন্ত্রে

অর্থাৎ যাহারা কামনা না করিয়া সাধন করে, তাহাদের মোক্ষ লাভ হয়।

অকাময়মানস্য চ সর্ব্বকামঃ।—স্কন্দপুরাণে

অর্থাৎ নিষ্কাম সাধকের সর্ব্বকামনাই সিদ্ধ হয়।

অণিমাদ্য-ষ্টৈশ্বর্য্যা-শাসিদ্ধসঙ্কল্পো বদ্ধঃ।

অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভের ইচ্ছা বন্ধনের কারণ।—

নিরালম্বোপনিষদি

যস্তু মূঢ়োঽল্পবুদ্ধি র্বা সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।

—যে মূঢ় বা বিচারহীন, সেইই সিদ্ধিসমূহ বাঞ্ছা করে।—

অন্নপূর্ণোপনিষদি

'মোক্ষস্য বহবঃ শাস্ত্রে প্রোচ্যন্তে প্রতিবন্ধকাঃ।
অণিমাদীচ্ছয়া তুল্যঃ প্রতিবন্ধো ন কশ্চন॥
যস্যাণিমাদি সিদ্ধীচ্ছা লেশমাত্রাপি বর্ত্ততে।
কল্পকোট্যাপি তস্যাত্ম-জ্ঞানসিদ্ধি র্ন সেৎস্যতি॥'

—তত্ত্বসারায়ণে রামগীতায়াম্

অর্থাৎ শাস্ত্রে মোক্ষের বহু প্রতিবন্ধক বর্ণিত আছে: কিন্তু অণিমাদি সিদ্ধির ইচ্ছার তুল্য প্রতিবন্ধক কোনটীই নহে। যাহার লেশমাত্রও অণিমাদি সিদ্ধি লাভের কামনা আছে, তাহার কোটি কল্পেও জ্ঞানসিদ্ধি হইবে না।

সিদ্ধীনাংচৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ। —ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে

অর্থাৎ সিদ্ধি সমূহের চিহ্ন দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

তে সমাধা-বুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।
তদ্বৈরাগ্যদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্॥

—পাতঞ্জল-দর্শনে বিভূতিবর্ণনে

—বিভূতিসমূহ সমাধির পক্ষে বিঘ্ন; কিন্তু ইহারা সংসারে প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকে। তাহাতে বিরাগ জন্মিলে, সংস্কার-বীজ ক্ষয় হওয়ায় কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।

সকাম সাধকের পরিণাম-বিষয়ে শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"গতাগতং কামকামা লভন্তে।"—যাহারা সকাম, তাহারা জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে।

জিজ্ঞাসা না করিলে উপযাচক হইয়া কাহাকেও সাধন-বিষয়ে কিছু বলিবে না। জিজ্ঞাসা করিলেও শিষ্যভাব না থাকিলে এবং উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে, সাধন-বিষয়ে কোন কথা বলা নিষিদ্ধ।

না-পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ, ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী, জড়বৎ লোকমাচরেৎ॥

—সংন্যাসোপনিষদি

অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে, অথবা অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করিলে, জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাকেও কিছু বলেন না। তিনি জ্ঞানবান্ হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় আচরণ করেন।

পৃষ্টঃ সন্ প্রকৃতং ব্যক্তি ন পৃষ্টঃ স্থাণুবৎ স্থিতঃ। যোগবাশিষ্ঠে উপশমে—জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দেন, নতুবা মূক জড় খুঁটার ন্যায় চুপ করিয়া থাকেন।

পুরুষার্থ স্বয়ং করিতে হইবে

সাধনায় সর্ব্বদা উত্তমশীল থাকিবে। যে সাধন করে, তাহারই সিদ্ধিলাভ হয়; সাধন না করিলে সিদ্ধিলাভ কিরূপে হইবে? অতএব, শ্রীগুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন করা কর্ত্তব্য। তথা হি—

ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ, অক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ ক্রিয়া বিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ ॥—

শিবসংহিতায়াম্

—যে ক্রিয়াবান্ (সাধনশীল) তাহারই সিদ্ধিলাভ হয়; সাধন না করিলে সিদ্ধি লাভ কিরূপে হইবে? অতএব, বিধান অনুযায়ী সাধকগণের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

পুরুষার্থা-দৃতে পুত্র! নেহ সংপ্রাপ্যতে শুভম্।—যোঃ বাঃ উপশমে—পুরুষকার ভিন্ন সংসারে কেহ শুভ লাভ করিতে পারে না।

গুরু শ্চেদুদ্ধরত্যজ্ঞ-মাত্মীয়াৎ পৌরুষা-দৃতে।
উষ্ট্রং দান্তং বলীবর্দ্দং তৎ কস্মান্ নোদ্ধরত্যসৌ॥

—যোঃ বাঃ উপশমে

—শিষ্যের নিজের পুরুষকার না থাকিলেও যদি অজ্ঞ শিষ্যকে গুরু উদ্ধার করিতে পারেন, তবে তিনি অজ্ঞান অবিচারী উট ও বলদকে কেন উদ্ধার করিতে পারেন না?

যোগবাশিষ্ঠে নিঃ প্রঃ উঃ ১২ সর্গে উক্ত হইয়াছে—

অর্দ্ধং সজ্জন-সম্পর্কা-দবিদ্যায়া বিনশ্যতি।
চতুর্ভাগ স্তু শাস্ত্রার্থৈ শ্চতুর্ভাগঃ স্বযত্নতঃ॥

—অবিদ্যার অর্দ্ধেক সজ্জনের সহবাসে, চতুর্থাংশ শাস্ত্র-সহায়ে, এবং অবশিষ্ট নিজের প্রযত্নে বিনষ্ট হয়॥—অতএব, উদ্যম-শীল হইয়া সাধনা-তৎপর হইবে।

দীক্ষালাভের পর কেহ কেহ মনে করেন ও বলেন—'গুরুদেব যা করেন, তাঁহারই উপর সমস্ত নির্ভর।' কিন্তু, মোহবশে তাঁহারা জানেন না যে, গুরু বা ঈশ্বর সাধন-তরীর 'কর্ণধার',—দাঁড়-বাহক 'মাঝি' নন্। তথা হি—

'কর্ণধারং গুরুং প্রাপ্য তদ্বাক্যং প্লববদ্ দৃঢ়ম্।
অভ্যাস-বাসনাশক্ত্যা তরন্তি ভব-সাগরম্।

—যোগশিখোপনিষদি

অর্থাৎ শ্রীগুরুকে কর্ণধাররূপে, তাঁহার উপদেশকে দৃঢ় নৌকা-রূপে, এবং তৎকথিত সাধন-মার্গকে দাঁড়-রূপে পাইয়া লোক এই সংসাররূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়॥

সাধন করিলে 'ইষ্টদর্শন' অনেকেরই হইতে পারে। দুগ্ধে নবনীত বিদ্যমান, জীবেও স্বরূপচৈতন্য বর্ত্তমান। মর্দ্দনে নবনীতের উৎপত্তি, সাধনে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি। তবে, সেই মর্দ্দনবৎ এই সাধনও দেশ-কাল-পাত্রসাপেক্ষ। কর্ম্ম কখন একেবারে নিষ্ফল যায় না। কিন্তু, ভোরের বেলায় মাখন উঠে ভাল। সেইরূপে ভোরের সাধনে আনন্দ মিলে অধিক।

অনন্যমনা হইয়া সাধক তুমি পুরুষকার (শাস্ত্রিত চেষ্টা)-অবলম্বন কর। তাহাদ্বারা সমস্তই সম্ভব হয়। 'সমস্তই দৈব' বলিয়া বসিয়া থাকিও না। উহা অলস ব্যক্তিদের আপন মনের প্রবোধ মাত্র। পুরুষকার ও ঈশ্বর একই বস্তু, দুই দিক দিয়া দুই ভাবে উহার প্রকাশ। যতদিন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, ততদিন পুরুষকার নিয়াই চলিতে হইবে। তোমার অন্তরেই পুরুষকাররূপে ঈশ্বর বিরাজিত। "পৌরুষ নৃষু"। তুমি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার অন্তরস্থ শক্তি অসীম।

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেবে কোনও ভেদ নাই

গুরু, মন্ত্র ও দেবতায় অভেদ-জ্ঞান করিয়া সাধনা ও সেবা করিতে হয়। গুরু, মন্ত্র আর দেবতা একই, নামে মাত্র ভেদ। দেবতাই গুরুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন।

গুরুরেব হরিঃ সাক্ষাৎ, নান্য ইত্যব্রবীৎ শ্রুতিঃ।

—গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অন্য নহেন, ইহা বেদবচন।

—ব্রহ্মবিদ্যাপনিষদি

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবঃ সদাচ্যুতঃ।
ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ ত্রিষুলোকেষু বিদ্যতে॥

—যোগশিখোপনিষদি

—গুরুই ব্রহ্মারূপ, গুরুই বিষ্ণুরূপ, এবং গুরুই পরম দেবরূপ। ত্রিভুবনে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টারং দেশিকং পরমেশ্বরম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য জ্ঞানফলং ভবেৎ॥

—যোগশিখোপনিষদি

—দিব্যজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) উপদেষ্টা গুরু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পরম ভক্তিসহ গুরুদেবের পূজা ও সেবা করিলে জ্ঞান-ফল লাভ হইয়া থাকে।

যথা গুরু স্তথৈবেশো যথৈবেশ স্তথা গুরুঃ।
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ॥

—যোগশিখাশ্রুতৌ

—যেরূপ গুরু সেইরূপ ঈশ্বর। যেরূপ ঈশ্বর, সেইরূপ গুরু ও মহাভক্তির সহিত পূজনীয়। উভয়ের কোন ভেদ নাই।

গুরুরেব পরং ব্রহ্মা গুরুরেব পরাগতিঃ।
গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্॥

—অদ্বয়তারক উঃ

—গুরুই পরম ব্রহ্ম-রূপ, গুরুই পরম-গতি-মুক্তিরূপ, গুরুই পরম-বিদ্যা-রূপ এবং গুরুই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। অতএব, গুরুসেবা পরায়ণ হইবে।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

শ্রীগুরু গীতায়াম্

—গুরুদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং পরম ব্রহ্ম-রূপ। তাঁহাকে নমস্কার।

সর্ব্বানুগ্রহ-কর্ত্তৃত্বা-দীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপ-মাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥

—কুলার্ণব তন্ত্রে

ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ করিবার শক্তি আছে। এই নিমিত্ত তিনি করুণাবশে গুরুরূপ ধারণ করিয়া দীক্ষা দ্বারা জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

যথা মন্ত্রে তথা দেবে যথা দেবে তথা গুরৌ।
পশ্যেদভেদতো মন্ত্রী এবং ভক্তিক্রমো মুনে ॥

—গৌতমীয় তন্ত্রে

—মন্ত্র, দেবতা ও গুরুতে অভেদ জ্ঞান করিবে। হে মুনে! ইহাই ভক্তির ক্রম।

দীক্ষাবিধা-বীশ্বরো বৈ কারণস্থল-মুচ্যতে।
গুরুঃ কার্য্যস্থলং চাতো গুরুর্ব্রহ্ম প্রগীয়তে ॥

—মন্ত্রযোগ সংহিতায়াম্

—দীক্ষাকার্য্যে ঈশ্বর কারণ-স্থল; এবং গুরু কার্য্যস্থল। সেই জন্য গুরুকে ব্রহ্মা বলে।

গুরু-পূজৈব পূজা স্যাৎ শিবস্য পরমাত্মনঃ।

মন্ত্রযোগসংহিতায়াম্

—গুরুপূজাই পরমাত্মা শিবের পূজা।

গুরৌ প্রীতে শিবঃ সাক্ষাৎ প্রসন্নঃ প্রতিভাসতে।
গুরোর্দ্দেহে মহাদেবঃ সাম্বঃ সন্নিহিতঃ সদা ॥

—ব্রহ্মগীতায়াম্

—সেবা ও পূজা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিলে মহাদেব স্বয়ং প্রসন্ন হন। গুরুদেবকে মহাদেব-রূপ জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে।

স্বগুরুং পূজয়েদ্ ভক্ত্যা মদ্বুদ্ধ্যা পূজকো মম।

—শ্রীরাম গীতায়াম্

—শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "নিজ গুরুকে আমার রূপ জানিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক (গুরুদেবের) পূজা করিবে।"

তাবৎ পরিচরেদ্ ভক্তিঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ ব্রহ্ম বিজানীয়া ন্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥

—শ্রীমদ্ভা, ১১।১৮।৩৯

—শ্রীভগবান্ বলিলেন—যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত, ঈর্ষ্যা ত্যাগ পূর্ব্বক, গুরুকে আমার রূপ জানিয়া আদর পূর্ব্বক সেবা করিবে।

ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু একই। ইঁহাদের যাঁহাকে পূজা করা যায়, তিনিই সমান ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তথা হি—

'যথা দেব স্তথা মন্ত্রো যথা মন্ত্র স্তথা গুরুঃ।
দেব-মন্ত্র-গুরুণাং চ পূজায়াঃ সদৃশং ফলম্॥'

—কুলার্ণব-তন্ত্রে

গুরুসেবা করিবার সময় ভাবিবে,—'এই গুরুসেবা দ্বারাই আমার মন্ত্রজপ ও ইষ্টপূজার কার্য্য হইতেছে'। মন্ত্র জপ করিবার সময় ভাবিবে,—'এই মন্ত্রজপ দ্বারাই আমার গুরুসেবা ও ইষ্ট-

পূজার কার্য্য হইতেছে'। যখন ইষ্টপূজা করিবে, তখন ভাবিবে—'এই ইষ্টপূজা দ্বারাই আমার গুরুপূজা ও মন্ত্রজপের কার্য্য হইতেছে'।

শ্রুতি বলেন—"আচার্য্যবান পুরুষো বেদ"। অর্থাৎ যিনি গুরু-লাভ করিয়াছেন, তিনি আত্মাকে জানিতে পারেন। ইহা অতি সত্য কথা। পরন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোনও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই গুরুলাভ হয় না। **গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে, তাঁহারই যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে।** যিনি স্থূলে বিশ্বমূর্ত্তি, সূক্ষ্মে কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি, তিনিই বিশেষ করুণাবশে বিশিষ্ট-মনুষ্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে বিচরণেচ্ছু সাধককে কৃতার্থ করেন। বিজ্ঞানময় গুরুই প্রার্থনা ও করুণা হিমে ঘনীভূত হইয়া মনুষ্য মূর্ত্তিতে—গুরুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। গুরু কখনও মানুষ হন না, অথবা মানুষ কখনও গুরু হয় না। গুরু গুরুই, তিনি ঈশান, তিনি সর্ব্বভূত মহেশ্বর, তিনি বিশ্বনাথ ; অন্তরে অন্তরে বিজ্ঞানরূপে, জ্ঞানরূপে, বিচার-রূপে নিত্যই তিনি বিরাজিত।

শ্রীগুরু-মহিমা ও শিষ্য-কর্ত্তব্য

গুরুকৃপা ভিন্ন জ্ঞানলাভ অসম্ভব। "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা।" বেদে ভগবান্ বলিয়াছেন—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'

(ছাঃ উঃ)—যিনি আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হন। অতএব, দেহ থাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আমরণ সর্ব্বপ্রকারে গুরুসেবা করিবে। অদ্বৈত-জ্ঞানে স্থিতি হইলে ও গুরুর সহিত অদ্বৈতভাবে আচরণ করিবে না। তথা হি—

জ্ঞানলাভায় বেদোক্ত প্রকারেণ সমাহিতঃ।
মহাকারুণিকং সাক্ষাদ্ গুরুমেব সমাশ্রয়েৎ॥

—সূত গীতায়াম্

—করুণাসাগর গুরুর কৃপাই জ্ঞানলাভের মুখ্য কারণ। অতএব, মুমুক্ষুগণের কর্ত্তব্য দয়ানিধি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা।

যাবচ্চোপাধি-পর্য্যন্তং তাবৎ শুশ্রূষয়েৎ গুরুম্।

—পৈঙ্গল শ্রুতৌ

—যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে অর্থাৎ আমরণ গুরুদেবের শুশ্রূষা করিবে।

নাদ্বৈতবাদং কুর্ব্বীত গুরুণা সহ কুত্রচিৎ।
অদ্বৈতং ভাবয়েদ্ ভক্ত্যা গুরোর্দ্দেবস্য চাত্মনঃ॥

—যোগশিখোপনিষদি

—গুরু শিষ্যের আত্মস্বরূপ আত্মদেব। গুরুর সহিত আত্মভাবনা-রূপ অদ্বৈতভাব রাখিয়া পরম ভক্তির সহিত গুরুসেবা করিবে। গুরুর সহিত কোনকালে দ্বৈতভাব পোষণ করিবে না এবং গুরুকে নিজ ইষ্টদেবের সহিত একভাবে দেখিবে।

অদ্বৈতং ভাবয়েন্নিত্যং নাদ্বৈতং গুরুণা সহ :— কুলার্ণব তন্ত্রে।

—সর্ব্বদা অদ্বৈত বিচার ও ভাবনা করিবে ; কিন্তু (ব্যবহারে) গুরুর সহিত নহে।

যাব-দায়ু স্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরু-রীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতি-রেবৈষ নিশ্চয় ॥

—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত-তত্ত্বোপদেশে

—যে পর্য্যন্ত আয়ু থাকে, সে পর্য্যন্ত বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরকে মনে, বাক্যে ও কর্ম্মে পূজা করিবে। ইহা বেদের আদেশ।

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষুলোকেষু না-দ্বৈতং গুরুণা সহ ॥

—শ্রীমৎ শঙ্কর'চার্য্যকৃ॰-সারতত্ত্বোপদেশে

—বিচারে মনে মনে সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব পোষণ করিবে ; কিন্তু কার্য্যে (ব্যবহারে) অদ্বৈতভাব দেখাইবে না। তিন লোক-বিষয়ে অদ্বৈতভাব পোষণ করিবে ; কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতভাবে আচরণ করিবে না।

তস্য দাস্যং সদা কুর্য্যাৎ প্রজ্ঞয়া পরয়া সহ ;

শুভং বাঽশুভমন্যদ্বা যদুক্তং গুরুণা ভূবি ॥—ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতৌ

—জ্ঞানলাভ হইলেও গুরুসেবা সর্ব্বদা করণীয়। গুরুদেবের আদেশ বিনা বিচারে পালনীয়। আদেশ শুভ অথবা অশুভ ইহা বিচার করিতে নাই।

শ্রীগুরু পাদুকা-পূজন

গুরুদেবের পাদুকা পূজা করিবে। মহাভাগ্যবশে গুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার পাদোদক পান করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিবে। পদ এবং অঙ্গুলি তেজের স্থান; সুতরাং পাদুকায় ও পাদোদকে এবং (অঙ্গুলি-স্পৃষ্ট) ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদে গুরুর তেজ (শক্তি) সংশ্লিষ্ট থাকে। অতএব, পাদুকা-পূজায় ও পাদোদক-পানে এবং প্রসাদ-গ্রহণে গুরু-শক্তি শিষ্য মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া শিষ্যের দেহ ও মন শুদ্ধ করে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

অপায়াৎ পাতি নিয়তং দুঃসঙ্গাদ্ দুর্নিমিত্তকাৎ।
কামিতার্থ-প্রদানা-চ্চ পাদুকা পরিকীর্ত্তিতা॥

—গৌতমীয় তন্ত্রে

—গুরুদেবের পাদুকা (পূজিত হইলে) আপদ্, দুঃসঙ্গ ও দুর্নিমিত্ত হইতে শিষ্যকে সর্ব্বদা রক্ষা করে, এবং তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। এই কারণে 'পাদুকা' নাম।

মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে মহাভয়ে।
মহাপদি মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা॥ —কুলার্ণবতন্ত্রে

—গুরু-পাদুকা স্মরণ করিলে, ভীষণ রোগ, মহান্ উৎপাত, মহাদোষ, ভয়, আপৎ ও পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্রীগুরু-চরণোদক ও শ্রীগুরু-প্রসাদের মহিমা

জ্ঞানযোগ-পরাণাং তু পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
ভাবশুদ্ধ্যর্থ-মজ্ঞানাং তত্তীর্থং মুনিপুঙ্গব।

—জাবালদর্শনশ্রুতৌ

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জ্ঞানিগণের পাদপ্রক্ষালিত জল অজ্ঞানিদিগের ভাবশুদ্ধিকারক; এই কারণে তাহা (জল) তীর্থস্বরূপ।

গুরুপাদোদকং সম্যক্ সংসারার্ণব-তারণম্।
অজ্ঞানমূল-হরণং জন্মকর্ম্ম-নিবারণম্।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধ্যর্থং গুরু পাদোদকং পিবেৎ॥

—শ্রীগুরুগীতায়াম্

—গুরুর পাদধৌত জল সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে, অজ্ঞানের মূল (কারণ) নষ্ট করিয়া দেয়, জন্ম ও কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিদান করে, এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গুরুপাদোদক পান করিবে।

গুরু-পাদোদকং পেয়ং গুরো-রুচ্ছিষ্ট-ভোজনম্।

—শ্রীগুরুগীতায়াম্

—গুরুদেবের পাদধৌত জল পান করিবে, এবং গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিবে।

অনিবেদ্য গুরৌ ভুঙ্‌ক্তে য স্তে্বকগৃহ-সংস্থিতৌ।
অমেধ্যং তদ্ভবেদন্নং শূকরো জায়তে মৃতঃ॥ —কুলার্ণবে

—গুরুর সহিত এক গৃহে থাকিয়া তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিলে, সেই খাদ্য অপবিত্র হয়, এবং শিষ্য মরিয়া শূকরজন্ম লাভ করে।

গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরম্। —যোগিনীতন্ত্রে

—গুরুর ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিলে শিষ্যের দেহ ও মন শুদ্ধ হয়।

'নির্ণয়সিন্ধু' তৃতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—"গুরূচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং প্রযুঞ্জীত, ন কামতঃ।" ইতি পারিজাতে কৌর্ম্মে। এতন্নিষিদ্ধং মধ্বাদিবিষয়ম্। অন্যস্তু গুরূচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বদা প্রাপ্তেঃ। 'স চেদ্ব্যাধীয়ীত কামং গুরো-রুচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং সর্ব্বং প্রাশ্নীয়াৎ।' ইতি বসিষ্ঠোক্তেঃ। অর্থাৎ 'পারিজাত' নামক গ্রন্থে 'কুর্ম্মপুরাণে'র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ (দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি-নাশের নিমিত্ত) ঔষধরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কোন প্রকার লোভের জন্য নহে। এই নিষেধ মধু, মাংস, মদ্যাদি-গ্রহণ-বিষয়ে। মধু মাংসাদি ভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সর্ব্বদাই গ্রহণযোগ্য। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—ব্রহ্মচারী রোগাক্রান্ত হইলে, রোগনিবারণার্থ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ উচ্ছিষ্ট প্রসাদই ভোজন করা কর্ত্তব্য। সে সময়ে মধু, মাংসাদি প্রসাদও ত্যাগ করা উচিত নহে॥

'ধর্ম্মসিন্ধু' তৃতীয় পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে—

'গুরূচ্ছিষ্টং মধ্বাদিকং নিষিদ্ধমপি তদন্যাপরিহার্য্য-রোগ-নিবৃত্ত্যর্থং ভক্ষনীয়ং নিষিদ্ধান্যৎ গুরূচ্ছিষ্টং ত্বনৌষধমপি ভক্ষ্যম্'।

'নারদপঞ্চরাত্রে' লিখিত হইয়াছে—

আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টা-লিঙ্গনেন চ।
মূচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥

—গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ, পদধূলি, ভোজনশেষ প্রসাদ এবং আলিঙ্গন (স্পর্শ) দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়।

দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মের কথা

শ্রীনারায়ণাবতার, অমোঘদৃষ্টি, যথার্থদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেবের মহিমা ও কৃপা অপার, কলিহত অল্পায়ুঃ তরলমতি আস্তিক অধিকারীর পরম কল্যাণার্থ তিনি অনন্ত 'বেদে'র বিভাগ করিয়াছেন এবং বেদকে সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত বেদের উপবৃংহণ-বিস্তার-সরলীকরণ 'অষ্টাদশ পুরাণে'রও অনুস্মরণান্ত প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বল বুদ্ধি সদাচারনিষ্ঠ বৈদিকদিগের অকথনীয় মঙ্গল করিয়াছেন। নিখিল আস্তিক-সম্প্রদায়ের পরমমান্য পরম কল্যাণকারক 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'শ্রীব্রহ্মসূত্রের' প্রকাশকও এই পরমকারুনিক শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। 'শ্রীমদ্-

ভাগবতে'র স্মারক ও আদি প্রচারকরূপেও তাঁহারই নাম প্রসিদ্ধ। এই জগৎ-মঙ্গলকারী মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে 'শ্রীনারদ-ব্যাস-সংবাদ' দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে আপনার গত জন্মের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন,—হে মুনে! আমি পূর্ব্বজন্মে কোন প্রাচীন কল্পে এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার মা কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। গঙ্গাতটে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ফল-ফুল-শোভিত একটি মনোরম উদ্যান ছিল। প্রতি বৎসর বর্ষাগমে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতধারী কতিপয় ঈশ্বর-পরায়ণ ঋষি আসিয়া সেই উদ্যানে একত্রে বাস করিতেন। আমার মা আমার শৈশবাবস্থাতেই আমাকে সেই ঋষিদিগের সেবায় নিযুক্ত করিতেন—"অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে দাস্যাস্তু কস্যাশ্চন বেদ-বাদিনাম্। নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥" (১।৫।২৩)। বালক-স্বভাব-সুলভ সমস্ত চপলতা ও ক্রীড়-সামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতচিত্তে একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া সেই মুনিগণের সেবা আমি সর্ব্বদা করিতাম, আমি কখনও অধিক কথা বলিতাম না। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ সমদর্শী হইলেও আমার উপর অত্যধিক অনুগ্রহ করিতেন—"তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে দান্তেঽধৃত-ক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি। চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥" (১।৫।২৪) তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান

ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন আমি তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে স্নেহবশতঃ তিনি আমাকে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি তাঁহার ভোজনপাত্রে রক্ষিত প্রসাদ গ্রহণ করিলাম—আশ্চর্য্য, ইহাতেই আমার হৃদয়ের সমস্ত পাপ যেন নষ্ট হইয়া গেল! সেইদিন হইতে প্রতিদিন তাঁহার ভোজনাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে উত্তরোত্তর আমার চিত্তশুদ্ধি হওয়াতে তাঁহাদের ধর্ম্মে আমার রুচি উৎপন্ন হইল— "উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ। এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥" (১৫।২৫)।

যথার্থ ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-দেবতার ভোজনাবশেষ প্রসাদ শ্রদ্ধাবান্‌দিগের পক্ষে সদাই চিত্ত-শুদ্ধি কারক ও মঙ্গলকারী। দেবর্ষি নারদের কথিত উক্ত কাহিনীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপর্য্যুক্ত সৎ শাস্ত্রসমূহের প্রমাণে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, আপনার শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ ত সদাসর্ব্বদা সভক্তি গ্রাহ্যই, অধিকন্তু সদাচারী ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণদেহধারী সাধুমহাত্মাগণের ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদও চিত্তশুদ্ধিকারক হওয়াতে সর্ব্বদা আদরণীয় (গ্রহণীয়)।

শ্রীগুরু, দেবতা ও রাজার নিকট খালি হাতে যাইবে না

দূরদেশ হইতে খালি হাতে গুরু, দেবতা অথবা রাজার নিকট যাইবে না। নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ফল, মূল, পুষ্প, বস্ত্র বা বেশভূষা লইয়া দর্শনে যাইবে। খালি হাতে গেলে খালি হাতেই ফিরিয়া আসিতে হয়।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।'

—মুণ্ডকোপনিষদ্

—সেই অব্যক্ত পরমতত্ত্ব জানিবার জন্য উপহার হাতে লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকট যাইতে হয়।

'মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ'''সদ্‌গুরুং বিধিবদুপসঙ্গম্য উপহারপাণয়ঃ।

—মুক্তিকোপনিষদ্

—মুমুক্ষু মানবগণ উপহার হাতে লইয়া সৎগুরুর নিকট উপস্থিত হন।

'শ্রদ্ধালু মোক্ষশাস্ত্রেষু বেদান্তজ্ঞান-লিপ্সয়া।
উপায়ন-করো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ॥'

—নাঃ পঃ উপনিষদ্

—মোক্ষশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ দীক্ষার্থী বেদান্তজ্ঞান লাভের জন্য কিছু উপহার হাতে লইয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবে।

'রিক্তহস্তো ন পশ্যেচ্চ রাজানং দেবতাং গুরুম্।
ফল-পুষ্পা-ম্বরা-র্থাদীন্ যথাশক্তিঃ সমর্পয়েৎ ॥'

—মেরুতন্ত্রে

—রাজা, দেবতা ও গুরুর সহিত খালি হাতে দেখা করিতে যাইবে না। আপন শক্তি অনুসারে ফল, ফুল, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি তাঁহাকে অর্পণ করিবে।

'রিক্তপাণিস্তু ন পশ্যেদ্ রাজানং দেবতাং গুরুম্।
নৈমিত্তিকং বিশেষেণ ফলেন ফলমাদিশেৎ ॥'

—কালিদাসঃ

—খালি হাতে রাজা, দেবতা ও গুরুকে দর্শন করিতে নাই, বিশেষতঃ নৈমিত্তিককে উপহার লইয়া দর্শনে গেলে কার্য্যের সুফল পাওয়া যাইবে, এই সূচনা হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত উপহার না দিলে কোনই উপকার হয় না; বরং দাতার ক্ষতি হইয়া থাকে।

সর্ব্বস্ব-মপি যো দত্বাদ্ গুরৌ ভক্তি-বিবর্জিতঃ।
শিষ্যো ন ফল-মাপ্নোতি ভক্তি-রেবহি কারণম্ ॥'

—কুলার্ণবে

—অভক্তির সহিত সমস্ত ধন সম্পত্তিও যদি গুরুকে দেওয়া যায়, তথাপি শিষ্য কোন ফল পায় না। ফল লাভ করিতে ভক্তিই একমাত্র কারণ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥'

—শ্রীগীতা, ১৭।২৮

—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপ অথবা অপর যাহা কিছু কর্ম্ম করা হয়, তাহা সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। তাদৃশ কোন কার্য্য ইহসংসারে বা পরলোকে সফল হয় না।

অন্যত্র বলিয়াছেন—

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥'

—শ্রীগীতা, ৯।২৬

—যিনি ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল অর্পণ করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের সমর্পিত তৎসমুদায় প্রীত হইয়া গ্রহণ করি।

দেশাচার, কুলাচার ও সদাচার-মহিমা

শ্রুতি এবং স্মৃতিতে যাহার বিধি নাই, অথচ নিষেধও নাই, কিন্তু যদি তাহা দেশাচারে অথবা কুলাচারে থাকে, তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্মরূপে গ্রাহ্য হইবে। এই কারণে বলা হইয়াছে—"ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধেয়া ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচারঃ কুলাচার স্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ॥" অতএব, দেশাচার ও কুলাচার পরিত্যাগ করা উচিত নহে—"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মং তং স্বগোত্র-ধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চ ॥"

যে দেশে যে আচার বিদ্যমান্, তাহা পালন করিবে। যেহেতু দেশাচার লঙ্ঘন করিলে দেশবাসী সকলে আচার লঙ্ঘনকারীর অহিত কামনা করে। তখন বহু আত্মার একত্রিত শক্তিতে তাহার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উক্তং চ—

'গ্রামধর্ম্মা জাতিধর্ম্মা দেশধর্ম্মাঃ কুলোদ্ভবাঃ।
পরিগ্রাহ্যা নৃভিঃ সর্ব্বৈ নৈর্ব তান্ লঙ্ঘয়েন্ মুনে।'

—দেবীভাগবতে

—গ্রামের ধর্ম্ম, জাতির ধর্ম্ম, দেশের ধর্ম্ম এবং কুলের ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। ঐ সকল আচরণ অবজ্ঞা করিতে নাই।

'দেশাচারাঃ পরিগ্রাহ্যা স্তত্তদ্দেশীয়ৈর্জনৈঃ।
অন্যথা পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥'

—বৃহন্নারদীয়পুরাণে

—যে দেশে যে আচার বিদ্যমান, সেই দেশের লোকের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; নতুবা সে পতিত হয়।

'যস্মিন যত্র য আচার স্তত্র ধর্ম্মস্ত তাদৃশঃ।'

—গন্ধর্ববতন্ত্রে

—যে দেশে যে আচার প্রচলিত, সেই দেশে সেই আচারই ধর্ম্ম।

মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—

কুলে যস্মিংশ্চ যো ধর্ম্মঃ শাশ্বতঃ পূর্ববজৈঃ কৃতঃ।
তেনৈব বর্ত্তিতব্যং হি বিরুদ্ধা নাধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে কুলে যে ধর্ম্মাচার সনাতন কাল হইতে পূর্ববপুরুষগণের দ্বারা আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহার পালন করাই কর্ত্তব্য, তাহার বিপরীত চলা উচিত নহে, বিপরীত চলিলে অধোগতি হয় ॥

(২।১৮) মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

যস্মিন্দেশে য আচার পারংপর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানামন্তরালানাং স সদাচার ইষ্যতে ॥

—যে দেশে যে বর্ণে যে আচার (পূর্ববকাল হইতে) পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সেই বর্ণের (জাতির) 'সদাচার' বলে ॥

ভীষ্মদেব বলিয়াছেন—

যোহন্যদেশসমাচারং দেশেহন্যস্মিন প্রবর্ত্তয়েৎ।
সতু দেশস্য দাসত্বং দেশমধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক দেশের আচার অপর দেশে প্রচলিত করে, সে সেই অপর দেশকে পূর্ববদেশের দাসরূপে পরিণত করে। এবং সেই দেশের অধোগতি হয়। এই কারণে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন ঋষ্যতে ॥"

(৪—১৭৮)

বিভিন্ন শাস্ত্রে নানাপ্রকারের শাসন (আদেশ) থাকিলেও, যে শাস্ত্র অনুসারে পিতা, পিতামহাদি জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। তাহাই সৎমার্গ; সেই মার্গ ধরিয়া চলিলে কোনও প্রকার অকর্ম্ম তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥—কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কোন দেশাচার বা কুলাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, যাহার স্পষ্ট নিষেধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। সকল অবস্থাতেই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মই উপাস্য কিন্তু প্রচলিত থাকিলেও শাস্ত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনও উপাস্য নহে—"সর্ববত্র হি শাস্ত্রপ্রাপিতা এব ধর্ম্মা উপাস্যাঃ, ন বিদ্যমানা অপ্যশাস্ত্রীয়াঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২।২।১এ শাঙ্কর ভাষ্য)।

তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের তিনপ্রকার 'ভাব' উক্ত হইয়াছে—দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাবে সাধনা করেন, তাঁহারা 'দিব্য' বা 'দিব্যাচারী;

যাঁহারা মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ 'ম-কার' যোগে সাধনা করেন, তাঁহারা 'বীর' বা 'বীরাচারী' বা 'বামাচারী'; আর যাঁহারা বেদবিধি-অনুসারে সাধনা করেন, তাঁহারা 'পশু' বা 'পশ্বাচারী'। অষ্টপাশ-বদ্ধ জীবকে 'পশু' বলা হয়। সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত 'দিব্যভাবে', ত্রেতাযুগের শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত 'বীরভাবে,' এবং কলিযুগে 'পশুভাবে' সাধন করিবার বিধি রহিয়াছে—"সত্য ত্রেতার্দ্ধপর্য্যন্তং দিব্যভাববিনির্ণয়ঃ। ত্রেতা-দ্বাপর-পর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতম্। দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিযুগে সুলোচনে॥" (কালীবিলাস-তন্ত্রে)। 'প্রাণতোষণী'-ধৃত 'মহা-নির্ব্বাণ'-তন্ত্রে ও উক্ত হইয়াছে—"দিব্য-বীর-ময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন। কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেৎ নৃণাম্॥" অতএব, কলিকালে মদ্য মাংসাদি দ্বারা পূজা বা সাধনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়াতে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কায়মনোবাক্যে সত্যধর্ম্ম পালনে সচেষ্ট থাকিবে; যেহেতু সত্যধর্ম্ম পালন দ্বারা সত্বর চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'সত্যংবদ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।'—'সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।'—সত্য বলিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। যে মিথ্যাভাষণ করে, সে সমূলে পরিশুষ্ক হইয়া যায় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও গীতা-স্বাধ্যায়

প্রতিদিন সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া কিছু সময় ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিবে; যেহেতু ভগবন্নাম কীর্ত্তন মনঃস্থৈর্য্যের এক প্রধান উপায় ও সহায়ক।

প্রতিদিন স্বাধ্যায়-রূপে গীতা পাঠ করিবে। গীতাপাঠে সর্ব্বশাস্ত্রপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে, কারণ গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার ও সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'জনঃ সংসার-দুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥'

অর্থাৎ সংসার-দুঃখে নিতান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ করিয়া গীতামৃত পান করতঃ জগতে শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে ও সুখী হইবে॥ কলিযুগে সাধারণের পক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই একমাত্র অধ্যাত্ম ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রতিদিন শ্রীগীতার এক শ্লোক বা এক চরণ কণ্ঠস্থ করিবে।

চার দুর্ল্লঙ্ঘ্য সেতু ও তাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়

যদি জন্ম মৃত্যুরূপ জ্বালামালা পূর্ণ মহাদুঃখময় সংসার-সাগর পার হইতে চাও, তবে বিশেষ পুরুষকারযোগে দুর্ল্লঙ্ঘ্য চারিটি

সেতু উত্তীর্ণ হও। প্রথম সেতু—অদান (দান না করা); দ্বিতীয় সেতু—ক্রোধ; তৃতীয় সেতু—অশ্রদ্ধা; চতুর্থ সেতু—অসত্য। এই চারিটী জীবের বন্ধন-কারণ; ইহারাই জীবের আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক, ইহারাই অখণ্ডৈকরস আত্মপদ পাইতে দেয় না। "অদানং ক্রোধঃ অশ্রদ্ধা অসত্যমিতি যৎসেতুচতুষ্টয়ং তজ্জন্তোঃ প্রাণিনঃ বদ্ধায় ভবতি।" (সামবেদোক্ত কল্মষসামের শাঙ্কর ভাষ্য)।

"ব্রহ্মার্পণত্বেন যদ্দীয়তে তদ্দানমিতি।"—'ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি',—এই ভাবনায় যে দান, তাহাই দান। "তদন্যদ্ দেহ-ভার্য্যা-পুত্রাদ্যর্থং যদ্ব্যয়ীক্রিয়তে তদদানম্।"—ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি, এই ভাব ভিন্ন দেহ, ভার্য্যা, পুত্র প্রভৃতির জন্য যাহা ব্যয় করা হয়, তাহা অদান। "এবং দানেন অদান-মূলঙ্ঘ্য দেহাদ্যর্থং ব্যয়ীকৃতমপি ব্রহ্মার্পণমিতি জ্ঞাত্বৈব কুরু।"—ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি, এই ভাবনাময় দানের দ্বারা অদানরূপ প্রথম সেতু অতিক্রম কর, দেহ, ভার্য্যা, পুত্র প্রভৃতিতে সমষ্টিভাবে যে ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) আছেন, তিনিই আমি "সোঽহমস্মি," ইহা জানিয়া, সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মার্পণ হইতেছে—এই ভাবনায় সকলের নিমিত্ত ব্যয় কর (দান কর)। তদুক্তং ভগবতা—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

—শ্রীগীতা, ৯।২৭

হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, হবন কর, দান কর বা তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর॥

"অক্রোধেন ক্ষমারূপেণ ক্রোধং দ্বিতীয় সেতুং তর।" —অক্রোধ অর্থাৎ ক্ষমাগুণ অভ্যাসে ক্রোধরূপ দ্বিতীয় সেতু উত্তীর্ণ হও। "বুদ্ধি-পর্য্যন্তমেব ক্রোধঃ, ততোঽগ্রে ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়, 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' ইতি ভগবদুক্তেঃ।"—বুদ্ধি (প্রকৃতি) পর্য্যন্ত ক্রোধ; 'বুদ্ধির ও উপরে যিনি তিনি ব্রহ্ম।' 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবনারূপ অক্রোধ দ্বারা, বুদ্ধি (প্রকৃতি) পর্য্যন্ত সমস্তই যাহা ক্রোধ, তাহা অতিক্রম কর (ত্যাগ কর)।

"শ্রদ্ধয়া কৃত্বা অশ্রদ্ধাং তৃতীয়-সেতুং তর।"—শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধারূপ তৃতীয়-সেতু উত্তীর্ণ হও। "যঃ পুরুষঃ, মা ইতি মহ্যং, দদাতি সর্ব্বং নিবেদয়তি, স ই স এব দেবং আবাঃ প্রাপ্তবানিত্যাস্তিক্য বিশ্বাসা-দশ্রদ্ধাং তৃতীয়-সেতুং তর।"— যে পরমাত্মা আমাকে সমস্তই দিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে আমি পাইয়াছি; আমিই আত্মস্বরূপ সেই পরমাত্মা,—এই আস্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অনাস্তিক্য খণ্ড-বুদ্ধি অশ্রদ্ধারূপ তৃতীয় সেতু অতিক্রম কর।

"অথ সত্যেন ব্রহ্মণা অনৃতং প্রাতিভাসিকং বিশ্বাকারং তর।" সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া প্রাতিভাসিক বিশ্বরূপ অসত্য-সেতু উত্তীর্ণ হও। "তত্রোপায়মাহ। অহং জীবরূপেণান্নমদ্মি। তথা প্রলয়ে অন্নং অদন্তং ভক্ষয়ন্তং অগ্ন্যা-দ্যুপাধিভূতং সর্ব্বং অগ্নৌ

আহুতিপ্রক্ষেপবৎ জুহোমি, 'যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্' ইতি ভাবয়েৎ।"—উপায় কথিত হইতেছে। আমি জীবরূপে অন্ন ভোজন করি। এখন আমি আমার মুখরূপ যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতেছি। কিন্তু প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্টি অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ন্যায় সেই পরমাত্মাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমিই হোম করিব। সমস্ত বলিয়া যাহা কিছু ভাসিতেছে, এই সমস্ত লয় হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমি।—এই সত্য ভাবনা—ব্রহ্মভাবনা—আত্মভাবনা দ্বারা অসত্যরূপ চতুর্থ সেতু উত্তীর্ণ হও। "এব-মেষা উক্তপ্রকারা গতি-রুদ্ধার-প্রকারঃ।"—ইহাই গতি, ইহাই উদ্ধারের উপায়। (সামবেদ ছন্দ আর্চিক, ষষ্ঠ অধ্যায়, নবমীবাক্)

প্রতিদিন নিম্নলিখিত বিচার ও কর্ম্ম অভ্যাস করিবে।—

(ক) অসৎ যাহা কিছু তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জগতের ব্যথিত জীবকুলের দুঃখপূর্ণ-হাহাকারজড়িত মর্ম্মভেদী করুণ-দৃশ্যের ভাবনা এবং নিজের জন্ম, ব্যাধি ও জরাবস্থার দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ বিচার ও নিজের মৃত্যু-চিন্তা। "জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।"

(খ) সৎ যাহা তাহা সমকালে নির্গুণ, সগুণ আত্মা ও অবতার।

[সৃষ্টি যখন নাই, তখন তিনি আপনি আপনভাবে স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া নির্গুণ বা গুণাতীত অবস্থায় স্থিত। সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া তিনি যখন লীলা করেন, তখন তিনি সগুণ। সমষ্টি ভাবে যিনি সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট বা বিশ্বেশ্বর, তিনিই প্রতি সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে আত্মা। আর জগতের ভাব ও কর্ম্ম বিপর্য্যয়ে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তিনি অবতার রূপে উদিত হন। পরমাত্মা স্বরূপে নির্গুণ, তটস্থে বিশ্বরূপ ও আত্মা এবং জগদ্বিপর্য্যয়ে অবতার।]

(গ) প্রতিদিনের সাধনায় (১) আমি তোমার, (৩) তুমি আমার, (৩) তুমিই আমি,—এইরূপ বিচার করিয়া বুঝিয়া আপন স্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার-পরায়ণ হইবে।

শ্রদ্ধা

সকল ধর্ম্মের পক্ষে শ্রদ্ধাই অতীব হিতকারী। শ্রদ্ধাই কর্ম্ম-জনিত ফলাফল আনয়ন করে এবং তাহার সদ্ভাব ও অসদ্ভাবে ফলের তারতম্য ঘটে। শ্রদ্ধা ফল-পরিণামী কর্ম্মের অঙ্গ-স্বরূপ অর্থাৎ যে কর্ম্ম যথাকালে বিহিত ফল প্রদান করিবে, শ্রদ্ধা সেই কর্ম্মেরই নিত্য সঙ্গিনী। শ্রদ্ধা-বিরহিত ভাবে সম্পাদিত কোন ও ক্রিয়া ফল প্রদান করিতে পারে না।

স্কান্দে নাগর-খণ্ডে কথিত হইয়াছে—

'ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে পাষাণে মৃত্তিকাসু চ।
ভাবেষু বিদ্যতে দেবো মন্ত্র-সংযোগ-সংযুতঃ ॥'

অর্থাৎ কাষ্ঠ, পাষাণ অথবা মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত প্রতিমাতে দেবতা প্রকটিত থাকে না। ভাবনা প্রভাবে ও মন্ত্র-প্রয়োগে ঐ সকল প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব ও স্থিতি সংঘটন করিয়া শ্রদ্ধালু সাধক ইষ্টফল লাভ করিয়া ধন্য হয়। সুতরাং, শিষ্যের ভাবনার উপরই গুরুর দেবত্ব ও স্বীয় ইষ্ট ফল প্রাপ্তি নির্ভর করে। অতএব, গুরুতে দেবত্ব ভাবনায় দেব-কৃপা লাভ হয়।

তথা হি—

'দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।'

দেবতায়, তীর্থে, ব্রাহ্মণে, মন্ত্রে, দৈবজ্ঞে, ঔষধে এবং গুরুতে যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

'ইহা এইরূপই' 'ইহা সত্য,' 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না,' এবম্প্রকারের জ্ঞান না হইলে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় না। অতএব, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা একই পদার্থ। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে, শ্রদ্ধা ঋত বা সত্যের (পরমার্থ ব্রহ্মের) প্রথমজা—ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রথম উৎপন্না ; অতএব, ইনি

বিশ্বের—নিখিল প্রাণিজাতির পোষয়িত্রী. ইনি জগতের প্রতিষ্ঠা —আশ্রয় ("শ্রদ্ধা দেবী প্রথমজা ঋতস্য। বিশ্বস্য ভর্ত্রী জগতঃ প্রতিষ্ঠা।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)।

যাহা যাহা, মানুষ যখন তাহাকে ঠিক তদ্ভাবে জানিতে পারে, তখন তাহার 'ইহা এইরূপই,' 'ইহা অন্যরূপই হইতে পারে না,' এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। অতএব, কর্ম্মবিশেষ দ্বারা চিত্তের অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, শ্রদ্ধা দেবীর আবির্ভাব হয়, 'ইহা এইরূপই,' 'এতদ্দ্বারা এই ফল প্রাপ্তি হইবে,' ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রকাশ হয়।

শ্রদ্ধাবান্ না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না, শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, শ্রদ্ধার উদয় না হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না, যাহার যাদৃশী শ্রদ্ধা তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, শ্রদ্ধাই সিদ্ধি প্রাপ্তির একমাত্র হেতু, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের আদিতে, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের মধ্যভাগে এবং শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের অন্তে সংস্থিত, শ্রদ্ধা বিনা ধর্ম্ম হয় না। পরমাত্মা সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃতে (মিথ্যাতে) অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলেই সত্যের দর্শন হয়, সত্যকে পাওয়া যায়। সত্য আছে, সত্যজ্ঞান আছে, মানুষ সত্যকে জানে, সত্যকে সৃষ্টি করে না। এই সত্যই মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বসৌন্দর্য্য-ঘন পরমাত্মা—"সত্যং শিবং সুন্দরম্"।

শ্রদ্ধা আত্মস্বরূপ জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা, উহা সত্যরূপে, নিশ্চয় জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধা লাভ না হইলে আত্মস্বরূপ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আশা বৃথা। এই হেতু উক্ত

হইয়াছে—শ্রদ্ধাবান্ লভতে "জ্ঞানং"। শ্রদ্ধা একবার উদয় হইলে তাহা আর অস্ত যায় না। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন— "শ্রৎ সত্যম্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা।" অর্থাৎ যে প্রত্যয় (প্রতীতি) নিয়ত সত্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। সত্যের প্রতিষ্ঠাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলে গুরুবাক্যে, বেদান্তবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধা লাভ হয়। লীলা-স্বীকৃত-কল্পিত মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই সাধক-হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হেশ্রদ্ধারূপিণী তারিণি! তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে আবির্ভূ তা হও। আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হই।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।"

।। ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।।

দ্বিতীয় অংশ

মন্ত্রচৈতন্য বা কুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন

ওঁ

মন্ত্রচৈতন্য বা কুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন

প্রথম অধ্যায়

দীক্ষা-প্রণালী

দীক্ষা প্রণালী দুই প্রকার,— বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য-ব্যাপার সম্পন্ন দীক্ষাকে 'ক্রিয়াবতী' বা 'সাধারা' দীক্ষা বলে, এবং আভ্যন্তর ব্যাপার সম্পন্ন দীক্ষাকে 'জ্ঞানবতী' বা 'নিরাধারা' বা 'বেধ' দীক্ষা বলে। "দীক্ষা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বাহ্যা-ভ্যন্তর-ভেদতঃ। ক্রিয়াদীক্ষা ভবেদ্বাহ্যা বেধাখ্যাভ্যন্তরী মতা॥" (কুলার্ণবে)—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দীক্ষা দুই প্রকারের কথিত হইয়াছে। ক্রিয়া দীক্ষাকে 'বাহ্য' দীক্ষা, এবং বেধদীক্ষা * বা মানস দীক্ষাকে 'আভ্যন্তরী' দীক্ষা বলে। 'দ্বিধা দীক্ষা সাধারা চ নিরাধারা তথৈব চ। নিত্যেনৈমিত্তিকে কাম্যে যস্যা শৈচবা-ধিকারিতা॥ সাধারা সা চ সংপ্রোক্তা নিরাধারা চ মুক্তিদা। নির্ম্মলা সা চ বিজ্ঞেয়া কথ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥" (যোগিনীতন্ত্রে)— সাধারা ও নিরাধারা ভেদে দীক্ষা দুই প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য বিষয়ে যে দীক্ষা, তাহাকে 'সাধারা' বলে; এবং মুক্তির জন্য যে নির্ম্মল (নিষ্কাম) দীক্ষা, তাহাকে 'নিরাধারা' বলে।

---

* শ্রীগুরুর মননে তাঁহার অব্যক্ত শক্তি দ্বারা শিষ্য বিদ্ধ হইলে, তাহাকে 'বেধ দীক্ষা' বলে। বেধদীক্ষার চিহ্ন 'কুলার্ণবে' উক্ত হইয়াছে—

[সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়ার জন্য যে উপনয়নাদি দীক্ষা ; মারণ-বশীকরণাদি সিদ্ধির নিমিত্ত যে তামসী তান্ত্রিকী দীক্ষা ; এবং ধন, জন, যশঃ, ঐশ্বর্য্যাদি লাভার্থ যে দীক্ষা ; তাহাকে 'সাধারা' দীক্ষা বলে। এই দীক্ষায় কুণ্ড, মণ্ডল, কলস, ঘৃত, পুষ্প, চন্দন, জল প্রভৃতি স্থূল বস্তুর সাহায্য আবশ্যক হয় ; এবং প্রোক্ষণ, তাড়ন্, অভিষেক, পূজা, হোম, দক্ষিণা প্রভৃতি নানা প্রকার বাহ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয় ; এই কারণে ইহার নাম 'সাধারা'। স্থূল বস্তু ও বাহ্য ব্যাপারের সহায়ে এই দীক্ষা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা প্রধানতঃ স্থূল ভোগসুখ প্রদান করে ; এবং এইরূপ দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি ও বাহ্যপূজা, জপাদি নিয়াই ব্যাপৃত থাকে। স্থূল হইতে উৎপন্ন হওয়াতে এই দীক্ষায় স্থূল ফলই উৎপাদন করে। আর 'নিরাধারা' দীক্ষায় কোনও বাহ্য বস্তুর বা বাহ্যক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না, ইহা মানসিক ব্যাপারে সাধিত হয়। শ্রীগুরু স্বকীয় মানসিক ব্যাপার মাত্র অবলম্বন করিয়া দর্শন, স্পর্শন, ভাষণ বা ধ্যানের দ্বারা এই দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। সূক্ষ্ম উপায়ে সম্পন্ন এই দীক্ষা মোক্ষাদি সূক্ষ্ম ফলই প্রসব করে ; এবং এইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তি ও জ্ঞান বিচার, ধ্যানসাধন, মানসিক

"আনন্দশ্চৈব কম্প—শ্চোদ্ভবো ঘূর্ণা কুলেশ্বরি। নিদ্রা মূর্চ্ছা চ বেধস্য ষড়বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ দৃশ্যন্তে ষড়্গুণা হেতে বেধনেন কুলেশ্বরি : বেধিতো যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্ মুক্তো ন সংশয়ঃ।"—বেধদীক্ষা লাভ হইলে আনন্দ, কম্প, উদ্ভব (ভূমি হইতে উত্থান বা ভেকগতি, বা বায়ুর ঊর্দ্ধগমন), ঘূর্ণা, নিদ্রা ও মূর্চ্ছা—এই ছয়টী অবস্থা প্রকাশ পায়। এই ছয় গুণ যাঁহার মধ্যে দেখা যায়, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিয়াই নিশ্চয় মুক্ত।

জপাদি আন্তর ক্রিয়ায়ই ব্যাপৃত থাকেন। কোন বাহ্য বস্তু বা বাহ্য ব্যাপারের অপেক্ষা করে না বলিয়া এইরূপ দীক্ষাকে 'নিরাধারা' দীক্ষা বলে।] 'মেরুতন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—"যঃ ক্ষণেনাত্মসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি। ক্রিয়া-ন্যাসাদি-রহিতঃ স গুরুর্দেব-দুর্লভঃ॥" —যিনি বাহ্যপূজা হোমাদি ব্যাপারের আয়াস স্বীকার না করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে স্বসামর্থ্য· স্বাশ্রিত শিষ্যে সঞ্চার করিতে পারেন, সেই গুরু দেবতারও দুর্লভ॥ 'যোগবাশিষ্ঠে' উক্ত হইয়াছে—'দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্য-দেহকে।. জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥"—যিনি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দ দ্বারা শিষ্যের দেহমধ্যে মঙ্গলময় শৈবভাব উৎপাদন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু॥ 'শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়' উপদিষ্ট হইয়াছে—'গুরোরালোক-মাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্ জন্তোঃ পাশোপক্ষয় কারিণী।"—গুরুর দৃষ্টি, স্পর্শ ও বাক্য দ্বারা সদ্যঃ সংজ্ঞা (সম্যক্ আন্তর অনুভাব বা জ্ঞান) লাভ হয়, তাহা জীবের পাশসমূহকে সম্যক্ নাশ করে॥ 'কুলার্ণবে' জ্ঞানবতী আন্তর দীক্ষার বিবরণ এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—"স্পর্শাখ্যা দেবি দৃগ্-দীক্ষা মানসাখ্যা মহেশ্বরি। ক্রিয়া-ন্যাসাদি-রহিতা দেবি দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা। যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সমুদ্ধরেৎ শনৈঃ। স্পর্শ-দীক্ষো পদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥ স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ। দৃগ্ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি॥ যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ

পোষয়েৎ। বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ॥”
—হোমাদি বাহ্য ক্রিয়ার সাহায্য না লইয়াও যে দীক্ষা দান করা হয়, তাহা তিন প্রকার :—স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্ দীক্ষা ও মানসদীক্ষা॥ পক্ষী যেমন নিজের পাখার স্পর্শ দ্বারা তা দিয়া ডিম্বকোষ হইতে শাবক বাহির করিয়া ঐ স্পর্শ যোগেই শাবককে পোষণ করে, সেইরূপে শ্রীগুরু স্বীয় হস্তাদি দ্বারা শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া (সংসার-রূপ ডিম্বকোষ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিবার মানসে) যে দীক্ষা দেন, তাহাকে ‘স্পর্শদীক্ষা’ নামক উপদেশ বলে॥ মৎস্য যেমন ডিমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ডিম ফুটাইয়া পোনাকে ঐ দৃষ্টি দ্বারাই পোষণ করে, সেইরূপ শ্রীগুরু শিষ্যের প্রতি এক বিশিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দীক্ষা দেন, তাহাকে ‘দৃগ্‌দীক্ষা’ নামক উপদেশ বলে॥ কচ্ছপ যেমন নিজে জল মধ্যে থাকিয়া তীরস্থ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ডিম্ব-সমূহকে কেবলমাত্র মননরূপ চিন্তা দ্বারা ফুটায় এবং ঐ চিন্তা-যোগেই বাচ্চাকে পোষণ করে, সেইরূপ সদ্‌গুরু কেবল মাত্র ধ্যান অবলম্বন করিয়া যে দীক্ষা দেন, তাহাকে ‘মানস দীক্ষা’ বা ‘বেধদীক্ষা’ নামক উপদেশ বলে॥ বাহ্যদীক্ষার উপকরণ প্রধানতঃ ক্ষিতি ও জলে নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা স্থূল ব্যাপার। কিন্তু আন্তর দীক্ষার উপকরণ তেজঃ, বায়ু, আকাশ বা মনে গঠিত। তেজে ‘দৃষ্টি’, বায়ুতে ‘স্পর্শ’, আকাশে ‘শব্দ’ এবং মনে ‘ধ্যান’ উৎপন্ন হইয়া চক্ষু, হস্ত, মুখ ও মন দ্বারা এই দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাদের পর পর সূক্ষ্মতা হেতু দৃগ্‌দীক্ষা, স্পর্শ-

দীক্ষা, বাগ্‌দীক্ষা এবং মানসদীক্ষা ও ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্যাপার।

শক্তি-পাত-লক্ষণ

গুরুপরম্পরা আগত যে শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ পরম শৈবীশক্তি। শ্রীগুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যে ইহা সম্পাতিত হইলে, ইহা স্ফুট চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়; তখন ইহা 'আজ্ঞা' নাম ধারণ করে (কারণ ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করে, শিষ্যও সেইরূপ এই সম্পাতিত শক্তির আন্তর সঙ্কেতরূপ আজ্ঞা দ্বারাই সর্ব্বত্র কর্ম্ম করিতে থাকে)। এই গুরুশক্তি সম্পাতিত না হইলে তত্ত্বসমূহের স্বরূপ, ব্যাপ্তি এবং বিশুদ্ধির উপায় কেহই জানিতে সমর্থ হয় না। "শক্তিপাত-সমাযোগাদ্ ঋতে তত্ত্বানিতত্ত্বতঃ। তদ্ব্যাপ্তিস্তদ্ বিশুদ্ধিশ্চ জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে॥ শক্তি-রাজ্ঞা পরা শৈবী চিদ্রূপা পরমেশ্বরী॥" (শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায় পূর্ব্বভাগে)। বেধ দীক্ষা বা শাম্ভবী-দীক্ষা বা সিদ্ধযোগ লাভ হইলে শিষ্যের অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ পুলক-কম্পাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া শ্রীগুরু জানিয়া নেন যে, 'ঈশ্বরের শক্তি শিষ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছে' এবং ইহা বুঝিয়া তিনি দীক্ষার কৃতকার্য্যতায় নিশ্চিন্ত হন; এবং শিষ্যও এই সকল চিহ্ন দেখিয়া স্থিরনিশ্চয় ও বিশ্বাসবান্ হন যে, তাহার দীক্ষা ঠিক্ হইয়াছে, এবং সদ্‌গুরুর-কৃপা লাভ হইয়াছে। 'সিদ্ধশঙ্করতন্ত্রে' শক্তিপাতের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত

হইয়াছে,—"লক্ষণং শক্তি-পাতস্য প্রবোধা-নন্দ-সম্ভবং। সা যস্মাৎ পরমা শক্তিঃ প্রবোধা-নন্দ-রূপিণী। আনন্দ-বোধয়ো লিঙ্গম্ অন্তঃস্ফুরণ-বিক্রিয়া। যয়া স্যুঃ কম্প-রোমাঞ্চ স্বরনেত্রাদি বিক্রিয়াঃ" ॥—শক্তিপাতের চিহ্ন প্রবোধ ও আনন্দ; যেহেতু সেই পরমাশক্তি প্রবোধ ও আনন্দস্বরূপ। প্রবোধ ও আনন্দের চিহ্ন অন্তরে স্ফুরণরূপ বিক্রিয়া। ইহা দ্বারা কম্প, রোমাঞ্চ, এবং স্বর ও নেত্রাদি অঙ্গের বিক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি গুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হইলে, শিষ্য প্রবোধ ও আনন্দ লাভ করে; অর্থাৎ শিষ্য এক অপূর্ব্ব জ্ঞান ও নির্ব্বিষয় আনন্দ অনুভব করে। অর্থাৎ তখন শিষ্য বোঝে যে, তাহার দেহমধ্যে এক অপূর্ব্ব শক্তির 'প্রবোধ' অর্থাৎ জাগরণ হইয়াছে, এবং সে উহাতে বেশ আনন্দ পাইতেছে। শিষ্যের দেহমধ্যে তখন বিদ্যুতের স্ফুরণ, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠন, অন্তঃস্থ বায়ুর নানারূপ গমন, অন্তঃস্থ অঙ্গের কম্পন, গাত্রে সূচীর ফোঁড়ের ন্যায় বোধ, গা ঝিম্ ঝিম্ করা, পৃষ্ঠের মস্তকের বা অঙ্গের মধ্যে পিড়্ পিড়্ বা সিড়্ সিড়্ অনুভব, লোমকূপের ভিতর সামান্য সামান্য তাপযুক্ত স্পন্দন, ইত্যাদি প্রকারের অন্তঃস্ফুরণ প্রকাশ পাইতে থাকে। আর তাহার দেহের বাহিরে কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-বিক্রিয়া (অর্থাৎ মুখ নাক দিয়া নানা প্রকার শব্দ বাহির হওয়া) এবং নেত্রাদি-বিক্রিয়া (অর্থাৎ চক্ষু, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গের নানারূপ ভাবভঙ্গী ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া) প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ইহাতে সে খুব আনন্দ পায়, এবং এক অপূর্ব্ব শক্তির জাগরণ ('প্রবোধ') সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে।

বিশেষ অধিকারীর বিশেষ লক্ষণ

বিশেষ অধিকারীর বেধ-দীক্ষা লাভ হইলে উত্তমোত্তম বা স্বাভাবিক প্রাণায়াম বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই আরম্ভ হয়। 'লিঙ্গপুরাণে' ৮ম অধ্যায়ে চারিপ্রকার প্রাণায়াম কথনে উক্ত হইয়াছে—"আনন্দোদ্ভবযোগাদ্যং নিদ্রা ঘূর্ণা-স্তথৈব চ। রোমাঞ্চ ধ্বনিসংবিদ্ধস্বাঙ্গমোটনকম্পনম্॥ ভ্রমণং স্বেদজল্পাশ্রু সংবিন্মূর্চ্ছা ভবেদ্‌যদা। তদোত্তমোত্তমঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামঃ সুশোভনঃ॥" -যখন আনন্দ, উদ্ভব, যোগ, যোগ-নিদ্রা, ঘূর্ণি, রোমাঞ্চ, শব্দসহকারে অঙ্গ মোটন, কম্প, ভ্রমণ, স্বেদ, জল্প, অশ্রু ও জ্ঞান-প্রদ মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে সুশোভন 'উত্তমোত্তম' প্রাণায়াম বলে॥ সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত সাধকের লক্ষণগুলির সহিত এই প্রাণায়াম-চিহ্নগুলির সম্পূর্ণ মিল আছে। 'শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়' কথিত হইয়াছে—'উত্তমস্তু ত্রিরুদ্‌ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রকঃ পরঃ। স্বেদ-কম্পাদি-জনকঃ প্রাণায়াম স্তদুত্তরঃ॥ আনন্দোদ্ভব-রোমাঞ্চং নেত্রাশ্রূণাং বিমোচনম্। জল্প-ভ্রমণ-মূর্চ্ছাদ্যং জায়তে যোগিনঃ পরম্॥''—উত্তম প্রাণায়াম = ৩ উদ্‌ঘাত = ৩৬ মাত্রা (১ মাত্রা = ৪ সেকেণ্ড = ১ শ্বাস): এবং পরম প্রাণায়াম (উত্তমোত্তম প্রাণায়াম = চতুর্থ প্রাণায়াম) স্বেদ (ঘর্ম্ম), কম্প প্রভৃতি জনক; এই পরম প্রাণায়ামে যোগীর আনন্দ, উদ্ভব, রোমাঞ্চ, অশ্রুপতন, জল্প, ভ্রমণ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। (চতুর্থ প্রাণায়ামে মাত্রার নিয়ম নাই। এই সমস্ত গুণ দ্বারাই

উহাকে বুঝিতে হয়)। 'অগ্নি পুরাণে' প্রাণায়াম কথনে বর্ণিত হইয়াছে— 'স্বেদ-কম্পা-ভিঘাতানাং জননশ্চোত্তমোত্তমঃ।"— উত্তমোত্তম প্রাণায়ামে স্বেদ, কম্প ও অভিঘাত (হস্ত দ্বারা নিজ অঙ্গে আঘাত করা) হয়।

সিদ্ধযোগে প্রেমভক্তির স্বয়ং উদয় হয়

সিদ্ধযোগে দীক্ষিত সাধকের অন্তরে প্রেমভক্তি উদয় হইয়া থাকে। 'পদ্মপুরাণে' উত্তর খণ্ডে ১০১ অধ্যায়ে প্রেমভক্তির লক্ষণ বর্ণনে কথিত হইয়াছে—"প্রেম্না সংজাতয়া ভক্ত্যা তনুমুৎপুলকাঞ্চনম্। বিভর্ত্ত্যলৌকিকং ভক্তো বদেদ্ হসতি নৃত্যতি॥ পরমানন্দযুক্তোঽসৌ ক্বচিদ্ গায়তি নন্দতি। ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদ্গদেন পুনঃ পুনঃ॥"—প্রেমভক্তি জন্মিলে, ভক্তের শরীর রোমাঞ্চিত হয়; সে অলৌকিক কথা বলে; হাসে; নাচে; কখন পরম আনন্দযুক্ত হইয়া গান করে; কখন অচ্যুতভাবে বিভোর হইয়া গদগদ স্বরে পুনঃ পুনঃ কাঁদে॥ 'মেরুতন্ত্রে' প্রৌঢ়ান্ত উল্লাস বর্ণনে কথিত হইয়াছে—"এতচ্চক্রগতা ধীরা বিজ্ঞেয়াঃ পর যোগিনঃ। যেনাপ্নুবন্তি মনুজাঃ সাক্ষাদ্ ভৈরবরূপতাম্॥ সম্মোদঃ পরমানন্দঃ পতনং গায়নং তথা। বেণু-বীণাদিবাদ্যং চ কবিতারচনাদিকম্॥ রোদনং ভাষণং চৈব সমুত্থানং বিজৃম্ভণম্। গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগ ইত্যভিধীয়তে॥"— শ্রীচক্রনামক কুণ্ডলীচক্রস্থিত বীর সাধকেরা পরম যোগী। ইহার দ্বারা সাক্ষাৎ ভৈরব স্বরূপ লাভ হয়। সেই চক্রস্থিত

যোগীর নিম্নোক্ত প্রকারে যোগ প্রকাশ পায় ; যথা,—সম্মোদ, পরমানন্দ, ভূমিতে পতন, গান করা, বাঁশী বীণা প্রভৃতি বাদ্যের শব্দ স্বয়ং করা বা অন্তরে শুনা, কবিতা রচনাদি, কাঁদা, একাকী কথা বলা, আসন হইতে উঠা, হাইতোলা বা হাঁ করা, গমন, ইত্যাদি বিক্রিয়া॥ 'দেবীগীতায়' পরাভক্তি বর্ণনে পরমেশ্বরী বলিতেছেন—'মচ্ছাস্ত্র-শ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো। ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিত তনুঃ সদা।। প্রেমাশ্রুজল-পূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্‌গদনিস্বনঃ।···উচ্চৈ র্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি। অহঙ্কারাদি-রহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ।।"—অর্থাৎ দেবীর প্রতি পরাভক্তি জন্মিলে, দেবীসংক্রান্ত শাস্ত্র শ্রবণে এবং মন্ত্র তন্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। মন প্রেমে আকুল হয় ; শরীর রোমাঞ্চিত হয় ; চক্ষে জল পড়ে ; কণ্ঠে গদ্‌গদ স্বর হয় ; অহঙ্কারাদি নষ্ট হয় ; দেহে মমতা কমে ; এবং উচ্চস্বরে দেবীর নাম সমূহ গান করিতে করিতে ভক্ত নাচিতে থাকে। 'ভাগবতে' ১১৷৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ক্বচিদ্ রুদন্ত্য-চ্যুত-চিন্তয়া ক্বচিদ্ হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য লৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"—সমস্ত পাপ-নাশক হরিকে ভক্তগণ যখন স্বয়ং স্মরণ করিতে থাকে, অথবা পরস্পর স্মরণ করাইতে থাকে, তখন ভক্তি সম্যক্ জন্মিয়া, তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয় ; ভগবানের চিন্তায় তাহারা কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন আনন্দ করে, অলৌকিক ভাষা বলে, নাচে, গান করে, ভগবানের আচরণ

অনুকরণ করে, শেষে পরম ভাব লাভ করিয়া ঐ বাহ্য ব্যাপার হইতে নির্ম্মুক্ত হয় এবং চুপ করিয়া থাকে ॥ 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে' ১৩৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি, ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি। ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণ-মুদার হাহারুতিং, মহাপ্রণয়-সীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥'—মহাপ্রেমোদয়ে গৌরাঙ্গ হরি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন কখন মূর্চ্ছা যান' কখন গড়াগড়ি যান, কখন দৌড়াদৌড়ি করেন, কখন নাচেন, কখন দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলেন, কখন মহাশব্দ বা হাহা শব্দ উচ্চারণ করেন ॥ 'চৈতন্য ভাগবতে' কথিত হইয়াছে—"হরিবোল" বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে। চতুর্দ্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে ॥ ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন। একেবারে সর্ববভাব দিল দরশন ॥ অপূর্বব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ। ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥' 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আদি লীলায় বর্ণিত হইয়াছে—'প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজয়ে লোভ ॥ প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥ স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য। উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য হর্ষ, গর্বব, দৈন্য ॥ এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায় ॥' 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে' উক্ত হইয়াছে—'চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যতাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্ ॥ তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ।

বৈবর্ণ্য-মশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥'—চিত্ত সত্ত্বভাবাপন্ন হইতে থাকিলে. উহা উদার আত্মাকে প্রাণে সমর্পণ করে। প্রাণ তখন বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অত্যন্ত বিক্ষোভিত করে। তখন ভক্তদেহে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, (মুখাদিতে নানা শব্দ বিকাশ), দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন, অশ্রু ও প্রলয় (ভূমিতে পতনাদি-রূপ শরীরের ও মনের কর্ম্ম নিবৃত্তি, যেমন মূর্চ্ছা, নিদ্রা ইত্যাদি) —এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব বিকার প্রকাশ পায়॥

সিদ্ধযোগ, বেধ-দীক্ষা ও শাম্ভবী-দীক্ষা একই

শ্রীশ্রীগুরুদেব, কৃপাপূর্ব্বক নিজ সাধনশক্তি স্বাশ্রিত বিনীত ভক্তিমান শিষ্যে সঞ্চার দ্বারা শিষ্যের যোগশক্তির (কুণ্ডলিনী-শক্তির) উদ্বোধন করিলে পর, তাঁহার উপদিষ্ট মন্ত্র-জপ বা ধ্যান দ্বারাই যে স্বাভাবিক যোগ লাভ হয়, তাহাকে সিদ্ধযোগ বা মহাযোগ বা সিদ্ধিমার্গ বা সিদ্ধোপায় বলে। কুলার্ণব তন্ত্রে এইরূপে দীক্ষাদানকে 'বেধদীক্ষা' বলা হইয়াছে এবং উক্ততন্ত্রে. শিবপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠে ইহা 'শাম্ভবী দীক্ষা' নামে কথিত। অতএব সিদ্ধযোগ, বেধদীক্ষা ও শাম্ভবী দীক্ষা—এই তিনই এক, এবং ইহা শক্তি সঞ্চার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই দীক্ষা দ্বারাই শিষ্য ধন্য হইয়া যায়। "শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি। যত্রশক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে॥" (কুলার্ণবে)—গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইলেই শিষ্য অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। যে স্থলে শক্তি সঞ্চার হয় না, সে স্থলে আত্মজ্ঞানরূপ সিদ্ধিলাভ অসম্ভব অর্থাৎ গুরু-

শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া শিষ্যের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ না করিলে শিষ্য জ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারে না। সদ্‌গুরু-কৃপায় শক্তিসঞ্চার দ্বারা 'সিদ্ধযোগ' লাভ হইলে, একমাত্র গুরূপদিষ্ট মন্ত্র জপ বা ধ্যান দ্বারাই আন্তর প্রেরণায় আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান ইত্যাদি যোগাঙ্গ সকল অনায়াসে সাধিত হইতে থাকে, এইজন্য শিষ্যকে বিশেষ আয়াস স্বীকার বা চেষ্টা করিতে হয় না, অথবা গুরুর নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে এই সকল আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদির উপদেশ লইবার ও প্রয়োজন হয় না। এই পথে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক 'যোগ' * অর্থাৎ জীবব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যানুভূতি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

---

*"যোগস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো হ্যভাবঃ প্রথমো মতঃ। অপরস্তু মহাযোগঃ সর্ব্বযোগোত্তমোত্তমঃ॥ শূন্যং সর্ব্বনিরাভাসং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে। অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মানং প্রপশ্যতি॥ যত্র পশ্যতি চাত্মানং নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্। ময়ৈক্যং স 'মহাযোগো' ভাষিতঃ পরমঃ স্বয়ম্॥"—যোগ দুই প্রকার,—প্রথম 'অভাবযোগ' আর দ্বিতীয় সর্ব্বযোগ শ্রেষ্ঠ 'মহাযোগ'। যে যোগ-সাধনে বেদান্ত-কথিত সর্ব্বপ্রকারে নিরাভাস স্বরূপের ধ্যান করা হয় অর্থাৎ আত্মাকে মহাশূন্য বা গুণাতীত নিশ্চয় করিয়া নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা-সাক্ষাৎকার করিতে হয়, তাহাকে 'অভাবযোগ' বলে; এবং যে যোগ-পথে যোগীজন আত্মাকে নিত্যানন্দস্বরূপ নিরঞ্জনরূপে ধ্যান দ্বারা দর্শন করেন, এবং সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন, তাহাই দ্বিতীয় পরম শ্রেষ্ঠ 'মহাযোগ' শ্রীশ্রীমহাদেব স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন॥

"নানামার্গৈস্তু দুষ্প্রাপ্যং কৈবল্যং পরমং পদম্। সিদ্ধিমার্গেণ লভতে নান্যথা পদ্মসম্ভব॥" (যোগশিখোপনিষৎ, ১)—শ্রীশ্রীমহাদেব, ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে পদ্মসম্ভব! কৈবল্যরূপ পরমপদ লাভের নানা উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল উপায় দ্বারা তাহা লাভ করা সহজ সাধ্য নহে; একমাত্র সিদ্ধিমার্গ দ্বারাই কৈবল্যপদ সহজে লাভ করা যায়, অন্য প্রকারে নহে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন্ত্র-চৈতন্য-লক্ষণ

যোগশিখোপনিষদে বৈধ দীক্ষা লাভের চিহ্ন কেবল 'কম্পানুভূতি'ই বর্ণিত হইয়াছে। 'যদানুধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽথ জায়তে,'—গুরূপদিষ্ট চৈতন্যপূটিত মন্ত্র ধ্যান বা জপ করিলেই শরীরের অন্তরে ও বাহিরে কম্প উপস্থিত হয়॥

"হে বৎস! এইরূপ অনুভূতিমুলক যে সাধনা, তাহাই সাধককে ক্রমশঃ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করাইতে থাকে। সাধনা করিতেছি, অথচ কোন (আন্তর বা বাহ্য) অনুভব নাই, এমন অবস্থায় সাধনা করিতে সাধকের তীব্র উৎসাহ কি ভাবে হইতে পারে? কাজেই দেখা যায় যে, অনেকে প্রথম অবস্থায় তীব্র উৎসাহের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, অনুভূতির অভাবে কিছুকাল পরে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে, এবং সাধনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া থাকে। দেখ বৎস! যেমন কেহ তোমাকে বলিল, এই সরোবরে মৎস্য আছে. তুমি ছিপ ফেল, মাছ পাইবে। তুমি, তদনুসারে প্রত্যহ ছিপ ফেলিতে থাকিলে। এইরূপে ১১।১২ দিন চলিয়া গেল, কিন্তু কোন মৎস্যের সাড়াও পাইলে না। তখন আর ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? মৎস্য ধরিতে না পারিলেও যদি সামান্যভাবে সাড়াও

পাওয়া যায়, তখন মনে বিশ্বাস আসে যে, ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বসিয়া থাকিলে একদিন না একদিন মৎস্য ধরিতে সমর্থ হইবই। তদ্রূপ সাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম, অথচ কোনও অনুভূতি নাই, এমতাবস্থায় ধৈর্য্য ধরিয়া সাধনা করিতে ভাল লাগে কি ? বাস্তবিক অনুভূতিমূলক সাধনা না হইলে সাধক কখনও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—'যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈ-রবগত-মর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থ-প্রতিপাদন-সামর্থ্যাৎ, তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি, তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধি-মুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থ-মেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈক প্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ-অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে।' আগম, অনুমান ও গুরুবাক্যাদিরূপ প্রমাণ হইতে যে সকল বস্তুতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সে সকলের যথার্থতা সম্বন্ধে যদিও কোন সংশয় নাই, কারণ ইহারা বস্তুত যথার্থ স্বরূপই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তথাপি উক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে অবগত বিষয় সমূহের কোন এক অংশ যে পর্যান্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান গোচর না হয়, তাবৎ সে সকলই পরোক্ষ বিষয় বলিয়া উহা হইতে অপবর্গাদি (মোক্ষাদি) সূক্ষ্ম বিষয় সমূহে নিঃসংশয়া বুদ্ধি (বা শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হয় না। অতএব আগম, অনুমান ও গুরুবাক্যাদি প্রমাণ হইতে অবগত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করার নিমিত্ত উক্ত বিষয়ের কোন এক অংশ প্রথমতঃ

প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। এই প্রকারে উপদিষ্ট বিষয়ের কোন একাংশও প্রত্যক্ষ হইলেই মোক্ষাদি অতি সূক্ষ্ম বিষয় সমূহেও উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

"হে বৎস! গুরুবাক্য, শাস্ত্রপ্রমাণ এবং নিজ অনুভূতি—এই তিনটি যদি এক হয়, তবে তত্ত্ব সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এইরূপ নিশ্চিত অনুভূতিমূলক জ্ঞান সাহায্যেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ;—এইরূপ অনুভূতিমূলক অভ্যাস দ্বারাই সাধক যথাসময়ে সত্যস্বরূপ আত্মাকে অপরোক্ষ ভাবে (প্রত্যক্ষরূপে) অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তথা হি—"স্বানুভূতেশ্চ শাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা। যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সততং চাবলোক্যতে॥" (মহোপনিষৎ) (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ স্বামীজী মহারাজ লিখিত 'সিদ্ধযোগ' হইতে উদ্ধৃত)।

"মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা"। (গৌতমীয়তন্ত্রম্) —যিনি 'মন্ত্রচৈতন্য' করিতে সমর্থ, তিনিই গুরু, ইহা স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন॥ কুণ্ডলিনী জাগরণ এবং মন্ত্রচৈতন্য একই কথা। মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ শাস্ত্র সমূহে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

১। কুলার্ণবে, বৃহন্নীলতন্ত্রে, গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ও মন্ত্রযোগ সংহিতায়—'হৃৎকম্পো গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ব-বর্দ্ধনম্। আনন্দা-

শ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি। গদগদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়॥ সকৃদুচ্চরিত্যেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে। দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্য তদুচ্যতে॥' চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে, সহসা নিম্নোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ;—হৃৎকম্প, ব্রহ্মগ্রন্থ্যাদিভেদ, বায়ুদ্বারা সর্ব্বাঙ্গের স্ফীতি, আনন্দ, অশ্রু, পুলক, দেহে দেবতার আবেশ ও গদ্‌গদ উক্তি। এই সকল প্রত্যয় দেখিলে পর তাহাকে 'পারম্পর্য্য' বলে॥ 'পাশচ্ছেদ-করাদ্দেবি রঞ্জনাৎ পরমতেজম্ যতিভি শ্চিন্ত্য-মানত্বাৎ 'পারম্পর্য্য'—মিতীরিতম্॥' (কুলার্ণবে)—যাহাতে পাশচ্ছেদ হয়, পরমতেজের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া হয়, এবং ধ্যানের বিষয়লাভ হয়, তাহাকে 'পারম্পার্য্য বলে॥ 'ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥' (কুলার্ণবে)॥' চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি মায়া-কর্ম্ম-গুণা অমী। বিষয়া ইতি কথ্যন্তে পাশা জীবনিবন্ধনাঃ॥' (শিবপুরাণে)।

২। বৃহন্নীলতন্ত্রে ও নীলতন্ত্রে—'শৃণুদেবি পরংজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমোত্তমম্। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ক্ষিপ্রং বিদ্যা প্রসিধ্যতি॥ মূলকন্দে চ যা শক্তিভুজগাকাররূপিণী। তদ্ভ্রমাবর্ত্তবাতো যঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ঝিঞ্জীবা-ব্যক্তমধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা। গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে তু প্রবিশন্তী স্বকেতনে॥ যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যাৎ মনোলয়ম্ তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা॥ তমঃপূর্ণ-গৃহে যদ্বৎ ন

কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে। শিখাহীনা স্তথা মন্ত্রা ন সিধ্যান্তি কদাচন ॥'
—হে দেবি, শুন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতেছি। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেই শীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মূলাধারে যে সর্পাকারে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে, তাহার ভ্রমণ জন্য প্রাণ ঘূর্ণি বায়ুতে পরিণত হয়। ঐ শক্তি ঝিঁ ঝিঁ পোকার ন্যায় 'ঝিন্ ঝিন্ চিন্ চিন্' ইত্যাদি অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতে করিতে সতত উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে যায়, পুনরায় তথা হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া মূলাধারে প্রবেশ করে। এই যাতায়াতে মন লীন হইলে, মন্ত্রশিখা (মন্ত্রের অগ্নিজ্বালাবৎ প্রকাশিকা শক্তি) জন্মে। উহা সমস্ত মন্ত্রকে প্রদীপিত (চৈতন্য) করে। অন্ধকারময় ঘরে যেমন কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ শিখাহীন মন্ত্রে কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না।

৩। মন্ত্রমহোদধি—'মনঃ-প্রসাদঃ সন্তোষঃ শ্রবণং দুন্দুভি-ধ্বনেঃ। গীতস্য তালশব্দস্য গন্ধর্ব্বাণাং সমীক্ষণম্ ॥ স্বতেজসঃ সূর্য্যসাম্যেক্ষণং নিদ্রা ক্ষুধাজপঃ। রম্যতা-রোগ্য-গাম্ভীর্য্য-মভাবঃ ক্রোধলোভয়োঃ ॥ এবমাদীনি চিহ্নানি যদা পশ্যতি মন্ত্রবিৎ। সিদ্ধিং মন্ত্রস্য জানীয়াৎ দেবতায়াঃ প্রসন্নতাম্ ॥ ততো জপেঽ-ধিকং যত্নং প্রকুর্য্যাদ্ জ্ঞানলব্ধয়ে। লব্ধজ্ঞানঃ কৃতার্থঃ স্যাৎ সংসারাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥' —মনের প্রসন্নতা, সন্তোষ, দুম্ দুম্ শব্দ, গান বা করতালাদি কাংস্য বাদ্যের শব্দ শ্রবণ, গন্ধর্ব্ব (সুন্দর পুরুষ ও স্ত্রীলোক) দর্শন, নিদ্রা, ক্ষুধা, জপ, রম্যতা, আরোগ্য, গাম্ভীর্য্য, ক্রোধহীনতা, লোভহীনতা ইত্যাদি চিহ্ন মন্ত্র-

জপকারী দেখিতে পাইলে, মন্ত্রের সিদ্ধি ও দেবতার প্রসন্নতা লাভ হইয়াছে জানা যায়। তৎপর জ্ঞানলাভের জন্য মন্ত্রজপে অধিক যত্ন করিতে হয়। জ্ঞান লাভ হইলেই কৃতার্থতা ও সংসারমুক্তি হয়।

৪। মাতৃকাভেদ তন্ত্রে—"গুরুবক্ত্রাৎ মহামন্ত্রং লভতে সাধকোত্তমঃ। যদ্দেবো জায়তে বীজ স্তস্য মূর্ত্তির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ দেবতায়াঃ শরীরং তু বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে। গুরো-রাজ্ঞানুসারেণ চান্যমূর্ত্তিশ্চ জায়তে॥"—শ্রীগুরুমুখে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিলে, মন্ত্রের যে দেবতা নির্দ্দিষ্ট, তাঁহার মূর্ত্তি নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। বীজ (মন্ত্র) হইতে দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। শ্রীগুরুর আদেশ থাকিলে, ঐ বীজ হইতে অন্য দেবতার মূর্ত্তিও প্রকাশ পাইতে পারে॥

৫। যোগশিখোপনিষদি —"আত্মমন্ত্র-সদাভ্যাসাৎ পরতত্ত্বং প্রকাশতে। তদভিব্যাক্তিচিহ্নানি সিদ্ধিদ্বারানি মে শৃণু॥ দীপ-জ্বালেন্দু-খদ্যোত-বিদ্যুন্নক্ষত্র-ভাস্বরাঃ। দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেণ সদা যুক্তস্য যোগিনঃ॥"—শ্রীগুরুশক্তিপূটিত মন্ত্র সদা অভ্যাস করিলে, পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তাহার অভিব্যক্তির চিহ্ন শুন। ইহারা সিদ্ধি লাভের উপায়। তখন যোগীরা অন্তরে সূক্ষ্মরূপে দীপ, অগ্নি, চন্দ্র, জোনাকি পোকা, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র বা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ দেখিতে পান॥

৬। শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে—"আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মন্ত্রচৈতন্য-মুত্তমম্ ॥" —আনন্দ, অশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহে দেবতার আবেশ, এই সকল, হে দেবি, উত্তম মন্ত্রচৈতন্যের চিহ্ন ॥

৭। 'গৌতমীয় তন্ত্রে' মধ্যম মন্ত্রসিদ্ধি লক্ষণ কথনে উক্ত হইয়াছে—'বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা। অষ্টাঙ্গযোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছা পরিবর্জ্জনম্ ॥ সর্ব্বভূতেষনুকম্পা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণোদয়ঃ। ইত্যাদি গুণসম্পত্তি মধ্য সিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ॥'—বৈরাগ্য, মুক্তির ইচ্ছা, ত্যাগভাব, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠান, ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ, সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া, সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণ, ইত্যাদি মধ্যম মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ ॥

৮। 'রুদ্রযামলে' ২৮ পটলে মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ কথনে বর্ণিত হইয়াছে —'যোগাক্লেশবিবর্দ্ধনম্।' 'মুক্তিক্রিয়া সংযুতা সদাসি কীর্ত্তিভ্রংশাদি ভক্তিঃ।' 'দেবানামতি-ভক্তি-যুক্ত-হৃদয়ম্।' 'সর্ব্বক্রিয়া-দক্ষতা।' 'ভোগেচ্ছা-রহিতম্।' 'বিরক্তহৃদয়ম্।' বৈরাগ্যমূর্ত্তি-প্রিয়ম্।' 'হরিহর-ব্রহ্মৈক-ভাবান্বিতম্।' 'নিরন্তর শিবানন্দৈকমুদ্রাধরম্।' 'লোকানাং গুরুতা।' —যোগসাধনে ক্লেশহীনতা বৃদ্ধি; লোকসমাজে কীর্ত্তিভ্রংশ হইলেও মুক্তির জন্য ক্রিয়াসংযুক্ত ভক্তি বর্ত্তমান থাকা; দেবতার প্রতি অতিশয় ভক্তি; সমস্ত কর্ম্মে দক্ষতা; ভোগেচ্ছা-রাহিত্য; বৈরাগ্য; বৈরাগ্যবান্‌কে ভালবাসা; হরি, শিব ও ব্রহ্মাতে অভিন্ন ভাব; সর্ব্বদা ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত থাকা; লোকের গুরু হওয়া ॥

৯। 'গন্ধর্ব্বতন্ত্রে' উত্তম মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ কথনে উক্ত হইয়াছে —'সমতা সর্ব্বভূতেষু মানাপমানয়োঃ সমঃ। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ব্রহ্মচিন্তোদ্ভবানন্দনিবৃত্তবাহ্যচিন্ততা। সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র সমত্বং নির্ব্বিকারতা॥ চক্ষুষো-রনিমেষত্বং মধুরস্মিতভাষণম্। অমৃতস্য গুণা এতে, কথিতা ভুবি দুর্ল্লভাঃ॥' সর্ব্বভূতে সমতা; মানে ও অপমানে, শত্রুতে ও মিত্রে, লোষ্ট্র পাষাণ ও স্বর্ণে সমজ্ঞান; ব্রহ্মচিন্তায় আনন্দ অনুভব; বাহ্যচিন্তা নিবৃত্তি; সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সমতা ও নির্ব্বিকার ভাব; চক্ষুর অনিমেষভাব; এবং মধুর ভাবে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলা; এই সকল অমৃতত্ব লাভের গুণ॥

**

তৃতীয় অধ্যায়

'কুণ্ডলিনী-জাগরণ'-এর বিবিধ অনুভব

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মন্ত্রচৈতন্য ও কুণ্ডলিনী জাগরণ একই কথা। গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া কুণ্ডলিনী জাগরণ হইলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়; যাহার মন্ত্রচৈতন্য হইয়াছে, তাহার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়। সত্ত্ব-রজ-তমঃ-গুণ প্রসবিনী (১) ত্রিগুণময়ী (২) অব্যক্তা কুণ্ডলিনী পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। তখন সাধক পরম আনন্দ অনুভব করে। কুণ্ডলিনী ক্ষিতিতত্ত্ব আশ্রয় করিলে সাধকের স্তম্ভভাব, শরীরে ভারীবোধ, শরীরের দৃঢ়তা, পুষ্পাদির সুগন্ধপ্রাপ্তি, দৃঢ় সঙ্কল্পের উদয়, ইত্যাদি হইতে থাকে; (৩) জলতত্ত্ব আশ্রয় করিলে, সাধকের শরীরে ঠাণ্ডাবোধ, দেহের কোমলতা, জিহ্বাতে মিষ্টাদি আস্বাদ বোধ, মনের মৃদুভাব, ইত্যাদি হইয়া থাকে; তেজস্তত্ত্ব আশ্রয় করিলে, সাধকের—শরীরে গরম বোধ, নানারূপ জ্যোতিঃ-দর্শন, মনের উগ্রভাব, ইত্যাদি হয়; বায়ুতত্ত্ব আশ্রয় করিলে, সাধকের নানাকার প্রাণায়ামের ক্রিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন, স্পন্দন অনুভব, মনের চঞ্চলতা, ইত্যাদি হইতে থাকে; এবং আকাশ-তত্ত্ব আশ্রয় করিলে, সাধকের মুখে নানা মন্ত্র ও শব্দের বিকাশ, অন্তরে

নানা শব্দ শ্রবণ, যোগনিদ্রা, মনের শূন্য বা শান্ত ভাব, ইত্যাদি হয়। (৪)

যোগচূড়ামণি ও ধ্যানবিন্দু উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'প্রবুদ্ধা বহ্নি-যোগেন মনসা মরুতা সহ। সূচীবদ্ গাত্রমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধং সুষুম্নয়া ॥'—যেমন সূচী বস্ত্র ফোড়্ দিতে দিতে অগ্রসর হয়, সেই-রূপ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া অগ্নি, মন ও বায়ুসহ সুষুম্না মার্গযোগে উপরে উঠিতে থাকে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগমনে গায়ে বা পিঠে সূচীর ফোড়ের ন্যায় স্পন্দন অনুভব হয় ॥

কুণ্ডলিনীর ধ্যান-কথনে 'দেবীগীতা' ১০ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—'প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে, প্রতিপ্রয়াণেঽপ্য-মৃতা-য়মানাম্। অন্তঃপদব্যা মনুসঞ্চরন্তীম্, আনন্দরূপা-মবলাং প্রপদ্যে ॥' —কুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে উঠিবার কালে প্রকাশ (তেজঃ) স্বরূপে দেহকে তপ্ত করিতেছে, আবার মূলাধারে নামিবার সময়ে অমৃত (জল) স্বরূপে দেহকে শীতল করিতেছে, এবং বায়ুরূপে অন্তরে সঞ্চরণ করিতেছে; সেই আনন্দস্বরূপা শক্তিকে আমি আশ্রয় করি ॥

নিম্নলিখিত শাস্ত্রসমূহে নিম্নলিখিত প্রকারে কুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন সূচিত হইয়াছে।—(যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে)—'বোধংগতে চক্রিণি নাভিমধ্যে, প্রাণাস্তু সংভূয় কলেবরেঽস্মিন্। চরন্তি সর্ব্বে সহ

(১) 'সত্ত্বং রজ-স্তমশ্চেতি গুণত্রয়-প্রসূতিকা'।—ইতি কুণ্ডলীবর্ণনে শিবসংহিতা।

বহ্নিনৈব, যথা পটে তন্তুগতিস্তথৈব ॥'—নাভিমধ্যে চক্রস্থ জীব-শক্তি (কুণ্ডলিনী) জাগিলে, অগ্নির সহিত সমস্ত প্রাণবায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে, যেমন বস্ত্রের প্রতি অংশে সূত্র থাকে, তদ্রূপ প্রাণবায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণশীল হয় (এবং তৎফলে শরীর স্ফীত, কম্পিত ও উষ্ণ হয়) ।

যোগবাশিষ্ঠে নিঃ পূঃ ৮ সর্গে—'যথা কুণ্ডলিনী দেহে স্ফুরত্যব্জ ইবালিনী, তথা সংবিদুদেত্যন্ত মৃ'দুস্পার্শবশোদয়া ॥ যথা সংবিদু-দেত্যুচ্চৈ স্তথা কুণ্ডলিনী জবাৎ ॥'—পদ্মের উপর ভ্রমর যেমন মৃদুভাবে বিচরণ করে, সেইরূপ কুণ্ডলিনী মৃদুভাবে দেহে বিচরণ

(২) 'শক্তিঃ কুণ্ডলিনী গুণত্রয়-বপুঃ । সারদাতিলকে কুণ্ডলিনী বর্ণনে ।

(৪) যোগবাশিষ্ঠে নিঃ পূঃ ৮০ সর্গে—'যদা প্রাণানিলো যাতি হৃদি কুণ্ডলিনী-পদম্ । তদা সংবিদুদেত্যন্ত-ভূ'ততন্মাত্র-বীজভূঃ ॥'—যখন প্রাণবায়ু হৃদয়ে কুণ্ডলী পদ প্রাপ্ত হয়, তখন অন্তরে পঞ্চভূতের প্রকাশক প্রত্যয় প্রকাশ পায় ॥

'সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বং চিৎসংবিদ্ বিদ্যতেঽনঘ । কিন্তস্যা ভূততন্মাত্র-বশাদভ্যুদয়ঃ ক্বচিৎ ।' সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলরূপে চিৎসংবিৎ (অব্যক্ত ভাবে) বিদ্যমান আছে। কিন্তু কখন কখন সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া ইহা (ব্যক্তভাবে) প্রকাশ পায়।

'কেবলং পঞ্চকবশাদ্ দেহাদৌ চেতনাভিধা ॥'—চিৎসংবিৎ কেবল পঞ্চভূতের আশ্রয়েই দেহে চেতনা নামে অভিহিত হয় ॥

(৩) 'পৃথ্বীংধারয়-মাণস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে। আত্মানং মন্যতে পৃথ্বীং পৃথ্ব্যা গন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ॥' (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে)—জীবাত্মা পৃথ্বীতত্ত্বকে ধারণ করিলে, সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্ব প্রকাশ পায়। তখন যোগী নিজেকে পৃথ্বীর ন্যায় ভারী ও দৃঢ় মনে করে ; এবং গন্ধ প্রবর্ত্তিত হয় ॥

করিলে, অন্তরে মৃত্যুস্পর্শ অনুভব হয়। কুণ্ডলিনী বেগে ভ্রমণ করিলে, প্রখর স্পর্শ স্পন্দনাদি অনুভব হয়॥

সারদাতিলকে—'চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ। তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্। বর্ণাত্মনা-বির্ভবতি গদ্যপদ্যাদি ভেদতঃ॥' —সর্ববভূতের চৈতন্যকে শব্দব্রহ্ম বলে। সে প্রাণিসমূহের দেহমধ্যে কুণ্ডলিনী স্বরূপ লাভ করিয়া অকারাদি বর্ণরূপে গদ্যপদ্যাদি ভেদে প্রকাশিত হয়॥

যোগশিখোপনিষদি—'তস্যামুৎপদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদি-বাঙ্কুরঃ।' —কুণ্ডলিনী হইতে নাদ উৎপন্ন হয়, যেমন সূক্ষ্ম বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে॥ 'যস্মাৎ নাদঃ প্রবর্ত্ততে।' (বরাহোপনিষদি)।

নীলতন্ত্রে—'ঝিঞ্চী বা ব্যক্ত মধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা।'—কুণ্ডলিনী জাগিয়া উর্দ্ধে উঠিবারকালে অবর্ণনীয় মধুর শব্দ করিতে থাকে এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত চিন্ চিন্ ঝিন্ ঝিন্ শব্দ হয়॥

ষট্চক্র নিরূপণে—'কূজন্তী কুণ্ডকুণ্ডলীব মধুরং মত্তালি-মালা-স্ফুটম্।' —কুণ্ডলিনী উর্দ্ধে উঠিবার সময়ে মধুমত্ত মৌমাছির মত মধুর গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়॥

'হঠদীপিকায়—'ব্রহ্মগ্রন্থের্ভবেদ্‌ভেদো হ্যানন্দঃ শূন্যসম্ভবঃ-বিচিত্র-ঘোষ-সংযুক্তেহনাহতঃ শ্রূয়তে ধ্বনিঃ॥'—নাভিস্থ ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ হইলে, নির্ব্বিষয় আনন্দানুভব হইতে থাকে এবং বিচিত্র-শব্দময় অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

'বিষ্ণুগ্রন্থে স্ততো ভেদাৎ পরমানন্দ-সম্ভবঃ। অতিশূন্যে বিমর্দ্দশ্চ ভেড়ীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥'—বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদ হইলে পরম আনন্দ লাভ হয় এবং হৃদয়াকাশে মড়্ মড়্ শব্দ ও তুম্ তুম্ শব্দ শুনা যায়।

'রুদ্রগ্রন্থিং যদা ভিত্ত্বা শর্ব্বপীঠগতেঽনিলঃ। নিষ্পত্তৌ বৈণবঃ শব্দঃ ক্বণদ-বীণা-ক্বণো ভবেৎ ॥'—রুদ্রগ্রন্থিভেদের পর প্রাণ মস্তকে গেলে, বাঁশীর ও বীণার শব্দ শ্রুত হয় ॥ (১)

"শুদ্ধ সুষুম্নাসরণৌ স্ফুটমমলং শ্রূয়তে নাদঃ।' সুষুম্নাপথ পরিষ্কার হইলে, স্পষ্ট নির্ম্মল শব্দ শোনা যায়।

জাবালদর্শনোপনিষদি—'ব্রহ্মরন্ধ্রং গতে বায়ৌ নাদশ্চোৎ-পদ্যতেঽনঘ। শঙ্খধ্বনি-নিভশ্চাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা ॥ শিরো-মধ্যেগতে বায়ৌ গিরিপ্রস্রবণং যথা ॥'—ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ গেলে শঙ্খের ও মেঘের ধ্বনি শ্রুত হয়; এবং মস্তকে প্রাণবায়ু গেলে পর্ব্বতস্থ ঝরণার জলপতন শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ॥

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়—'সৈব কুণ্ডলিনী মায়া শুদ্ধাধ্ব-পরমা সতী। সা বিভাগ-স্বরূপৈব ষড়ধ্বাত্মা বিজৃম্ভতে। তত্র শব্দা স্ত্রয়োঽধ্বানস্ত্রয়শ্চার্থাঃ সমীরিতা ॥'

---

(১) 'সুপ্তা গুরু-প্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী। তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥' (গ্রহযামলে)—শ্রীগুরু-কৃপায় যখন নিদ্রিতা কুণ্ডলী জাগরিতা হয়, তখন সমস্ত পদ্ম ও গ্রন্থি ভেদ হয় ॥

করিলে, অন্তরে মৃদু স্পর্শ অনুভব হয়। কুণ্ডলিনী বেগে ভ্রমণ করিলে, প্রখর স্পর্শ স্পন্দনাদি অনুভব হয়।।

সারদাতিলকে—'চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ। তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্। বর্ণাত্মনা-বির্ভবতি গদ্যপদ্যাদি ভেদতঃ।।'—সর্ব্বভূতের চৈতন্যকে শব্দব্রহ্ম বলে। সে প্রাণিসমূহের দেহমধ্যে কুণ্ডলিনী স্বরূপ লাভ করিয়া অকারাদি বর্ণরূপে গদ্যপদ্যাদি ভেদে প্রকাশিত হয়।।

যোগশিখোপনিষদি—'তস্যামুৎপদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদি-বাঙ্কুরঃ।' —কুণ্ডলিনী হইতে নাদ উৎপন্ন হয়, যেমন সূক্ষ্ম বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে।। 'যস্মাৎ নাদঃ প্রবর্ত্ততে।' (বরাহোপনিষদি)।

নীলতন্ত্রে—'ঝিঞ্ঝী বা ব্যক্ত মধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা।'—কুণ্ডলিনী জাগিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবারকালে অবর্ণনীয় মধুর শব্দ করিতে থাকে এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত চিন্ চিন্ ঝিন্ ঝিন্ শব্দ হয়।।

ষট্চক্র নিরূপণে—'কূজন্তী কুণ্ডকুণ্ডলীব মধুরং মত্তালি-মালা-স্ফুটম্।' —কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধে উঠিবার সময়ে মধুমত্ত মৌমাছির মত মধুর গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়।।

'হঠদীপিকায়—'ব্রহ্মগ্রন্থের্ভবেদ্‌ভেদো হ্যানন্দঃ শূন্যসম্ভবঃ-বিচিত্র-ঘোষ-সংযুক্তোঽনাহতঃ শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।।'—নাভিস্থ ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ হইলে, নির্ব্বিষয় আনন্দানুভব হইতে থাকে এবং বিচিত্র-শব্দময় অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

'বিষ্ণুগ্রন্থে স্ততো ভেদাৎ পরমানন্দ-সম্ভবঃ। অতিশূন্যে বিমর্দ্দশ্চ ভেড়ীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥'—বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদ হইলে পরম আনন্দ লাভ হয় এবং হৃদয়াকাশে মড়্ মড়্ শব্দ ও ভুম্ ভুম্ শব্দ শুনা যায়।

'রুদ্রগ্রন্থিং যদা ভিত্ত্বা শর্ব্বপীঠগতেঽনিলঃ। নিষ্পত্তৌ বৈণবঃ শব্দঃ ক্বণদ-বীণা-ক্বণো ভবেৎ ॥'—রুদ্রগ্রন্থিভেদের পর প্রাণ মস্তকে গেলে, বাঁশীর ও বীণার শব্দ শ্রুত হয় ॥ (১)

"শুদ্ধ সুষুম্নাসরণৌ স্ফুটমমলং শ্রূয়তে নাদঃ।' সুষুম্নাপথ পরিষ্কার হইলে, স্পষ্ট নির্ম্মল শব্দ শোনা যায়।

জাবালদর্শনোপনিষদি—'ব্রহ্মরন্ধ্রং গতে বায়ৌ নাদশ্চোৎপদ্যতেঽনঘ। শঙ্খধ্বনি-নিভশ্চাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা ॥ শিরোমধ্যেগতে বায়ৌ গিরিপ্রস্রবণং যথা ॥'—ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ গেলে শঙ্খের ও মেঘের ধ্বনি শ্রুত হয়; এবং মস্তকে প্রাণবায়ু গেলে পর্ব্বতস্থ ঝরণার জলপতন শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ॥

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়—'সৈব কুণ্ডলিনী মায়া শুদ্ধাধ্ব-পরমা সতী। সা বিভাগ-স্বরূপৈব ষড়ধ্বাত্মা বিজৃম্ভতে। তত্র শব্দা স্ত্রয়োঽধ্বানস্ত্রয়শ্চার্থাঃ সমীরিতা ॥'

---

(১) 'সুপ্তা গুরু-প্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী। তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥' (গ্রহযামলে)—শ্রীগুরু-কৃপায় যখন নিদ্রিতা কুণ্ডলী জাগরিতা হয়, তখন সমস্ত পদ্ম ও গ্রন্থি ভেদ হয় ॥

—সৎস্বরূপিণী শুদ্ধা মায়া কুণ্ডলিনী অত্যুত্তমরূপধারিণী। কুণ্ডলী বর্ণ, পদ মন্ত্র এই তিন শব্দরূপে, এবং ভুবন (মূলাধারাদি উন্মনী পর্য্যন্ত ৬০ অবস্থা), তত্ত্ব (ক্ষিত্যাদি ২৬ তত্ত্বের জ্ঞান) ও কলা (বিদ্যাশক্তি প্রভৃতি) এই তিন অর্থ-রূপে, মোট ছয়রূপে প্রকাশ পায়॥

সারদাতিলকে—'গুণিতা সর্ব্বগাত্রেষু কুণ্ডলী পরদেবতা। বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ॥ একধাগুণিতা শক্তিঃ সর্ব্ববিশ্বপ্রবর্ত্তিনী। বেদাদিবীজঃ শ্রীবীজং শক্তিবীজং মনোভবম্। প্রাসাদং তুম্বুরং পিণ্ডা চিন্তারত্নং গণেশ্বরম্। মার্ত্তণ্ডং ভৈরবং দৌর্গং নারসিংহং বরাহজম্॥ বাসুদেবং হয়গ্রীবং বীজং শ্রীপুরুষো-ত্তমম্। অন্যান্যপি চ বীজানি তদোৎপাদয়তি ধ্রুবম্॥'—পরমদেবতা কুণ্ডলিনী সর্ব্বপ্রকারে জাগরিত হইয়া সর্ব্বগাত্রে ব্যাপ্ত হইলে, সে মন্ত্রময় জগৎ উৎপাদন করে। ঐ শক্তি একধা (যেমন সুষুম্নায়) ব্যাপ্ত হইয়া ওঁ, শ্রীং, হ্রীং, ক্লীং, হৌং এবং তুম্বুর, গণেশ, সূর্য্য, প্রভৃতির বীজমন্ত্র নিশ্চয়ই উৎপাদন করে। (কারণ সমস্ত মন্ত্রই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মকে প্রকাশ করে)।

গৌতমীয় তন্ত্রে—"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্র-তন্ত্রা-র্চ্চনাদিকম্॥ জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদ-মায়ান্তি মন্ত্র-তন্ত্রা-র্চ্চনাদয়ঃ॥"—যাবৎ কুণ্ডলিনী মূলাধার কমলে নিদ্রিতা

থাকে, তাবৎ মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ ও পূজাদি সুফল হয় না ; বহু পুণ্যফলে যদি কুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়, তবে মন্ত্রজপ শাস্ত্রপাঠ ও পূজাদি প্রসন্নতা লাভ করে অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্যে আনন্দ, উহাদের তত্ত্ববোধ, সুফল প্রভৃতি হয়।।

বৃহন্নীলতন্ত্রে—"জ্যোতীরূপা চ কুণ্ডলী।" অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জ্যোতিঃ স্বরূপিণী অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণ হইলে নানাপ্রকার জ্যোতিঃ দর্শন হয়।

সূর্য্যগীতায়—"যদা কুণ্ডলিনী শক্তিরাবির্ভবতি সাধক। তদা স পঞ্চকোষে মত্তেজোঽনুভবতি ধ্রুবম্।" —সাধকের মধ্যে যখন কুণ্ডলিনী শক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সে দেহের মধ্যে নিশ্চয়ই সূর্য্যের তেজঃ অনুভব করে।।

যোগকুণ্ডলী উপনিষৎ—"সুষুম্নাবিবরে শীঘ্রং বিদ্যুল্লেখেব শুংস্ফুরেৎ।"—সুষুম্নার মধ্যে কুণ্ডলিনী বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়।।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ৪র্থ অধ্যায়ে—"যোগকালে হ্যপানেন প্রবোধং যাতি সাগ্নিনা। স্ফুরন্ত্যা হৃদয়াকাশাৎ নাগরূপা মহোজ্জ্বলা। বায়ুর্বায়ু সখেনৈব ততো যাতি সুষুম্নয়া।।"—যোগকালে কুণ্ডলিনী অগ্নি ও অপান বায়ুর সাহায্যে জাগরিত হয়। তখন হৃদয়াকাশ পর্য্যন্ত মহা উজ্জ্বল সর্পরূপে উহা প্রকাশ পায়। তৎপরে বায়ু অগ্নিসহ সুষুম্না দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—"নীহার-ধূমার্কা-নলা-নিলানাং, খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি, ব্রহ্মণ্য-ভিব্যক্তিকরাণি যোগে"—শিশির, ধূঁয়া, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু (নীলজ্যোতিঃ), জোনাকী, বিদ্যুৎ, স্ফটিক (কাঁচ), চন্দ্র—এই সকল পদার্থের ন্যায় জ্যোতিঃরূপ প্রকাশ পাইলে, বুঝিতে হয় যে, ইহারা ব্রহ্মকে শীঘ্র প্রকাশ করিবে।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—"অন্তঃকরণমধ্যে তু জ্যোতি-রাত্মা প্রবর্ত্ততে। লিঙ্গদেহং তু তং প্রাহু র্যোগিন স্তত্ত্ববেদিনঃ॥ তৎ-প্রতীতৌ ভবেন্মুক্তি র্নান্যতো জন্মকোটিভিঃ॥"—অন্তরে জ্যোতিঃ-রূপে আত্মা প্রকাশিত হয়। তাহাকে যোগীগণ লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্মশরীর) বলেন। তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইলেই মুক্তি হয়, নতুবা কোটি জন্মেও হয় না।

সারদাতিলকে—"আত্মানং রবি-বহ্নি-চন্দ্র-বপুষং তারাত্মকং সন্ততম্। নিত্যানন্দ-গুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়ম্।"—চক্ষু বন্ধ করিয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা আত্মাকে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র বা নক্ষত্রের আকারে প্রায়শঃ দেখিতে পান। ইহাতে নিত্য আনন্দ লাভ হয়॥

শিবপুরাণে সনৎকুমার সংহিতায়—"নেত্রে পশ্যতি যজ্জ্যোতি-স্তারারূপং প্রকাশকম্। সজীবঃ সর্ব্বভূতানা-মাত্মানং চ সমা-হিতঃ"—ধ্যানস্থ পুরুষ চক্ষুতে যে নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশক জ্যোতিঃ দেখিতে পান, তাহা সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা।

ব্রহ্মপুরাণে—"বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চি-রাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ; বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে পশ্যন্ত্যা-ত্মানমাত্মনি ॥" ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, অথবা উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায়, অথবা আকাশস্থ বিদ্যুতের ন্যায় আত্মাকে যোগীরা অন্তরে দেখিতে পান ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যে-দাত্মানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ । সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনং তু ন বিদ্যতে ॥"—ধ্যানযুক্ত হইয়াই আত্মাকে সূর্য্য বা চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু সত্ত্বগুণ না জন্মিলে, ঐরূপ দর্শন লাভ হয় না ॥

বশিষ্ঠকৃত তত্ত্বসারায়ণ অন্তর্গত রামগীতায়—'মূলাধারাভিধং চক্রং প্রথম সমুদীরিতম্ । তত্র ধ্যেয়ং স্বরূপং তু পাবকাকার-মুচ্যতে ॥ স্বাধিষ্ঠানাভিধং চক্রং দ্বিতীয়ং চোপরস্থিতম্ । প্রবালাঙ্কুর তুল্যং তু তত্র ধ্যেয়ং নিগদ্যতে ॥ তৃতীয়ে নাভিচক্রে তু ধ্যেয়ং রূপং তড়িন্নিভম্ । তুর্য্যে হৃদয়চক্রে তু জ্যোতির্লিঙ্গাকৃতীর্য্যতে ॥ পঞ্চমে কণ্ঠচক্রে তু সুষুম্না শ্বেতবর্ণিনী । ধ্যেয়ং ষষ্ঠে তালুচক্রে শূন্যং চিত্তলয়ার্থকম্ ॥ ভ্রূচক্রে সপ্তমে ধ্যেয়ং দীপাঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণকম্ । আজ্ঞাচক্রেঽষ্টমে ধ্যেয়ংরূপং ধূম্রশিখাকৃতি ॥ আকাশ-চক্রে নবমে পরশুঃ স্বোর্দ্ধ-শক্তিকঃ । এবং ক্রমেণ চক্রাণি ধ্যেয়রূপাণি বিদ্ধি চ ॥ অখণ্ডৈক-রসত্বেন ধ্যেয়স্ত্বেকোঽপ্যুপাধিতঃ । আকারা বিবিধা যুক্তা নোপাধি-শ্চেতরঃ স্মৃতঃ ॥ বিদ্যাশক্তিবিলাসেন পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গবৎ । এতস্মাৎ ব্রহ্মণোঽখণ্ডাৎ বিবিধা-কৃতয়োঽভবন্ ॥'—অর্থাৎ মূলাধারে অগ্নি, স্বাধিষ্ঠানে প্রবালাঙ্কুর

নাভিতে বিদ্যুৎ, হৃদয়ে লিঙ্গাকৃতি, কণ্ঠে শ্বেতবর্ণ সুষুম্না, তালুতে শূন্য, ভ্রূচক্রে দীপ, আজ্ঞাচক্রে ধূম্রশিখা, এবং আকাশচক্রে পরশু (বজ্র—বিদ্যুৎ); এই সকল বস্তুর ন্যায় জ্যোতিঃ নবচক্রে ধ্যানগোচর হয়॥ প্রত্যেক ধ্যানগোচর জ্যোতিঃ এক অখণ্ড আনন্দ প্রদান করে বলিয়া তৎস্বরূপ; সুতরাং, উহারা সকল এক। তথাপি উহারা উপাধিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কিন্তু ঐ উপাধিও ঐ অখণ্ডানন্দ হইতে ভিন্ন নহে॥ বিদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী অন্তরে খেলা করিতে থাকিলে, অগ্নি হইতে যেমন বহু স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে, সেইরূপ এক অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে বিবিধ আকৃতির প্রকাশ হয়॥

মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ—'তদা পশ্চিমাভিমুখ-প্রকাশ-স্ফটিক-ধূম্র-বিন্দু-নাদ-কলা-নক্ষত্র-খদ্যোত-দীপ নেত্র-সুবর্ণ-নবরত্নাদি-প্রভা দৃশ্যন্তে॥ তদৈব প্রণবস্বরূপম্ অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে প্রকাশিত নিম্নোক্ত জ্যোতির দর্শন হয়। উহারা ওঁকার স্বরূপ। যথা—স্ফটিক (কাচ), ধূঁয়া, বিন্দু, (চন্দ্রকলাবৎ জ্যোতিঃ), নাদ (দীপশিখাবৎ জ্যোতিঃ) কলা (বিদ্যুৎরেখাবৎ জ্যোতিঃ), নক্ষত্র খদ্যোত প্রদীপ, নেত্র, স্বর্ণ, ও নবরত্নের আকারে জ্যোতিঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ—'সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো, যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।'—এই আত্মাকে সত্য তপস্যা, সম্যগ্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করা যায়। আত্মা শরীরের মধ্যে শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃরূপে অবস্থিত। যে সমস্ত যতির পাপাদি দোষ ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারা ইহাকে দেখিতে পান।

হঠপ্রদীপিকা—'বিবিধৈবাসনৈঃ কুম্ভৈ র্বিচিত্রৈঃ করণৈরপি। প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে॥' —মহাশক্তি কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে, বিবিধ আসন, কুম্ভক, ও মুদ্রা-ধ্যানাদি কর্ম্ম দ্বারা প্রাণ শূন্যে লীন হয়॥

রুদ্রযামলে ১৭ পটলে—'যদি শীর্ষে সমাগম্যা-মৃত-পানং করোতি সা। বায়বী সূক্ষ্মদেহস্থা সূক্ষ্মালয়প্রিয়া সতী। তদৈব পরমা সিদ্ধির্ভক্তিমার্গো ন সংশয়'—যদি কুণ্ডলিনী মস্তকে যাইয়া অমৃত পান করে, তবেই পরমসিদ্ধিস্বরূপ ভক্তি মার্গ লাভ হয়॥

রুদ্রযামলে ১৫ পটলে—'চৈতন্যা কুণ্ডলীশক্তি র্বায়বী বল-তেজসা। চৈতন্যা সিদ্ধিহেতুস্থা জ্ঞানমাত্রং দদাতি সা। জ্ঞান-মাত্রেণ মোক্ষঃ স্যাৎ বায়বী-জ্ঞান-মাশ্রয়েৎ॥' —প্রাণবল ও তেজঃ দ্বারা বায়বী শক্তি কুণ্ডলী ('সা দেবী বায়বী শক্তিঃ পরমাকাশ-বাহিনী।' রুদ্রযামলে) চৈতন্যা হয়। উহা চৈতন্য হইয়া সিদ্ধির হেতু হয়; এবং কেবল জ্ঞান দান করে। জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়। অতএব বায়বী শক্তি কুণ্ডলিনীকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য॥

'তদ্‌ভ্রমাবর্ত্ত-বাতোহয়ং প্রাণাত্মা নিত্যনূতনা।
নিত্য তিষ্ঠতু সানন্দা কুণ্ডলী তব বিগ্রহে॥'

(আগমসন্দর্ভে জ্ঞানদর্পণে)

তত্ত্বস্বরূপা কুণ্ডলিনীর ভ্রমণ (সঞ্চালন) জন্য প্রাণ ঘূর্ণি বায়ুতে পরিণত হয়। নিত্য নূতনা (এজন্য সাধক নূতন নূতন ভাবে কুণ্ডলিনীকে অনুভব করে), আনন্দরূপিণী কুণ্ডলিনী তোমার শরীরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকুক॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীগুরু ও শিষ্য-লক্ষণ

অধুনা সংক্ষেপে শ্রীগুরু ও শিষ্য-লক্ষণ বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিতেছি —

১। গুরু=গৄ (বিজ্ঞাপনে শব্দে চ) +কু=উপদেশক, দেশিক। অতএব, যঃ শিষ্যং রহস্যং গারয়তে বিজ্ঞাপয়তি স গুরুঃ অর্থাৎ যিনি শিষ্যের নিকট আত্ম-রহস্য খ্যাপন করেন, তিনি গুরু। অথবা, যঃ শিষ্যায় ধর্ম্মং গৃণাতি কথয়তি, স গুরুঃ অর্থাৎ যিনি শিষ্যের নিকট আত্মধর্ম্ম বলেন, তিনি গুরু।

২। গুরু=গু+রু। গু=অজ্ঞান, মায়া। রু=জ্ঞান, ব্রহ্ম। অতএব, যিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞান দান করেন, এবং মায়াভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্ম প্রকাশ করেন, তাঁহাকে গুরু বলে।

৩। গুরু=ভারী। যিনি শিষ্যের পাপভার এবং কার্য্যভার গ্রহণে সমর্থ, তিনি গুরু। (কুলার্ণবে) 'শিবাদি-গুরু-পর্য্যন্তং পারম্পর্য্য-ক্রমেণ যঃ। অবাপ্ত তত্ত্বসম্ভারঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ॥' —ঈশ্বর হইতে পরম্পরাক্রমে যিনি সম্পূর্ণ তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু।

ঐ—'যঃ সদ্যঃ প্রত্যয়করং সুলভং চাত্ম সৌখ্যদম্। জ্ঞানোপদেশং কুরুতে স গুরুর্দেবদুর্লভঃ॥'—যাঁহার উপদেশে সদ্যঃ-

সদ্যঃ প্রত্যয় জন্মে, অনায়াসে যাঁহার উপদেশ অনুসরণ করা যায়, এবং আন্তর সুখ লাভ হয়, তিনিই গুরু, দেবতারও দুর্লভ।

ঐ—'যেন বা দর্শিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাৎ তন্ময়ো ভবেৎ। ধন্যংতদুক্তমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ॥'—যিনি শিষ্যকে তত্ত্ব-দর্শানমাত্র শিষ্য তৎক্ষণাৎ তন্ময় হয়, তাঁহার সমস্ত বাক্যই শ্রেষ্ঠ, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু।

ঐ—'ক্ষুধিতস্য যথা তুষ্টিঃ আহারাদাশু জায়তে। তথোপদেশ মাত্রেণ জ্ঞানদো দুর্লভো গুরুঃ॥'—আহার দ্বারা যেমন ক্ষুধার্ত্তের শীঘ্রই তৃপ্তি হয়, সেইরূপ যাঁহার উপদেশ মাত্র শিষ্য অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে, সেই জ্ঞানদাতা গুরু দুর্লভ।

ঐ—'যে দত্ত্বা সহজানন্দং হরন্তীন্দ্রিয়জং সুখম্। সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈ রন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ॥'—যিনি অন্তরে সহজানন্দ জন্মাইয়া, শিষ্যের জিহ্বোপস্থাদি ইন্দ্রিয়ের সুখ কমাইয়া দেন সেই গুরুকেই সেবা করিবে; এতদ্ভিন্ন অন্য গুরু প্রতারক; তাহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত।

ঐ—'পাশচ্ছেদং বেধদীক্ষাং পশুপ্রহর-মেব চ। ত্রিবিধং যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥'—পাশচ্ছেদ (দেহাদিতে অভিমানরূপ বন্ধন নাশ), বেধদীক্ষা (শক্তি সঞ্চার) এবং পশুপ্রহর (একান্তভাবে ব্রত, উপবাস, নিয়ম, বাহ্য পূজা প্রভৃতি পশু-ভাব-হরণ), এই তিন বিষয় যিনি জানেন. তিনিই গুরু।

ঐ—'যো বা পরাং চ পশ্যন্তীং মধ্যমাং বৈখরীমপি। চতুষ্টয়ং বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥'—যিনি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি প্রকার বাক্ জানেন, তিনিই গুরু।

ঐ—'জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তি শ্চ তুরীয়ং তদতীতকম্। যো বেত্তি পঞ্চকং দেবি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥'—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, ও তুরীয়াতীত এই পাঁচ অবস্থা জানেন, তিনিই গুরু।

ঐ—'বন্ধনং যোনিমুদ্রায়াঃ মন্ত্রচৈতন্য-দর্শনম্। মন্ত্রাদ্যন্ত-স্বরূপং চ যো বেত্তি স গুরুঃ প্রিয়ে॥'—যিনি যোনিমুদ্রা, মন্ত্রচৈতন্য, এবং মন্ত্রের আদি ও অন্তস্বরূপ জানেন, তিনিই গুরু। [মন্ত্রের আদ্য স্বরূপ =শব্দ ; অন্তস্বরূপ=আত্মা। 'উদয়াদিলয়ান্তং চ মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ। উদয়ঃ শব্দ-রূপশ্চ লয়শ্চাত্মা প্রকীর্ত্তিতঃ॥'—ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে।]

'ক উপাস্য ইতি। সর্ব্বশরীরস্থ-চৈতন্য ব্রহ্ম-প্রাপকো গুরুঃ উপাস্যঃ। (নিরালম্বোপনিষৎ)—কে উপাসনার যোগ্য ? যিনি শিষ্যের সমস্ত শরীরস্থ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের অনুভব করাইয়া দেন, এবং শিষ্যকে সমস্ত ভূতের অন্তরস্থ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন,তাঁহাকেই উপাসনা করিতে হয়।

নারদ পঞ্চরাত্রে—'স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ স মাতা স পতিঃ সুতঃ। যো দদাতি হরৌ ভক্তিং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনীম্॥'—হরিভক্তি কর্ম্মের মূল অবিদ্যা নাশ করিয়া মোক্ষ দান করে। এই হরিভক্তি

যিনি দান করেন, তিনিই গুরু ; তিনিই ব্রহ্ম ; জন্ম-দাতা পিতা স্বরূপ ; তিনিই বন্দনার যোগ্য ; তিনিই জ্ঞানোৎপাদিকা মাতা স্বরূপ, তিনিই রক্ষা ও পালনকর্ত্তা পতিস্বরূপ ; তিনিই পালন-যোগ্য সন্তানস্বরূপ।

মেরুতন্ত্রে—'পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ম্। যস্তু সম্যগ্ বিজানাতি স গুরু শ্চোদ্ধরেৎ পরম্॥'—যিনি পিণ্ড (কুণ্ডলিনী), পদ (হংস), রূপ (বিন্দুজ্যোতিঃ), ও রূপাতীত (নিষ্কল ব্রহ্ম) এই চারি বিষয় সম্যগ্ জানেন, সেই গুরুই অন্যকে উদ্ধার করিতে পারেন।

ভাগবতে (১১।৩)—'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশ-মাশ্রয়ম্॥'—যিনি শব্দব্রহ্মে পারদর্শী এবং উপশমসম্পন্ন, এমন গুরুকে উত্তম শ্রেয়স্কর বিষয় জানিবার জন্য আশ্রয় করিবে।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে—'সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্থঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥'—যিনি শিষ্যের ভাষা বুঝিবার শক্তি অনুসারে সংস্কৃত, প্রাকৃত, বা দেশভাষাদি উপায় দ্বারা বুঝাইতে সমর্থ, তিনি গুরু।

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়—তস্মাদ্ যস্যৈব সম্পর্কাৎ প্রবোধা-নন্দসম্ভবঃ। গুরুং তমেব বৃণুয়ান্ নাপরং মতিমান্ নরঃ।'—যাঁহার সম্পর্কে প্রবোধ ও আনন্দ জন্মে, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুরূপে বরণ করিবে, অন্যকে নহে।

শিষ্য = শাস (শাসনে) + ক্যপ্ = উপদেশ্য = শাসনের যোগ্য।

'যস্ত্বাচার্য্য-পরাধীন স্তদ্‌বাক্যং শাস্তুতে হৃদি। শাসনে স্থির-বৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ।" (পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে)—যে গুরুর অধীন থাকে, তাঁহার বাক্য অন্তরে মানিয়া লয়, এবং তাঁহার শাসনে (আদেশে) স্থির থাকে, তাহাকে শিষ্য বলে।

কুলার্ণবে (১৭ উল্লাসে)—"শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ। গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং শিষ্য ইত্যভিধীয়তে॥"—শরীর, অর্থ ও প্রাণ সদ্‌গুরুকে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট যে যোগশিক্ষা করে, তাহাকে শিষ্য কহে। [শরীর নিবেদন = শরীরের দ্বারা গুরুর সেবা। অর্থ নিবেদন = গুরুকে ধনাদি প্রয়োজনীয় বস্তু নিবেদন। প্রাণ নিবেদন = প্রাণপণে একনিষ্ঠার সহিত তাঁহার বাক্যানুযায়ী সাধন করা।]

দীক্ষাতত্ত্ব-ধৃত পুরাণবচন—"বাঙ্-মনঃ-কায়-বস্তুভি গুর্রু-শুশ্রূষণে রতঃ। এতাদৃশ-গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নারদ॥"—হে নারদ, যে ব্যক্তি বাক্য, মন, শরীর ও অর্থ দ্বারা গুরুকে সেবা করে, সেই শিষ্য।

শিবপুরাণে বিদ্যেশ্বরসংহিতা—"শিষ্যঃ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ সদা শিষ্যত্ব-যোগতঃ। জিহ্বা-লিঙ্গাৎ মন্ত্র-শুক্রং কর্ণ-যোনৌ নিষিচ্য বৈ। জাতঃ পুত্রো মন্ত্র-পুত্রঃ পিতরং পূজয়েদ্ গুরুম্॥ নিমজ্জয়তি পুত্রং বৈ সংসারে জনকঃ পিতা। সংতারয়তি সংসারাৎ গুরু র্বৈ বোধকঃ পিতা॥ উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা পিতরং গুরুমর্চ্চয়েৎ।

অঙ্গ-শুশ্রূষয়া চাপি ধনাদ্যৈঃ স্বার্জ্জিতৈ গুরুম্। তস্মাদ্বৈ শাসনে যোগ্যঃ শিষ্য ইত্যভিধীয়তে॥" শিষ্যকে পুত্র বলা হয়, কারণ উভয়ই সদা শাসনের যোগ্য। শ্রীগুরু নিজের জিহ্বা-রূপ লিঙ্গ দ্বারা মন্ত্র-রূপ শুক্রে শিষ্যের কর্ণ-রূপ যোনিতে নিক্ষেপ করতঃ মন্ত্র-পুত্র জন্ম দেন। এজন্য ঐ মন্ত্র-পুত্র পিতারূপ গুরুকে সেবা করে। জনক-পিতা পুত্রকে জন্ম ও ভোগ সুখ দিয়া সংসারে আবদ্ধ করে; কিন্তু বোধক পিতা-রূপ গুরু জ্ঞান দিয়া শিষ্য-পুত্রকে সংসার হইতে ত্রাণ করেন। এই উভয়ের প্রভেদ জানিয়া গুরুর দেহ শুশ্রূষা দ্বারা এবং নিজের উপার্জ্জিত ধনাদি দ্বারা পিতা-রূপ গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। অতএব যে শাসনের যোগ্য, তাহাকেই শিষ্য বলে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—"যথা পুত্র স্তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্র-শিষ্যয়োঃ। তর্পণে পিণ্ডদানে চ পালনে পরিপোষণে॥ যথাগ্নি-দাতা পুত্রশ্চ তথা শিষ্যশ্চ নিশ্চিতম্। ইতীদং কাণ্বশাখায়াম্ উবাচ কমলোদ্ভবঃ॥" —যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—পুত্র ও শিষ্য সমান, উভয়ের কোন ভেদ নাই। পুত্র যেমন পিতার তর্পণে, পিণ্ডদানে, পালনে, পরিপোষণে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অধিকারী, শিষ্যও তদ্রূপ গুরুর তর্পণাদিতে নিশ্চয়ই অধিকারী॥

বামনপুরাণে—"পুন্নাম-নরকাৎ ত্রাতি পুত্রস্তেনেহ গীয়তে। শেষপাপ-হরঃ শিষ্য ইতীদং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥—পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া 'পুত্র' নাম এবং গুরুর শেষ পাপ হরণ করে বলিয়া 'শিষ্য' নাম॥

পুন্নাম-নরক ও শেষ পাপ

বামনপুরাণে ৬০-৬১ অধ্যায়ে পুন্নামক নরক ও শেষপাপ কি কি, তাহার নির্দ্দেশ আছে। **পুন্নাম-নরক** = ১৭ দফা পাপরূপ ১৭ নরক। যথা—(১) পরদারগমন, পাপিসেবা, পারুষ্য ; (২) চৌর্য্য, বৃথাপর্য্যটন, বৃক্ষচ্ছেদন ; (৩) বর্জ্জ্য দ্রব্য গ্রহণ, অবধ্য-বধ-বন্ধন, বান্ধব সহিত বিবাদ ; (৪) ভয়দান, নিজ ধর্ম্মনাশ করণ ; (৫) মারণ, কুটিলতা, বৃথা অভিশাপ, একাকী মিষ্টান্ন ভোজন ; (৬) ফলহরণ, যোগনাশ, যানহরণ ; (৭) রাজভাগহরণ, রাজপত্নী-গমন, রাজার অহিতাচরণ ; (৮) লোভ, গর্ব্ব, লব্ধ ধর্ম্মার্থ নাশকরণ ; (৯) ব্রাহ্মণ নিন্দা, ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রাহ্মণ সহিত বিরোধ ; (১০) শিষ্টাচার নাশ, মিত্রদ্বেষ, শিশুহত্যা, শাস্ত্রচুরি, ধর্ম্মশূন্যতা ; (১১) ষড়ঙ্গ-নিধন ; (১২) সাধু-নিন্দা, সংস্কার বর্জ্জন ; (১৩) চতুর্ব্বর্গ পরিহরণ ; (১৪) ধর্ম্মহীনতা, গৃহে অগ্নি দেওয়ান ; (১৫) অজ্ঞান, অসত্য, অসূয়া, অশৌচ ; (১৬) আলস্য, ক্রোধ, আততায়িতা, আক্রোশ ; (১৭) পরদারেচ্ছা, শাস্ত্রে ঈর্ষ্যা, ঔদ্ধত্য। এই সমস্ত পাপে 'পুং' নামক নরকে পতন হয় বলিয়াও পুন্নাম-নরক নাম। **শেষ পাপ** = দেবতা, ঋষি, সর্ব্বপ্রাণী, মনুষ্য ও পিতৃ-লোকের ঋণ অপরিশোধ, সর্ব্ববর্ণে একতা, ওঁকারাদি হইতে নিবৃত্তি ইত্যাদি, অগম্যাগমন, ঘৃতাদি বিক্রয়, চণ্ডালাদি হইতে পরিগ্রহ, স্বদোষ-গোপন, পরদোষ প্রকাশ, ঈর্ষ্যা, কর্কশতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি ॥

দীক্ষার পর শিষ্য-কর্ত্তব্য

বৃহন্নীলতন্ত্রে—"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে। ন চেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্য ভবিষ্যতি ॥"—প্রত্যক্ষ শিবস্বরূপ গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয় নতুবা গুরুর সঞ্চারিণী শক্তি শিষ্যে থাকিতে পারে না।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে—"পিত্রো-রভরণং কৃত্বা হ্যদত্ত্বা গুরু-দক্ষিণাম্। কৃতঘ্নতাং চ সংপ্রাপ্য মরণান্তা হি নিষ্কৃতিঃ ॥"—পিতামাতার ভরণপোষণ না করিলে এবং গুরুকে দক্ষিণা না দিলে, মরণের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কৃতঘ্নতা দোষে লিপ্ত থাকে।

দক্ষিণা দ্বারা ঋণ পরিশোধ হয়। যাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইয়া লওয়া হয়, তাহার নিকট ঋণী হইতে হয়। সুতরাং দক্ষিণা দিলে, ঐ ঋণ পরিশোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দক্ষিণা গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধনভজন করা। তাহাতে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই স্থায়ী ফল উৎপন্ন হয়। কারণ শিষ্যের সাধনজনিত সৎফল গুরুর আত্মাকে অধিকতর সন্তুষ্ট করে, এবং তাহাতেই শিষ্য পুনঃ গুরু হইতে অধিকতর অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করিয়া ধন্য হয়। বশিষ্ঠকৃত 'তত্ত্বসারায়ণ' অন্তর্গত রামগীতায় হনুমান প্রতি শ্রীরাম-বাক্য—"শ্রোতব্যং নিখিলং শ্রুতং মম মুখাদ্ ভক্ত্যা ত্বয়া মারুতে, তৎ সর্ব্বং সফলং কুরুষ্ব মননাদ্ ধ্যানাচ্চ তীব্রাৎ স্বয়ম্। এষা মে গুরুদক্ষিণা প্রিয়তমা, তত্ত্বার্থসংবর্দ্ধিনী, নো চেদূষর-বীজবাপিন ইব

ক্লেশায় মে মদ্বচঃ ॥"—হে মারুতে, আমার মুখে তুমি ভক্তির সহিত যাহা শুনিবার তাহা সমস্তই শুনিয়াছ। সেই সকল এখন তীব্র মনন ও ধ্যান সহায়ে স্বয়ং সফল কর। ইহাতে তত্ত্বার্থ সংবৰ্দ্ধিত হয়। ইহাই আমার প্রিয়তম গুরুদক্ষিণা। নতুবা অনুর্ব্বর স্থানে বীজ বপনের ন্যায় আমার বাক্য আমার ক্লেশ উৎপাদন করিবে।

শ্রীগুরুর আদেশ অনুসারে অন্ততঃ কিছুকাল তাঁহার সাহচর্য্য করা উচিত। তিন দিনের মধ্যে সাধারণতঃ শক্তি সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ হয়; এক বৎসর উহার শেষ সীমা। সুতরাং এই এক বৎসর কাল গুরুর সঙ্গে থাকিতে পারিলেই ভাল। তাহাতে শক্তিবৃদ্ধি ও সংশয় নিবারণ হয়। তথাপি যে অতিশয় ভক্ত ও নির্ভরশীল এবং দৃঢ়ব্রত, তাহার জন্য বেধদীক্ষার গুরু যে কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, কারণ জ্ঞানবতী দীক্ষা মনের কাজ। মানসিক সাহচর্য্য ইহার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ভক্ত দূরে থাকিলেও তাহার মন গুরুর নিকটেই থাকে, তাহাতেই সাহচর্য্যের কাজ হয়। তথাপি সুযোগ পাইলেই প্রত্যক্ষ সাহচর্য্য করা উচিত।

নীলতন্ত্রে—"তস্য ছায়ানুসারী চ নিকটে ত্রিদিনং বসেৎ। ন চেৎ সঞ্চারিণী শক্তির্গুরুমেতি ন সংশয়ঃ ॥"—দীক্ষার পর তিন দিন গুরুর ছায়া অনুসরণ করিয়া নিকটে থাকিতে হয় (অর্থাৎ তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে হয়)। নতুবা শিষ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা গুরুর মধ্যে ফিরিয়া আসে। ইহাতে সংশয় নাই।

গৌতমীয় তন্ত্রে—"ত্রিদিনং নিবসেদ্ ভক্ত্যা সিদ্ধয়ে গুরু-সন্নিধৌ। অন্যথা তদ্‌গতং তেজো গুরুমেতি ন সংশয়ঃ ॥"—দীক্ষার পর সিদ্ধিলাভের জন্য ভক্তির সহিত তিন দিন গুরুর সন্নিকটে থাকিতে হয়, নতুবা গুরুর যে তেজঃ শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই গুরুতে ফিরিয়া যায়।

শ্রীগুরু, মন্ত্র ও ইষ্ট অভেদ

শ্রীগুরুতে, মন্ত্রে ও দেবতায় অভেদ জ্ঞান করিতে হয়। দেবতা, মন্ত্র ও গুরু একই। ইঁহাদের যাঁহাকেই পূজা করা যায় তিনিই সমান ফল দেন। "যথা দেব-স্তথা মন্ত্রো যথা মন্ত্র স্তথা গুরুঃ। দেব-মন্ত্র-গুরূণাং চ পূজায়াঃ সদৃশং ফলম্ ॥" (কুলার্ণবে)।

শ্রীগুরু অল্পবয়স্ক হইলেও পিতার ন্যায় মান্য। ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা। বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ ॥" (মনুসংহিতা)—যিনি বৃদ্ধকে ব্রহ্মজন্ম দেন অথবা স্বধর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি বালক হইলেও ধর্ম্মতঃ পিতাতুল্য মান্য।"

"গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্। গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ। নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥" (তত্ত্বোপদেশঃ)—গুরুর বাক্য, দর্শন ও সেবা ও লোকের হিতকারী। গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। অতএব মুমুক্ষুরা তাঁহাকে সেবা ও বন্দনা করিবে। কৃতজ্ঞ ও বিবেকী শিষ্য কদাপি গুরুর উদ্বেগ জন্মাইবে না।

শ্রীগুরুনিন্দা-কথন-শ্রবণ নিষিদ্ধ

গুরো বিরুদ্ধং যদ্ বাক্যং ন বদেৎ জাতুচিৎ নরঃ ॥" শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়)—যে কথা গুরুর বিরুদ্ধে যায় (অর্থাৎ যে কথায় গুরুর দোষ বুঝায়), এমন কথা কখনও বলিবে না।

"পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ। পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী ॥" (মনুসংহিতা ২য় অঃ)—যে গুরুর পরীবাদ করে অর্থাৎ বিদ্যমান দোষ খ্যাপন করে, সে গাধা হয় ; যে নিন্দা করে অর্থাৎ অবিদ্যমান দোষ খ্যাপন করে, সে কুকুর হয় ; যে অনুচিতভাবে গুরুর ধনে জীবিকা-বহন করে, সে কৃমি (ছোট পোকা) হয় ; এবং যে গুরুর উৎকর্ষে দ্বেষ করে, সে কীট (বড় পোকা) হয়।"

"যত্র শ্রীগুরু-নিন্দা স্যাৎ শ্রবণেঽস্মিকে। সদ্যস্তস্মাদুপক্রমেদ্ দূরং ন শৃণুয়াদ্ যথা। গুরোর্নাম জপেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া ॥" (কুলার্ণবে)—যেখানে শ্রীগুরুর নিন্দা হয়, সেস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ কর্ণ বন্ধ করিয়া এমত দূরস্থানে যাইবে, যে স্থান হইতে ঐ নিন্দা শোনা না যায়। পরে শ্রীগুরুর নাম জপ করিবে, তাহাতে ঐ নিন্দা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শ্রীগুরুনাম-মহিমা

"গুরোর্নাম ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি পার্ব্বতি। গুরোঃ স্থানং চ কল্যাণি শ্রী পূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ ॥" (গুরুরাজ তন্ত্রে)—শ্রীগুরুর

নাম ও বাসস্থান কদাপি খালি উচ্চারণ করিবে না। 'শ্রী' এই শব্দ পূর্ব্বে যোগ করিয়া ঐ নাম ও স্থানের উচ্চারণ করিবে ॥

"গুরুং নাম্না ন ভাষেত জপকালাদ্ ঋতে প্রিয়ে। শ্রী-নাথ-দেব-স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ॥" (কুলার্ণবে)—জপকাল ভিন্ন শ্রীগুরুকে নাম নিয়া ডাকিবে না। ব্যবহার ক্ষেত্রে বা সাধন সময়ে শ্রীগুরুর নামের সঙ্গে শ্রী, নাথ, দেব বা স্বামী শব্দ যোগ করিয়া নাম উচ্চারণ করিবে।

"নোদাহরে-দস্য নাম পরোক্ষ-মপি কেবলম্।" (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়)—শ্রীগুরুর অসাক্ষাতেও শ্রী, দেব প্রভৃতি পূজাবাচক শব্দ ব্যতীত কেবল (খালি) গুরুনাম উচ্চারণ করিবে না।

"গুরোর্গেহে সমক্ষং বা ন যথেষ্টা-সনো ভবেৎ। গুরু দে'বো যতঃ সাক্ষাৎ তদ্গৃহং দেবমন্দিরম্॥" (শিবপুরাণে)—শ্রীগুরুর থাকিবার ঘরে অথবা তাঁহার সমীপে যথেষ্টভাবে বসিবে না। (যেমন, তাঁহার দিকে পা দিয়া বা পা প্রসারিত করিয়া, ইত্যাদি); কারণ শ্রীগুরু সাক্ষাৎ দেবতা এবং তাঁহার গৃহ দেবমন্দির।

"গুরো গু'রৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ ॥" (মনু-সংহিতা)—শ্রীগুরুর শ্রীগুরুদেব উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি শ্রীগুরুর ন্যায় আচরণ করিবে।

"গুরু-প্রগুরুযোগেন বন্দেত প্রগুরুং প্রিয়ে। ততো নমেদ্ গুরুং বাপি গুর্ব্বাজ্ঞাং ন বিচারয়েৎ। প্রগুরোঃ সন্নিধৌ শিষ্যঃ স্বগুরুং মনসা নমেৎ ॥" (কুলার্ণবে ১২ উল্লাসে)—শ্রীগুরু ও

শ্রীপ্রগুরু একত্র উপস্থিত থাকিলে পূর্ব্বে শ্রীপ্রগুরুকে বন্দনা করিবে, তৎপরে স্বীয় শ্রীগুরুকে প্রণাম করিবে। ইহাতে স্বগুরুর আদেশের অপেক্ষা নাও করিতে পারা যায়। তথাপি তখন স্বীয় শ্রীগুরুদেবকে পূর্ব্বেই মনে মনে প্রণাম করিয়া তৎপর শ্রীপরম গুরুকে প্রণাম করিবে।

শ্রীগুরু-নির্দ্ধারণ

"বর্ণোত্তমেঽথবা গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপিচ। স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা। বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামূত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাৎ-শাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥ ক্ষত্র-বিট্-শূদ্র-জাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥" (নারদপঞ্চরাত্রে)—স্বদেশে বা বিদেশে শ্রেষ্ঠ বর্ণের গুরু বিদ্যমান থাকিলে, অথবা বিদ্যমান আছেন শোনা গেলে, শ্রেষ্ঠ বর্ণের শিষ্য কনিষ্ঠ বর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষা নিবে না। তাহাতে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি অবশ্য পালন করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুরু প্রতিলোম ক্রমে দীক্ষা দিবে না, অর্থাৎ নীচ বর্ণ গুরু উচ্চবর্ণ ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না।

"উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনাম্। যতীনাং চ যতি প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥" (কুলচূড়ামণি তন্ত্রে)—উদাসীনের উদাসীন গুরু, বানপ্রস্থাশ্রমীর বানপ্রস্থী গুরু, যতির যতি গুরু এবং গৃহস্থের গৃহী গুরু প্রশস্ত। কিন্তু "যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধ-

বিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তাং তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু-বিচারণম্ ॥ (সিদ্ধযামলে)—যদি ভাগ্যবশে সিদ্ধমন্ত্র পাওয়া যায়, তবে (সাধারণ নিয়মানুসার) গুরুনির্দ্ধারণ-বিচার ত্যাগ করিয়া তাহাতেই দীক্ষিত হইবে।

"যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধো হি পুরুষো মিলেৎ। তদৈব দীক্ষাং গৃহ্ণীয়াং ত্যক্ত্বা কালবিচারণম্ ॥" (মন্ত্রযোগসংহিতা)—যদি ভাগ্যক্রমে সিদ্ধপুরুষ মিলে, তবে কালের বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ দীক্ষা নিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা কন্যকা ভবেৎ ॥" (রুদ্রযামলে)—পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হয়, তবে সে পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারে। পত্নী শক্তি স্বরূপ হওয়ায় দীক্ষা দেওয়ার জন্য সে কন্যারূপে ব্যবহৃত হয় না, সে ভার্য্যারূপেই থাকে; অথচ অন্যান্য স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিলে তাহারা কন্যা স্বরূপ হয়।

"বহুনাত্র কিমুক্তেন যোঽপি কোঽপি শিবাশ্রয়ঃ। সংস্কারো গুর্ব্বধীনশ্চেৎ সংস্ক্রিয়া তু প্রভিদ্যতে ॥" (শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়)—আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? যে কেহই শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এক গুরুই তাহাদের শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু অধিকারী ভেদে দীক্ষাবিধি বিভিন্ন রূপ হয়; এইমাত্র প্রভেদ।

বিপ্রাদ্য-ন্ত্যজ-পর্য্যান্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে। তে সর্ব্বেঽস্মিন্

কুলাচারে ভবেয়ু রধিকারিণঃ।। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে)—ব্রাহ্মণ হইতে ম্লেচ্ছাদি অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত সকলেই কুলাচারে অধিকারী।

ব্রাহ্মণ-শরীরী আচার্য্যের সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারী বেদবিদ্যা লাভে ধন্য হন। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদ-বিদ্যা তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণেরই গচ্ছিত বিদ্যা। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট হইতে এই গচ্ছিত ধন গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করতঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে উহা দান করেন এবং তাঁহাদের গুরুরূপে পূজিত হয়েন। ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে এবং উহাদের ভাষ্যে ও টীকায় স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং ঐভাবে বিদ্যাগ্রহণ কালে যে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের নিকট হইতে গচ্ছিত বিদ্যার পুনর্গ্রহণ করা হয়, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া উত্থিত হওয়া এবং তাঁহার অনুগমন ব্যতীত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে আর কোন প্রকারের শুশ্রূষার কথা কোন বৈদিক আর্য্য শাস্ত্রে নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে অ-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকারের বিধান ও দৃষ্টান্ত উপলব্ধ সনাতন শাস্ত্রে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু ঐরূপ প্রতিলোম কার্য্য যে উভয়ের পক্ষে মহা অনিষ্টকর ও নরকপ্রদ তাহাই শাস্ত্রে স্পষ্টভাষায় উল্লিখিত রহিয়াছে।

শিষ্যের বিদ্যা-অভিমান, ভক্তি-অভিমান, জ্ঞান-অভিমান, সেবা-অভিমান প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া শিষ্যকে শ্রীগুরু কৃপয়া শুদ্ধ ও নিরভিমান করিয়া ধন্য করেন। এই হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে

ঐরূপ অভিমানী ব্রাহ্মণ শিষ্যকে কৃপালু শ্রীগুরু তাঁহার কোন নিরভিমান ব্রাহ্মণেতর শিষ্যের নিকট প্রেরণ করিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্যের অভিমানের মূলে কুঠারঘাত করাইয়া তাহাকে অভিমানমুক্ত করতঃ উদ্ধার করিয়া থাকেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণীয় গুরুভাই ব্রাহ্মণবর্ণীয় গুরুভাইকে উপযুক্ত সম্মান, প্রণিপাত ও সেবাপূর্ব্বকই বিদ্যা, ভক্তি ও জ্ঞানের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার ভ্রম নাশে সহায়ক হন। 'নারদ-ধর্ম্মব্যাধ-সংবাদে' ইহা সুস্পষ্ট। জনক, শুকদেবও পরস্পর গুরুভাই ছিলেন। সেরূপ স্থলেও আচার্য্যত্বের ভাবনা অথবা অভিমান ব্রাহ্মণেতর গুরুভাই রাখেন না—মন্ত্রদাতা গুরু হইবার বা সাজিবার ত সেক্ষেত্রে প্রশ্নই উঠে না। রাজর্ষি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবহন, ভীষ্মদেব, পুরাণবক্তা সূত, বারাণসীর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির নিকট হইতে কোনও মুনি ঋষি ব্রাহ্মণই মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্য হন নাই। এই সকল কৃতবিদ্য, ঈশভক্ত, জ্ঞানবান্‌দিগের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং পুরাণ-সঙ্গ হইত। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদবিদ্যাগ্রহণ ও মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ এক জিনিষ নহে।

বেদবিদ্যাগ্রহণ-বিষয়ে ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

"অব্রাহ্মণা-দধ্যয়ন মাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাব-দধ্যয়নং গুরোঃ ॥" (২।২৪১)

অর্থাৎ আপৎকালে (কোন প্রদেশে ব্রাহ্মণদেহধারী বেদাচার্য্যের অভাব হইলে) ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী দ্বিজ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে

বেদবিদ্যা গ্রহণ করিতে পারেন আর দ্বিজ ক্ষত্রিয়ের অভাবে দ্বিজ বৈশ্যের নিকট হইতে বেদবিদ্যা গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। যতদিন অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যাদাতাকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করা এবং একত্র গমনের সময় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনরূপ অনুগমন—ইহাই উক্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুশুশ্রূষা হইবে।ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণীয় হওয়াতে উক্ত বিদ্যাদাতার পাদপ্রক্ষালন, পাদোদক পান, উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ প্রভৃতি তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। এই কারণে "অনুব্রজ্যা চ" এই বিশেষণ উক্ত মনু-বচনে দেওয়া হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বিদ্যাদাতাও তাবৎকাল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর গুরু থাকিবেন যাবৎকাল ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। পরন্তু বিদ্যাগ্রহণ সমাপ্ত হইলেই উক্ত ব্রাহ্মণকুমার "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু" এই শাস্ত্রপ্রমাণ বলে তাঁহার জন্মসিদ্ধ গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনঃ উক্ত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গুরু হইবেন এবং তাঁহাদের দ্বারা গুরুরূপে পূজিত হইবেন। এই কথাই মনুসংহিতার সর্ব্ব-অস্তিকজন-মান্য সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার 'কুল্লূক ভট্ট' এই ভাষায় বলিয়াছেন এবং এই পক্ষে তিনি 'ব্যাস স্মৃতি'র ও বাক্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অব্রাহ্মণাদিতি॥ ব্রাহ্মণাদন্যো যো দ্বিজঃ ক্ষত্রিয়স্তদভাবে বৈশ্যো বা তস্মাদধ্যয়নমাপৎকালে ব্রাহ্মণাধ্যাপকাসম্ভবে ব্রহ্মচারিণে বিধীয়তে। অনুব্রজ্যাদিরূপা গুরোঃ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং তাবৎ কার্য্যা। গুরুপাদপ্রক্ষালনোচ্ছিষ্ট প্রাশনাদিরূপা শুশ্রূষা প্রশস্তা, সা ন কার্য্যা। তদর্থমনুব্রজ্যা চেতি বিশেষিতম্। গুরুত্বমপি যাবদধ্যয়নমেব ক্ষত্রিয়স্যাহ ব্যাসঃ—'মন্ত্রদঃ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রৈঃ

শুশ্রূষানুগমনাদিনা। প্রাপ্তবিদ্যো ব্রাহ্মণস্তু পুনস্তস্য গুরুঃ স্মৃতঃ' ॥" ২৪১ ॥

ইহা আপদ্ধর্ম্ম—আপৎকালের আচরণ; ব্রাহ্মণ আচার্য্য উপলব্ধ থাকিলে এরূপ করিবার বিধি নাই। কিন্তু কোথাও কোনও কালে ব্রাহ্মণের পক্ষে অব্রাহ্মণের নিকট হইতে 'মন্ত্রদীক্ষা' গ্রহণের আদেশ বা দৃষ্টান্ত সনাতন বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তথাপি যে বর্ত্তমানে বলা হয়—'আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সুযোগ্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিতেন'—এই শাস্ত্র ও দৃষ্টান্ত-বিরুদ্ধ কথা কলি-কৌতুকের এক বিশেষ প্রহসন এবং অব্রাহ্মণপন্থী অথবা শূদ্রপন্থী সাধুবেষী সঙ্গের নিকৃষ্ট পরিণামের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

আধুনিক কালে বহু অব্রাহ্মণপন্থী অথবা শূদ্রপন্থী কিম্বা আপাপন্থী সাধুবেষীকে বলিতে শুনা যায় যে, শাস্ত্রেই ত আছে যে কলিতে শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মুখ হইতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। হাঁ, এই কথাগুলি শাস্ত্রে আছে বটে। কিন্তু কোন্ প্রকরণে আছে? যেখানে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করিয়া উদর পূরণ করিবে, ব্রাহ্মণ অন্ন বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইবে; পত্নী পতির নিন্দায় মুখরা হইবে, পতিকে তিরস্কার করিবে, শাসন করিবে এবং গোপনে উপপতির সহিত রতি করিবে; সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে, ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ-বিক্রয় অথবা অন্ন-

বিক্রয় যেমন পাপ কার্য্য, গর্হিত কার্য্য, নিন্দিত কার্য্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য ; স্ত্রীর পক্ষে পতি নিন্দা, পতিকে তিরস্কার বা শাসন করা এবং গুপ্তভাবে পরপুরুষ-সহবাস যেমন মহাপাপ ও মহা-নিন্দিত এবং শাস্ত্র-বিগর্হিত অনার্য্যোচিত নরকপ্রদ কার্য্য, সেইরূপ শূদ্রপক্ষেও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করা, ব্রাহ্মণকে পাদোদক পান করান অথবা ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনান মহাপাপ কার্য্য, মহানিন্দিত কার্য্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য, নরকপ্রদ কার্য্য ; ইহা শাস্ত্রশ্রদ্ধাহীনতা, শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা, সদাচার হীনতা, মনোমুখিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, যাবনিকতা ও পাপাচারের পরিচয়। ইহা শাস্ত্রবিধি নহে—ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ দুষ্টকার্য্য। ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য দেব বলিয়াছেন—"সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি, শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্য অপেক্ষিতত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।৩।৩৪)॥

আপৎকালেই যখন ব্রাহ্মণ, দ্বিজ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের অভাবে দ্বিজ বৈশ্যের নিকট হইতে বেদবিদ্যা-গ্রহণে আদিষ্ট হইতেছেন—দ্বিজেতর শূদ্র, অন্ত্যজ প্রভৃতির নিকট হইতে নহে, তখন অনাপদি তিনি যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় আচার্য্য ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে বেদবিদ্যা-গ্রহণে অধিকারপ্রাপ্ত নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। 'মনুসংহিতা'র প্রাচীন টীকাকার মহামতি 'মেধাতিথি' ও প্রাগুক্ত ২।২৪১ শ্লোকের টীকায় এই সকল কথা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন॥

যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন না, জাতিভেদ মানেন না এবং তাহা উঠাইয়া দিয়া 'পশ্চিমী উদার' সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে চা'ন,

তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এস্থলে সে বিষয়ে কোন আলোচনা করা হইল না। কিন্তু যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রমোশনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত এবং নিজ নিজ কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন ও অপরকে করিতেছেন, তাহাদের জন্য এই কথা উপস্থাপিত করা হইল। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকগণ স্বধর্ম্মে ও কুলাচারে থাকিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিবার নিয়ম

(১) শিব পুরাণে বায়বীয় সংহিতায়—

"নাধিকারঃ স্বতো নার্য্যাঃ শিবসংস্কার-কর্ম্মণি। নিয়োগাদ্ ভর্ত্তুরস্ত্যেব ভক্তিযুক্তা যদীশ্বরে ॥ তথৈব ভর্ত্তৃ-হীনায়াঃ পুত্রাদে-রভ্যনুজ্ঞয়া। অধিকারো ভবত্যেব কন্যায়াঃ পিতু-রাজ্ঞয়া ॥" মঙ্গলময় দীক্ষা লাভ করিতে স্ত্রীগণের নিজের অধিকার নাই। সধবা স্ত্রী যদি ভক্তিমতী হয়, তবে স্বামীর অনুমতি নিয়া তাহাকে দীক্ষা দিবে। ভক্তিমতী বিধবা স্ত্রীলোক হইলে, পুত্রাদি অভিভাবকের অনুমতি অনুসারে তাহাকে দীক্ষা দিবে। অবিবাহিতা কন্যাকে তাহার পিতার আজ্ঞায় দীক্ষা দিবে ॥

(২) কুলার্ণবে ১৪ উল্লাসে—

"বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া। নাধিকারঃ স্বতো নার্য্যাঃ ভার্য্যায়া ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ॥"—স্ত্রীলোকদের দীক্ষা গ্রহণে তাহাদের নিজেদের অধিকার নাই। বিধবা পুত্রের অনুমতি, কন্যা

পিতার আদেশ এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥

(৩) 'বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে' দীক্ষা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"শৌক্রং তথা চ সাবিত্রং দৈক্ষং চ জন্ম সম্মতম্। জন্মত্রয়ং দ্বিজন্মানাং স্ত্রী-শূদ্রাণাং দ্বিজন্মতা ॥" অর্থাৎ কুলগতজন্ম, উপনয়ন সংস্কাররূপ জন্ম এবং তান্ত্রিকী দীক্ষারূপ জন্ম—এই তিন প্রকার জন্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিদিগের হয়; স্ত্রী ও শূদ্রদিগের কুলগত জন্ম ও তান্ত্রিকী দীক্ষারূপ জন্ম—এই দুই প্রকার জন্ম হয়।

(৪) 'নৃসিংহতাপিনী শ্রুতি'তে কথিত হইয়াছে—"সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ স মৃতোঽধিগচ্ছতি।" অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র যদি বেদোক্ত সাবিত্রী, লক্ষ্মী, যজুঃ (বৈদিক মন্ত্র বিশেষ), ও প্রণব মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহাদের অধোগতি হয়। [অতএব, এই সকল মন্ত্র ভিন্ন অপরাপর পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র-গ্রহণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার প্রমাণিত হইতেছে)।

(৫) পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৫৪ অধ্যায়ে মহামুনি বামদেবের নিকট হইতে মাতা পার্ব্বতীর মন্ত্র গ্রহণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। যথা—"শিব উবাচ—গুরূপদেশমার্গেণ পূজয়িত্বৈব কেশবম্। প্রাপ্নোতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বং নান্যথা ভূধরাত্মজে ॥ সমেত্য তং গুরুং দেবী পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। বিনীতা প্রাঞ্জলিভূ্র্ত্বা উবাচ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন সম্যগারাধনং হরেঃ। করিষ্যামি

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বমনুজ্ঞাতু মর্হসি॥ ইত্যুক্তস্তু তদা দেব্যা বামদেবো মহামুনিঃ। তস্মৈ মন্ত্রবরং শ্রেষ্ঠং দদৌ স বিধিনা গুরুঃ॥" অর্থাৎ শিব বলিলেন, হে পর্ব্বতনন্দিনি! শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে শ্রীকেশব ভগবানের পূজন করিলে সর্ব্বপ্রকার মনো-বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতী দেবী মুনিপুঙ্গব বামদেবের যথাবিধি পূজন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং হাত জোড় করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন—'ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি ভগবান্ কেশবের আরাধনা খুব ভালভাবে করিব, আপনি আমাকে আদেশ প্রদান করুন।' পার্ব্বতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর গুরুদেব মহামুনি বামদেব তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজ প্রদান করিলেন।

(৬) পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩৯ অধ্যায়ে 'সনাতন মোক্ষমার্গ ও মন্ত্রদীক্ষা'র বর্ণন-প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্রে'র মহিমা-কীর্ত্তনে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 'স্ত্রী', শূদ্র আদি এবং ইতর জাতির লোকও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এই মন্ত্র লাভের অধিকারী।—ইহার দ্বারাও স্ত্রীলোকের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রমাণিত হইতেছে।

(৭) পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৮১ অধ্যায়ে 'মন্ত্র চিন্তামণি'র উপদেশ আছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। 'স্ত্রী' শূদ্র আদি জড়, মূক, অন্ধ, পঙ্গু, হূণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুল্কস, আভীর, যবন, কঙ্ক, খশ প্রভৃতি পাপযোনি, দম্ভী, অহঙ্কারী, পাপী, পরনিন্দুক

প্রভৃতি সমস্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের এই মন্ত্রে অধিকার আছে। —ইহা দ্বারাও স্ত্রীজাতির মন্ত্রগ্রহণের অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

(৮) শিবপুরাণ উত্তরখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে 'দাশার্হ ও কলাবতী'র উপাখ্যান রহিয়াছে। তাহাতে একস্থানে কলাবতী বলিতেছেন, আমার বাল্যাবস্থায় দুর্ব্বাসা ঋষি আমাকে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র (নমঃ শিবায়) দিয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে শুভদিনে শুভক্ষণে যথাবিধি মন্ত্রশাস্ত্রের মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।

(৯) বাল্মীকীয় রামায়ণ অরণ্যকাণ্ডে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিত্তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি!' (৭৪।৯) তোমার গুরুসেবা সফল হইয়াছে ত?—ইহা দ্বারাও প্রতীত হইতেছে যে, শবরী গুরুধারণ করিয়াছিলেন।

(১০) মহাভারত আদিপর্ব্বে দেখা যায়, 'জিতেন্দ্রিয়, ব্রতশীল, উগ্রস্বভাব ও ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ' দুর্ব্বাসার নিকট হইতে কুমারী অবস্থাতে কুন্তীদেবী সূর্য্যমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তস্মৈ স প্রদদৌ মন্ত্রম্" (১১১।৬)।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কোন অধিকারী শিষ্ট পুরুষের নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা নিবার শাস্ত্রোক্ত অধিকার স্ত্রীলোকের আছে।

বেধ-দীক্ষা লাভের পর কেহ 'কর্ম্ম' প্রবণ, কেহ 'ভক্তি' প্রবণ এবং কেহ বা 'জ্ঞান' প্রবণ হয়। কুলার্ণবে—

"যথা পিপীলিকা মন্দমন্দং বৃক্ষাগ্রগং ফলম্।
চিরেণাপ্নোতি কর্ম্মোপদেশশ্চাপি তথা স্মৃতঃ ॥ ১
যথা কপিশ্চ শাখায়াঃ শাখামুল্লঙ্ঘ্য যত্নতঃ।
ফলং প্রাপ্নোতি ভক্তস্য চোপদেশ স্তথা প্রিয়ে ॥ ২
যথা বিয়দ্ গমঃ শীঘ্রং ফল এব নিষীদতি।
তথা জ্ঞানোপদেশশ্চ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৩"

(১) পিপীলিকা যেমন বৃক্ষের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে সমস্ত কাণ্ডটি অতিক্রম করতঃ বৃক্ষের অগ্রস্থ ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শক্তিপাতের পর কোন কোন শিষ্য সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড সম্পন্ন করিতে করিতে ক্রমে জ্ঞান লাভ করে।

(২) বানর যেমন লম্ফদ্বারা কোন কোন শাখা উল্লঙ্ঘন করিয়া বৃক্ষাগ্রে উঠিয়া ফল খায়; সেইরূপ কোন কোন শিষ্য ভক্তির দ্বারা ধর্ম্মের বহু শাখা অতিক্রম করতঃ সত্বর জ্ঞান লাভ করে।

(৩) পক্ষী যেমন আকাশ দিয়া উড়িয়া তৎক্ষণাৎ ফলের উপর পড়ে, সেইরূপ শক্তিপাতের পর কোন কোন শিষ্য তৎক্ষণাৎ জ্ঞান লাভ করে॥ (ইং ১৪।৬।৪১ এ এই লেখা সমাপ্ত হইয়াছিল)।

তৃতীয় অংশ

প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব

প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব

পুরাকালে মিথিলা-প্রদেশে খাণ্ডিক্য নামে কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ একজন ধর্ম্মাত্মা রাজা রাজত্ব করিতেন। অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ কেশিধ্বজ নামক অপর নরপতি (ইনি খাণ্ডিক্যের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন) তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। খাণ্ডিক্য নিজ পুরোহিত, মন্ত্রি-মণ্ডলী এবং কয়েকজন প্রভু-ভক্ত ভৃত্যসহ এক দুর্গম ভয়ঙ্কর অরণ্যে পলায়ন করিলেন। রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া রাজা কেশিধ্বজ বিবিধ যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। একদিবস তাঁহার ধর্ম্মধেনুকে এক ভয়ঙ্কর সিংহ মারিয়া ফেলিল। রাজা কেশিধ্বজ ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—'আমরা ইহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান জানি না, আপনি মহর্ষি কশেরুর নিকট জিজ্ঞাসা করুন।' রাজা মহর্ষি কশেরুর নিকটে প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভৃগু-পুত্র শুনক মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। রাজা কেশিধ্বজ শুনক মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন—'বর্ত্তমান সময়ে পৃথ্বীপর তোমার পরাজিত শত্রু খাণ্ডিক্য বিনা অপর কেহই এই প্রায়শ্চিত্ত জানেন না।' রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'হে মুনিবর! আমি এখনই তাঁহার নিকট যাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলেও

প্রায়শ্চিত্ত না বলিয়া যদি তিনি আমাকে শত্রুস্থানে মারিয়া ফেলেন, তাহাও উত্তম, আর যদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করেন, তবে ত আমি পাপমুক্ত হইব।' এই বলিয়া রাজা কেশিধ্বজ মৃগচর্ম্ম-পরিহিত যজ্ঞবেশেই একাকী রথারূঢ় হইয়া অরণ্যে খাণ্ডিক্যের নিকট উপস্থিত হইলেন।

খাণ্ডিক্য, নিজ শত্রুকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া কেশিধ্বজকে বলিলেন—'মৃগচর্ম্মের ভিতর কবচ পরিধান করিয়া ছলপূর্ব্বক আমাকে মারিবার জন্য আসিয়াছ বুঝি ? কিন্তু এরূপ ভাবিও না যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব। মূর্খ! বল ত, হরিণের পীঠও ত চর্ম্মাবৃত থাকে, কিন্তু হরিণ-শিকারে কখন তুমি কি সঙ্কোচ করিয়াছ ? তুমি আমার রাজ্যহরণকারী আততায়ী শত্রু, আজ আমার সম্মুখ হইতে প্রাণ নিয়া যাইতে পারিবে না।' এই কথা শুনিয়া, কেশিধ্বজ বলিলেন—'আপনি কৃপাপূর্ব্বক ক্রোধ পরিহার করুন। কোন সংশয় নিবারণের নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আসিয়াছি,—আপনাকে মারিবার জন্য নহে। আপনি ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া দিন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া খাণ্ডিক্য একান্তে যাইয়া নিজ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাহারা শত্রুকে অনায়াসেই বশীভূত দেখিয়া, রাজ্য-লোভে তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন। খাণ্ডিক্য কহিলেন—'আপনারা ঠিকই বলিতেছেন। পরন্তু যদি আমি এই সময়ে ইহাকে মারিয়া ফেলি, তবে পৃথিবীর আধিপত্য ত আমার হস্তগত হইবে কিন্তু পরলোক-জয় উহার হইবে। পৃথিবীর রাজত্ব সামান্য কয়দিনের মাত্র! কিন্তু

পরকাল অনন্ত সময়ের জন্য লাভ হয়। অতএব, ইহাকে মারিয়া আমি নিজের অনিষ্ট করিব না।' এই বলিয়া খাণ্ডিক্য, কেশিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ প্রদান করিলেন। কেশিধ্বজ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিজ প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন।

যজ্ঞশেষে, অবভৃথ-স্নানানন্তর কৃতকৃত্য রাজা কেশিধ্বজ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—'আমি সমস্ত ঋত্বিগ্‌দিগের যথাযথ সৎকার করিয়াছি, সদস্যদিগকে যথাবিধি সম্মানিত করিয়াছি, যাচকদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়াছি; এই সকল যথাশাস্ত্র কৃত হইলেও, আমার মনে হইতেছে যে, যজ্ঞকর্ম্মে কোন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।' বিচার করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল যে, খাণ্ডিক্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণের পর তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় নাই। তৎক্ষণাৎ রথারূঢ় হইয়া তিনি অরণ্যে খাণ্ডিক্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। খাণ্ডিক্য, পুনঃ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। কেশিধ্বজ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—'ভগবন্, ক্রোধ করিবেন না, আমি, আপনার অপকারার্থ নহে, অপিচ আপনাকে গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য আসিয়াছি। আপনার অনুগ্রহে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন কিছু গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আমাকে পূর্ণরূপে অনুগৃহীত করুন।' তচ্ছ্রবণে খাণ্ডিক্য পুনঃ নিজ মন্ত্রিবর্গের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রিগণ

বিচার করিয়া বলিলেন—'পুনরায় এই দ্বিতীয় অবসর স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সমস্ত রাজ্য গুরুদক্ষিণারূপে চাহিয়া নিন।' রাজা খাণ্ডিক্য হাসিয়া বলিলেন—'অল্প কয়দিনের জন্য পৃথিবীর রাজ্য লইয়া কি করিব ? আপনারা স্বার্থসাধনের পরামর্শ দিতে বড়ই নিপুণ পরন্তু পরমার্থ কি এবং কিরূপে লাভ হয়, তাহা আপনারা জানেন না।' এই বলিয়া কেশিধ্বজের নিকট গিয়া তিনি কহিলেন—'আমার প্রার্থনানুসারে গুরুদক্ষিণা দিতে আপনি প্রস্তুত আছেন কি ?' রাজা স্বীকার করিলে পর খাণ্ডিক্য বলিলেন—আপনার ভিতরে যদি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান থাকে তো তাহাই গুরুদক্ষিণারূপে দিন, যাহাতে সমস্ত ক্লেশ চিরতরে শান্ত হইয়া যায়।' কেশিধ্বজ বলিলেন—'নিষ্কণ্টক রাজ্য না চাহিয়া আপনি ইহা কি চাহিলেন ? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ্যলাভ অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন বিষয়ই ত নাই। খাণ্ডিক্য কহিলেন—'বুদ্ধিমান মনুষ্য রাজ্যলোভী হন না। প্রজা-পালন এবং রাজ্য-বিরোধিদিগকে 'ধর্ম্মযুদ্ধ' দ্বারা বিনাশ করা, ইহাই রাজার মুখ্য ধর্ম্ম—"ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎপ্রজাপরিপালনম্। বধশ্চ ধর্ম্ম-যুদ্ধেন স্বরাজ্যপরিপন্থিনাম্।" আমি এই উভয় কার্য্যেই নিজেকে অসমর্থ জানিতেছি, যেহেতু বিষয়ভোগের লালসা হইতেই রাজ্য-স্পৃহার উদয় হয় ; আর রাজ্য অবিদ্যার (অজ্ঞানের)ই অন্তর্ভূত। অহংতা মমতাআকুল মনুষ্যই রাজ্যপ্রার্থী হইয়া থাকে ; আমার মত বনবাসীর রাজ্যের প্রয়োজন কি ? অধিকন্তু ক্ষত্রিয় হওয়াতে আমি আপনার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিতে পারি না,—যাচনা

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।' এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক কেশিধ্বজ বলিলেন—'উপনিষদ্ বলিতেছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" অবিদ্যা অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধিজাত নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুকে অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিকূল কাম্যকর্ম্মাদি অতিক্রম করিয়া উপাসনা দ্বারা মনুষ্য ক্রমমুক্তি লাভ করেন। এই কারণে অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিবার নিমিত্ত (ইচ্ছায়। আমি রাজ্য এবং বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং ভোগ দ্বারা নিজ পুণ্যের ক্ষয় করিতেছি। পুণ্য ও অপুণ্য উভয়ই মোক্ষ-পক্ষে বন্ধন হেতু। হে কুলনন্দন! ইহা অতি সৌভাগ্যের কথা যে, আপনার মন বিবেকসম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি অবিদ্যার স্বরূপ শুনুন। সংসার-বৃক্ষের বীজভূতা অবিদ্যা দ্বিবিধা—অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি আর অনাত্মীয়তে আত্মনিশ্চয়! অবিদ্যাগ্রস্ত কুমতি জীব মোহরূপী অন্ধকারে আবৃত হইয়া এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে 'আমি' ও 'আমার' বোধ করিয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী হইতে আত্মা সর্ব্বথা পৃথক হওয়াতে, কোনও বুদ্ধিমান পুরুষই শরীরে আত্মবুদ্ধি করেন না, এবং আত্মা দেহাতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, দেহের উপভোগ্য গৃহক্ষেত্রাদিকে কোন প্রাজ্ঞপুরুষই 'আমার' মানিতে পারেন না। শরীরই যখন অনাত্মা, তখন অনাত্মা শরীর হইতে উৎপন্ন পুত্রপৌত্রদিগকে কোন্ বিদ্বান্ আত্মীয় স্বীকার করিবেন? মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম দেহেরই উপভোগের নিমিত্ত করিয়া থাকে, কিন্তু দেহই যখন আত্মা হইতে পৃথক, তখন উক্ত কর্ম্মসমূহ কেবল দেহোৎপত্তিরূপ বন্ধনেরই কারণ হয়। যেরূপ

মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহ জল ও মৃত্তিকাযোগে পরিষ্কৃত থাকে, তদ্রূপ এই পার্থিব শরীরও মৃন্ময় ; অন্ন ও জল সহায়ে স্থির রহিয়াছে। পঞ্চভূতাত্মক শরীর পাঞ্চভৌতিক পদার্থ দ্বারা পুষ্ট হয়, অতএব ইহাতে বিশেষ ভোগ্য বিষয় কি আছে? জীব, বহু সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত সাংসারিক ভোগে মগ্ন থাকায় ভোগবাসনায় বদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র মোহরূপী শ্রমই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানরূপী অস্ত্র দ্বারা বাসনাজাল ছিন্ন হইলে জীবের মোহরূপী শ্রমের শান্তি হয়। মোহ-শ্রম শান্ত হইলে পর পুরুষ স্বস্থ-চিত্ত হইয়া নিরতিশয় ও নির্ব্বাধ নির্ব্বাণ পদলাভে ধন্য হইয়া থাকে। জ্ঞানময় সুনির্ম্মল আত্মা নির্ব্বাণ-স্বরূপই, দুঃখাদি অজ্ঞানময় ধর্ম্মসমূহ প্রকৃতির—আত্মার নহে। হে রাজন্! যেরূপ স্থালী মধ্যগত জলের অগ্নির সহিত সংযোগ না হইলেও স্থালীর সংসর্গ-হেতুই জলে উষ্ণতাদিধর্ম্ম প্রকট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির সংসর্গেই আত্মা অহঙ্কারাদি দ্বারা দূষিতবৎ হইয়া প্রাকৃত ধর্ম্মসমূহ স্বীকার করেন ; প্রকৃতপক্ষে উক্ত অব্যয়াত্মা অহঙ্কারাদি হইতে সর্ব্বথা অসম্পৃক্ত।—হে রাজন্! এই আমি আপনাকে অবিদ্যার বীজ বিষয়ে সংক্ষেপে বলিলাম। এ মহা অনর্থকারিণী অবিদ্যাসৃষ্ট ক্লেশসমূহ নাশ করিবার জন্য 'যোগ' ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।"

ইহা শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহিলেন—'হে যোগবেত্তাশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কেশিধ্বজ! নিমি-বংশে আপনি যোগশাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞরূপে উদয় হইয়াছেন, অতএব অবিদ্যা-নাশকারী উক্ত যোগের বর্ণনা করুন।' কেশিধ্বজ বলিলেন—'হে খাণ্ডিক্য! যাহাতে স্থির

হইয়া ব্রহ্ম-লীন মুনিগণ পুনঃ স্বরূপচ্যুত হন না, সেই যোগবিষয়ে আমি বর্ণন করিতেছি, আপনি ধীরচিত্তে শ্রবণ করুন।—

'মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ একমাত্র মনই। বিষয়ের সঙ্গদ্বারা মন বন্ধনকারী হয় আর বিষয়সঙ্গশূন্য হইলে মোক্ষকারক হইয়া থাকে। এই কারণে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মুনি নিজ চিত্তকে বিষয়চিন্তনরহিত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তন করেন। যেমন অয়স্কান্ত মণি নিজ শক্তি প্রভাবে লৌহকে আকর্ষণ করতঃ নিজের সহিত সংযুক্ত করিয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মচিন্তন-নিষ্ঠ মুনিকে পরমাত্মা স্বভাবতঃই স্বরূপে লীন করিয়া দেন। আত্মজ্ঞানের প্রযত্নভূত যম, নিয়ম প্রভৃতির অপেক্ষাকারী মনের যে বিশিষ্ট গতি, সেই গতির ব্রহ্মের সহিত সংযোগ হওয়াই 'যোগ' নামে কথিত হয়—"আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ। তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগা যোগ ইত্যভিধীয়তে॥" যে মুমুক্ষুর যোগ এই প্রকার বিশিষ্ট ধর্ম্মযুক্ত হয়, তিনি 'যোগী' নামে অভিহিত হন। যে কালে মুমুক্ষু প্রথম প্রথম যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে 'যোগযুক্ত যোগী' বলা হইয়া থাকে এবং যখন তাঁহার পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি 'বিনিষ্পন্ন সমাধি' নামে কথিত হন। যদি কোন বিঘ্নবশ যোগযুক্ত যোগীর চিত্ত দূষিত হইয়া যায়, তবে জন্মান্তরে উক্ত অভ্যাস করিয়া তিনি মুক্ত হইয়া যাইবেন। বিনিষ্পন্ন সমাধি যোগীর যোগাগ্নি দ্বারা কর্ম্মসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তদ্ধেতু তিনি শীঘ্রই মোক্ষলাভে ধন্য হন। নিজ চিত্তকে ব্রহ্মচিন্তনের

যোগ্য প্রস্তুত করিবার সময় যোগীজনের কর্ত্তব্যব্র—হ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ পালন করন এবং সংযতচিত্তে স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ এবং তপ-নিষ্ঠ থাকা এবং মনকে নিরন্তর পরব্রহ্মে লগ্ন রাখিতে প্রযত্নশীল হওয়া। এই যম পঞ্চক ও নিয়মপঞ্চক সকামভাবে পালন করিলে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হয়, পরন্তু নিষ্কামভাবে ইহাদের সেবন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

'ভদ্রাসনাদি আসনের কোন এক আসন অবলম্বন পূর্ব্বক যম-নিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া যোগাভ্যাস করা প্রযত্নশীল যোগী-দিগের কর্ত্তব্য। অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুকে বশীভূত করার নাম 'প্রাণায়াম'। সজীব (ধ্যান এবং মন্ত্রপাঠাদি) আলম্বনযুক্ত এবং নির্বীজ (নিরালম্ব) ভেদে প্রাণায়াম দ্বিবিধ। সবীজ প্রাণায়াম অভ্যাসকারী যোগীর আলম্বন ভগবান্ অনন্তদেবের হিরণ্যগর্ভাদি স্থূলরূপ। প্রত্যাহার অভ্যাস করিবার সময় শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরক্ত স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়পঞ্চক হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া নিজ প্রাণায়াম অভ্যস্ত চিত্তের অনুগামী করিতে হয়। তৎফলে অত্যন্ত চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিয়া কোন যোগী যোগাভ্যাস করিতে পারেন না। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে এবং প্রত্যাহারযোগে ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া চিত্তকে উহার শুভ আশ্রয়ে স্থিত করা কর্ত্তব্য।'

ইহা শুনিয়া খাণ্ডিক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহাভাগ! যাহাকে আশ্রয় করিলে চিত্তের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়, চিত্তের শুভাশ্রয় তাহা কি?

কেশিধ্বজ বলিলেন—'হে রাজন্! চিত্তের সেই শুভাশ্রয় 'ব্রহ্ম'। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,—অপর ও পররূপে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ দ্বিবিধ। এই জগতে ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও উভয়াত্মক ভেদে তিন প্রকার ভাবনা আছে। সনন্দনাদি মুনিগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবনাতে যুক্ত থাকেন। দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী কর্ম্ম-ভাবনাযুক্ত, এবং স্বরূপবিষয়ক বোধ ও স্বর্গাদিবিষয়ক অধিকার-যুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বরে ব্রহ্মকর্ম্মময়ী উভয়াত্মিকা ভাবনা রহিয়াছে। হে ভূপ! যাবৎ বিশেষ জ্ঞানের হেতু কর্ম্ম ক্ষীণ না হয়, তাবৎ অহঙ্কারাদি বিদ্যমান থাকে এবং তাহার ফলে মনুষ্যের ভিতরে ও বাহিরে ব্রহ্ম ও জগতের ভিন্ন প্রতীতি হয়। যাহাতে সমস্ত ভেদ শান্ত হইয়া যায়—যেমন সমুদ্রে নদীসমূহ, যাহা সত্তামাত্র ও বাণীর অবিষয়, এবং স্বয়ং অনুভব-যোগ্য মাত্র,—তাহাকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলে—"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎসত্তামাত্রমগোচরম্। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥"—ব্রহ্মজ্ঞানই পরমাত্মা বিষ্ণুর অরূপনামক পরমরূপ এবং ইহা বিশ্বরূপ হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন)। হে রাজন্! যোগাভ্যাসী প্রথম প্রথম উক্ত পরমরূপের চিন্তন করিতে পারেন না, এই কারণে শ্রীহরির বিশ্বময় স্থূল রূপের চিন্তন করা তাহাদের কর্ত্তব্য। হিরণ্যগর্ভ, ভগবান্ বাসুদেব, প্রজাপতি, মরুদ্গণ, বসু, রুদ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও দৈত্য প্রভৃতি দেব-যোনি সমূহ; মনুষ্য, পশু, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, সম্পূর্ণ ভূত এবং প্রধান হইতে পঞ্চ-তন্মাত্রা পর্য্যন্ত এই সকলের কারণ এবং চেতন, অচেতন, একপদী,

দ্বিপদী অথবা বহুপদী প্রাণীসকল, কিম্বা চরণরহিত জীবকুল—এই সমস্তই ভগবান্ হরির ভাবনা-ত্রয়াত্মক মূর্ত্তরূপ। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ, পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর স্ব-শক্তিযুক্ত 'বিশ্ব'নামক মূর্ত্তরূপ—"এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। পরব্রহ্ম-স্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্॥" বিষ্ণু-শক্তি 'পরা' নামে, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি 'অপরা' নামে এবং কর্ম্মনামক তৃতীয় শক্তি 'অবিদ্যা' নামে কথিত। হে রাজন্! এই অবিদ্যা-শক্তি দ্বারা আবৃত থাকাতেই সর্ব্বগামিনী ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বহুবিধ সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যা-শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকা হেতুই ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি প্রাণিসমূহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। জড় পদার্থে উক্ত শক্তির বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, তদপেক্ষা অধিক বৃক্ষপর্ব্বতাদি স্থাবরে, স্থাবরাপেক্ষা অধিক সরীসৃপাদিতে, আর সরীসৃপাদি অপেক্ষা অধিক পক্ষীতে। পক্ষী অপেক্ষা অধিক মৃগে এবং মৃগাপেক্ষা পশুতে উক্ত শক্তি অধিক বিকশিত। পশু অপেক্ষা মনুষ্য ভগবানের ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি দ্বারা অধিক প্রভাবিত। মনুষ্য অপেক্ষা নাগ, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ আদি দেবগণে, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রে, ইন্দ্র অপেক্ষা প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি অপেক্ষা হিরণ্য-গর্ভে উক্ত শক্তির বিশেষ প্রকাশ। হে রাজন্! এই সমস্ত রূপ উক্ত পরমেশ্বরেরই শরীর, কেননা, এই সকল, তাঁহার শক্তি দ্বারা আকাশের ন্যায় ব্যাপ্ত।

'হে মহামতে! বিষ্ণুনামক ব্রহ্মের দ্বিতীয় অমূর্ত্ত (আকার-হীন) রূপও আছে, যোগিগণ তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন থাকেন "ধ্যায়ন্তি

যোগিনঃ”, উক্ত মূর্ত্তিকে বুধগণ ‘সৎ’ আখ্যা দেন। যাহাতে পূর্ব্বকথিত শক্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভগবানের দ্বিতীয় অমূর্ত্ত রূপ এবং ইহা বিশ্বরূপ হইতে বিলক্ষণ। ভগবানের এইরূপই স্ব-লীলাকারণ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি-চেষ্টাযুক্ত সর্ব্বশক্তিময় রূপধারণ করেন। এই সকল রূপাবলম্বনে অপ্রমেয় ভগবানের যে ব্যাপক ও অব্যাহত চেষ্টা প্রকটিত হয়, তাহা সংসারের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে,—কর্ম্মজন্য হয় না। হে রাজন্! নিজ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ বিশ্বরূপের উক্ত সর্ব্বপাপনাশক রূপের ধ্যান করা যোগাভ্যাসীর কর্ত্তব্য। যেমন বায়ুসঙ্গত অগ্নি উচ্চ শিখাযুক্ত হইয়া শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগিদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া দেন। অতএব সকল শক্তির আধার ভগবান্ বিষ্ণুতে চিত্ত স্থির করা কর্ত্তব্য,—এবং ইহাই শুদ্ধ ধারণা। “যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্ত-স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্॥ তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ। কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা॥” হে পুরুষসিংহ! প্রাগুক্ত ভাবনাত্রয়ের অতীত ভগবান্ বিষ্ণুই যোগিদিগের মুক্তির জন্য তাঁহাদের চিত্তের শুভ্র আশ্রয়। ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ চিত্তকে অন্যান্য আলম্বন হইতে নিস্পৃহ করিয়া দেয়। একমাত্র ভগবানে এইরূপে চিত্ত স্থির করাকে ‘ধারণা’ বলে।

‘হে ভূপ! বিষয়ান্তরের স্পৃহা-রহিত এবং একমাত্র পরমেশ্বর রূপেরই প্রতীতির যে অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ (ধারা), তাহাই ‘ধ্যান’ শব্দে

বিদিত ; এই ধ্যান, যম-নিয়মাদি অঙ্গষট্‌ক নিষ্পন্ন হইলেই তবে লব্ধ হইয়া থাকে। "তদ্রূপ প্রত্যয় চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥" উক্ত ধ্যেয় পদার্থের যে মন দ্বারা ধ্যানসিদ্ধ হইবার যোগ্য কল্পনাহীন (ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান-ভেদরহিত) স্বরূপ গৃহীত হয়, তাহাই 'সমাধি' নামে খ্যাত। 'তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ। মনসা ধ্যান নিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥" হে রাজন্! সমাধি-লব্ধ ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ বিজ্ঞানই প্রাপ্তব্য পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ ভাবনা-পরিশূন্য একমাত্র আত্মাই প্রাপনীয় তত্ত্ব। মুক্তি-লাভ পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা, জ্ঞান করণ। জ্ঞানরূপী করণ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের মুক্তিরূপী কার্য্য সিদ্ধকরতঃ উক্ত বিজ্ঞান কৃতকৃত্য হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া যায়। তদবস্থায় উহা ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ হইয়া পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে স্থিত হয়। ইহার ভেদজ্ঞান তো কেবল ইহার অজ্ঞান হইতেই হয়। ভেদ-উৎপন্নকারক অজ্ঞান সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া গেলে, ব্রহ্ম ও আত্মার অসৎ (অবিদ্যমান) ভেদ কিরূপে সম্ভবে? হে মহাভাগ! আপনার জিজ্ঞাসা অনুসারে এই আমি যোগের বর্ণনা করিলাম। এখন বলুন, আপনি আর কি জানিতে চান ?

খাণ্ডিক্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আপনি আমার উপর মহান্ কৃপা করিলেন। আপনার উপদেশে আমার চিত্তের সমস্ত মল নষ্ট হইল। হে রাজন্! আমি যে 'আমার' এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাও অনুচিত—অসত্য, কারণ 'আমি' ও 'আমার'

আদি ব্যবহার অজ্ঞান-কল্পিত মাত্র। পরমার্থ বস্তু ত বাণীর বিষয় নহেন, অতএব তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। যে কেশিধ্বজ আপনি এই মুক্তিপ্রদ যোগের বর্ণনা করিয়া আমার কল্যাণার্থে সব কিছুই করিয়াছেন! এখন আপনি যথেচ্ছা যাইতে পারেন। এই বলিয়া খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ নৃপতির যথাযোগ্য পূজা করিলেন। তদনন্তর রাজা কেশিধ্বজও নিজ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে যোগসাধন দ্বারা নির্ম্মল জ্ঞানলাভ করিয়া রাজা খাণ্ডিক্য ব্রহ্মে লীন হইয়া গেলেন। রাজা কেশিধ্বজও নিষ্কামভাবে বহু কল্যাণপ্রদ ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম-ক্ষয়ান্তে তাপত্রয়-নাশকারী আত্যন্তিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

———

চতুর্থ অংশ

বিমুক্তি বা মোক্ষ

বিমুক্তি বা মোক্ষ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ-অধ্যায়স্থ তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে "জনকযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে" মোক্ষোপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। বন্ধন-দশাগ্রস্ত সংসারী জীব যদিও মোক্ষ সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারে না, তথাপি শাস্ত্রানুশীলনে কোন দোষ নাই, বরং লাভ আছে, এই বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

এই কথাগুলি আলোচনার পূর্ব্বে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, আগম বা শাস্ত্র যেরূপ স্বর্গ ও সুমেরুর স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, সেরূপে কিন্তু আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না। কারণ, বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ বাচ্য-বাচকসম্বন্ধ দ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপাদনের ক্ষমতা কোন শব্দেরই নাই। অপিচ, এই আত্মতত্ত্ব হইতেছে প্রতিপাদন-কর্ত্তারই আত্মস্বরূপ বা অভিন্নরূপ। প্রতিপাদনকর্ত্তা সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়েরই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন,—সুতরাং ইহার মধ্যে পরস্পরের ভেদ বা পার্থক্য না থাকিলে, সেই প্রতিপাদন কখনই সম্ভব হয় না; কারণ, প্রতিপাদক হইল কর্ত্তা আর প্রতিপাদ্য হইল কর্ম্ম। যদি প্রতিপাদক ও প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইয়া যায়, তবে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ভেদ থাকে না, অথচ ব্যাকরণে কর্ত্তা ও কর্ম্ম স্ব স্ব প্রধান। যাহা প্রতিপাদন করিব সেই বস্তু এবং প্রতিপাদন কর্ত্তা আমি, এক বস্তু হইতেছি,—

উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই। অথচ পরস্পরের মধ্যে ভেদ না থাকিলে, প্রতিপাদন কর্ত্তা, কোন প্রতিপাদ্য বিষয়েরই প্রতিপাদন করিতে পারেন না। ইহা লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ। মোটামুটি এই কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

কথিত উপনিষদে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই অবস্থা তিনটি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া, তারপর সুষুপ্তি অবস্থাটিকে, মোক্ষের পাশাপাশি স্থাপন করা হইয়াছে। তবে মোক্ষ ও সুষুপ্তিতে এই প্রধান পার্থক্য রহিয়াছে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের বা আত্মার যে স্থিতি, ঐ স্থিতিকালে জীবের অনন্তকালের সঞ্চিত কাম-কর্ম্মরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এজন্য, লোক-প্রতীতির জন্য বলা হইয়াছে যে, মোক্ষও সুষুপ্তির ন্যায় একটি অবস্থা বিশেষ। তফাৎ এই যে, সুষুপ্তি দশায় বীজাকারে সংস্কার-মণ্ডিত বাসনা সহকৃত কামকর্ম্ম-রাশি তদীয় অন্তরালে অবস্থিতি করে,—মোক্ষ দশায়, সংসার মণ্ডিত বাসনাসহ কামকর্ম্ম থাকে না। জ্ঞানবলে ভর্জ্জিত শস্যের ন্যায় আর তাহার অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা রহিত হইয়া যায়।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন তাহার সহিতই অপর মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থের সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন অমূর্ত্ত পদার্থের সহিত কোন মূর্ত্তপদার্থের সংযোগ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। আত্মা, অমূর্ত্ত ও নিরবয়ব। সুতরাং অসঙ্গ—অসঙ্গ অর্থ, যেমন পদ্মপত্র জলে

থাকিয়াও আর্দ্র হয় না বলিয়া তাহাকে বলা হয় অসঙ্গ। তেমন আত্মা ও মূর্ত্ত পদার্থের সংশ্রবে থাকিয়াও কোনরূপে বিকৃত হয় না বলিয়া অসঙ্গ। অসঙ্গ বলিয়াই তাহাতে কর্ত্তৃত্বও আরোপ করা যায় না। কেন না দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লেষ বা সম্পর্ক বশতঃই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারিক সত্তা। পারমার্থিক সত্তা নহে। পারমার্থিক সত্তায় দ্বিতীয়াভাবে অসঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় আছে—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥

হে কুন্তীনন্দন, সর্ব্ববিকারবর্জ্জিত এই পরমাত্মা যেহেতু অনাদি ও নির্গুণ, সেই হেতু ক্রিয়াসাধন শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও কর্ম্ম করেন না, সুতরাং তাহাতে লিপ্তও হয়েন না।

আত্মা স্বভাবতঃ অসঙ্গ, সেই হেতুই, আমাদের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই স্থান ত্রয়ে ও অসঙ্গ, অসঙ্গত্ব নিবন্ধনই অমৃত। অমৃত অর্থ উক্ত স্থানত্রয়ের যাহা ধর্ম্ম বা অবস্থা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি নিষ্পাদ্য কামকর্ম্ম হইতেও আত্মা অসম্পৃক্ত। দেহ ও তৎসংযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অনাত্মধর্ম্ম; আত্মার ধর্ম্ম নহে। এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার।

আত্মার সংসার ধর্ম্মটি স্বাভাবিক নহে। ঔপচারিক। ঔপচারিক ব্যবহারের স্বভাবই এই যে,—যাহা যে বস্তু নয়,—

তাহাকে সেই বস্তুর তুল্য বলিয়া মানিয়া লওয়া। যেমন এক হাজার টাকা, আর ঐ মূল্যের একখানা নোট। নোট আর টাকা কি সর্ব্বাবস্থায়ই তুল্য মূল্য?—নোট অর্থাৎ সামান্য একখানা কাগজে যে ১,০০০ টাকার আরোপ—ইহা যেমন ব্যবহার, আত্মার প্রতি যে সংসারিত্ব আরোপ করিয়া থাকি, ইহাও তদ্রূপ ঔপচারিক ব্যবহার মাত্র। তবে অবিদ্যা প্রভাবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সর্ব্বাত্ম-ভাব আর পরিচ্ছিন্ন ভাব, এই দুইটি হইতেছে বিদ্যা ও অবিদ্যার দুই প্রকার কার্য্য। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বিদ্যা প্রভাবে হয় সর্ব্বাত্মা আর অবিদ্যা প্রভাবে হয় অসর্ব্বাত্মা। অর্থাৎ অপর যে কোন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভূত। এতদ্দ্বারা এ কথাই বলা হইল যে, অবিদ্যা সর্ব্বাত্মক আত্মাকেও অসর্ব্বাত্মকরূপে বুঝাইয়া দেয়। অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বস্তুতঃ কোন পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করে। তাহার পর সেই বিষয়ে কামনা উপস্থিত হয়, কামনা দ্বারা, অপর পদার্থ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক সত্তা অনুভব হয়! তাহার পর ক্রিয়া হইতে থাকে; সেই ক্রিয়া হইতে ফলভোগ আরম্ভ হয়।

এই যে অবিদ্যার এই প্রকার প্রকৃত তত্ত্ব ও তাহার কার্য্য দেখান গেল এবং তাহারই বিপরীত ভাবে বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বাত্মভাব বর্ণিত হইল,—এই উভয় অবস্থার দোষ গুণ বিচার করিয়া, অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সহযোগে সর্ব্বাত্মভাব সুব্যবস্থিত হইলে; রজ্জু সর্পস্থলে যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে, সর্পজ্ঞান আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি অবিদ্যাও

আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে, অবিদ্যা যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কখনও তাহা নিবৃত্ত হইত না। অতএব অবিদ্যা কখনও আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেন না যে বস্তুর যে স্বভাব, তাহার কখনও উচ্ছেদ হয় না। যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ ধর্ম্মটি, সূর্য্যের সহযোগে সমকালস্থায়ী। ইহাও তেমনি। এই কারণেই সেই অবিদ্যা হইতে আত্মার মোক্ষ উৎপন্ন হয়।

কামনা মাত্রই ভেদ-সাপেক্ষ। ভেদ-বুদ্ধিই কামনা জন্মায়। ভেদ-জ্ঞান যাহার যত প্রবল, কামনাও তাহার তত অধিক। কামী পুরুষ—(আপনা হইতে ভিন্ন) অপর বস্তুরই কামনা করিয়া থাকে, যাহার সেই ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার আর কাম্য কিছু থাকে না। যেহেতু আপনাকে কেহ কখনও কামনা করে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—সুষুপ্তি সময়ে জীব যখন পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়—দ্বৈতজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন আর তাহার কিছুই কাম্য বিষয় থাকে না। এ অবস্থায় তাহাকে 'আপ্তকাম' বলা যায়। কামনা সমূহ আত্মার ধর্ম্ম নহে। পাছে লোকে উহাকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করে, এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—"ন কংচন কামং কাময়তে" কোন কাম্য বিষয়ই কামনা করে না। এইরূপ শ্রুতি থাকা সত্ত্বেও বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্রে আত্মাকেই কামাদি ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রুতি বিরুদ্ধ যুক্তি অবশ্যই উপেক্ষণীয় এবং পণ্ডিতেরা ঐরূপ শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তিকে অসৎযুক্তি বলিয়া

নির্দ্ধারণ করেন। কারণ "নিরপেক্ষা বৈ শ্রুতিঃ" অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য নিজের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সুতরাং উহা স্বতঃ-প্রমাণ। যুক্তি যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, অগ্রে তাহার পরীক্ষার আবশ্যক হয়, উহা সত্য কিনা,—এ অবস্থায় কোন যুক্তিই স্বতঃপ্রমাণ নহে। সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি মাত্রই দুর্ব্বল। দুর্ব্বল ত কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ যুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করাও অসম্ভব নহে। সুতরাং উহাকে যুক্তি বলা যায় না, উহা যুক্ত্যাভাস,—অর্থাৎ দেখিতে যুক্তির মত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা যুক্তি নহে।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক। পরমাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে, এবং জীবাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে, তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ—

বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মা-ধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনং স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥

অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা. দ্বেষ. যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা নামক সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম— এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মার ধর্ম্ম। আবার ভর্তৃ প্রপঞ্চ নামক একজন ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন, পরমাত্মাতে দর্শন শ্রবণাদিরূপ নানাবিধ ক্রিয়ার শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে। সেই সমস্ত শক্তিই

বিভিন্নাকার বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন পরমাত্মার দৃক্-শক্তি (দর্শনশক্তি) চক্ষুঃ ও চক্ষু গ্রাহ্য রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এবং ঘ্রাণশক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে ও গন্ধরূপে পৃথক্‌ভাবে পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপ শ্রবণাদির ও পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-দেব তেমন পরিণাম ভেদ স্বীকার করেন না। তিনি দর্শনাদি ভাবগুলিকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কেবল বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ তাহার বিভেদ প্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ ধর্ম্ম বা গুণগত কোন প্রভেদ আত্মাতে নাই।

এই যে, বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের বিভিন্ন মত প্রদর্শিত হইল, ইহা উপনিষদ শাস্ত্রের মুখ্যার্থের সহিত একমত হয় না। বরং এইরূপ কল্পনা উপনিষদ শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থের বাধা ঘটায় বলিয়া কখনও উহা আদরণীয় হইতে পারে না।

যাহা হউক, আত্মার স্বয়ং দ্রষ্টৃত্ব স্বভাব কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থায়ই ব্যাহত হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ব্যাহত না হইত, তবে সুষুপ্তি সময়ে আত্মা কিছুই দেখে না কেন, কিছুই শোনে না কেন? আত্মা সুষুপ্তি সময়ে, দেখে না, ঘ্রাণ লয় না, স্পর্শ করে না, স্বাদ গ্রহণ করে না—এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সে সময়ে দেখিয়াও দেখে না। অভিপ্রায় এই যে,—আত্মা সুষুপ্তি সময়ে যে দেখে না বা শোনে না মনে করিতেছ, তাহা বুঝিও না। কারণ, যেহেতু আত্মা সে

সময়ে ও দ্রষ্টাই থাকে। সাধারণতঃ সকলেরই জানা আছে যে,—সুষুপ্তি সময়ে দর্শন সাধন চক্ষুঃ কিংবা মনের কোনও ব্যাপার থাকে না। মনের ব্যাপার চলিতে থাকিলে তাহাকে সুষুপ্তি বলা হইত না,—তাহাকে বলা হইত 'স্বপ্ন'। এজন্যই আমরা বুঝিতেছি যে, সুষুপ্তিকালে আত্মা নিশ্চয়ই দর্শন করে না। যেহেতু চক্ষু কর্ণাদি+ইন্দ্রিয় নিচয় ব্যাপার শীল কার্য্যকারী) হইলেই 'দর্শন করিতেছে,' 'শ্রবণ করিতেছে,' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অথচ কোন ইন্দ্রিয়েরই সে সময়ে কোনরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে সে সময়ে আত্মা দর্শন করে না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—সেখানে ত তখন সেরূপ কোন বস্তু নাই যাহা দর্শন করিতে পারা যায়,—অর্থাৎ যাহা দ্রষ্টার অতিরিক্ত পৃথক বস্তু, যাহা সে দর্শন করিবে। দর্শনের কারণীভূত যে অন্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ যাহা পৃথকরূপে প্রত্যুপস্থাপিত ছিল, সুষুপ্তি সময়ে সে সমুদয় একীভূত হইয়া গিয়াছে। আত্মা তখন পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টা যখন পরিচ্ছিন্নের মত হয়, তখনই তাহার দর্শনের জন্য অন্তঃকরণ প্রভৃতি করণবর্গের পৃথকভাবে থাকা আবশ্যক হয়। এ সময়ে সেই দ্রষ্টা সর্ব্বতোভাবে স্বরূপের সহিত সম্যক্‌রূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে,—এজন্য তখন আর ইন্দ্রিয় সমূহ এবং দৃশ্য বিষয় সমূহ আর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্যমান নাই। অতএব সেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় না থাকায়—সুতরাং তখন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও হয় না।

তবে যে আত্মার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রম মাত্র। স্বাভাবিক উহা সত্য নহে।

সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি ভেদ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া পরমাত্মস্বরূপ স্বীয় আত্মজ্যোতিরূপে অবস্থান করে। ইহাই আত্মার সম্প্রসাদ অর্থাৎ পরমানন্দ স্থান। শ্রুতি বলিতেছেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্"—যাহা ভূমা বা মহৎ তাহাই সুখ। পরমানন্দ স্থানই ব্রহ্মলোক। এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চদিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম॥

জগতে যাহা কাম-সুখ কামোপভোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর যাহা স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এই উভয় সুখই তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখের অর্থাৎ বৈরাগ্য-সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে।

অতঃপর ও জনক, ঋষি-যাজ্ঞবল্ক্যকে বিমোক্ষের কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছেন—তৎশ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইলেন—যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিবার সামর্থ্যাভাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা জ্ঞানদুর্ব্বলতাবশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে কিনা বিচক্ষণ রাজা সমস্ত প্রশ্ন নির্ণয়ের অন্ত বা অবসানের জন্য অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত বলিবার জন্য আমাকে আবদ্ধ করিতেছেন,—তাৎপর্য্য এই যে, আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রশ্নোত্তর নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, রাজা তৎসমস্তই মোক্ষ-প্রশ্নের এক দেশ রূপে গ্রহণ করিয়া পুনঃ

পুনঃ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত কাম-প্রশ্নচ্ছলে গ্রহণ করার উপক্রম করিতেছেন,—এই ভাবিয়া ভীত হইয়াছিলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতে লাগিলেন—

সুষুপ্তি দশা হইতে সেই আত্মা পুনরায়, যে ভাবে জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নের মধ্য দিয়া সুষুপ্তিতে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার বিপরীত ক্রমে পুনঃ জাগ্রদ্দশায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে পুনর্ব্বার জাগরণ অবস্থার মধ্যে যায়, যেমনি এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির কথা অতঃপর বলা যাইতেছে। দেহত্যাগের সময় এই লিঙ্গশরীর [অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃসূক্ষ্মং তৎলিঙ্গমুচ্যতে।—পঞ্চদশী ॥—অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে নির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীরের নাম 'লিঙ্গ শরীর'।] দেহ হইতে বাহির হয়। কোষের মধ্যে যেমন তলোয়ার থাকে, তেমন স্থূল দেহের অভ্যন্তরে এই সূক্ষ্ম শরীর থাকে, ইহাই আত্মার উপাধি। এই লিঙ্গ-শরীরোপহিত, যিনি পাপহেতু দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-বিয়োগাত্মক জন্মমরণক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকেন,—এবং যাহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাদিও উৎক্রমণ করিয়া থাকে, সেই আত্মা, স্বয়ং

জ্যোতিস্বভাব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া কাতর শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়।

প্রাণ-প্রধান লিঙ্গ শরীরই দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাতে মনে হয়, লিঙ্গ দেহোপাধিক আত্মাই যেন গমন করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মার কোনরূপ গমন বা আগমন নাই।

আত্মা কোন্ সময়ে এই দেহ হইতে গমন করে, তাহা বলা যাইতেছে। যে সময়ে জীব অধিক পরিমাণে উর্দ্ধশ্বাস যুক্ত হয়। এই সংসার এমনই কষ্টকর যে, দেহত্যাগের সময়ে মর্ম্মগ্রন্থিসমূহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহার স্মরণ-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, দুঃখ যাতনায় কাতর হইয়াও চিত্ত নিজের বশে না থাকায়, তখন তাহার হিত সাধনের চেষ্টাতেও সামর্থ্য থাকে না। এই দেহপিণ্ড, জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কাল-পক্ক আম্রফল, ডুমুরফল, অশ্বত্থফল প্রভৃতি ফলের ন্যায় নিজেই জীর্ণ হইয়া যেরূপে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়,—তেমনি ভাবে এই পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপহিত আত্মা এই সমস্ত অঙ্গ হইতে সম্প্রমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নিঃশেষ ভাবে—কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রবেশের সময় যেরূপ প্রাণ থাকিয়া যায় সেরূপে নহে, পরন্তু প্রাণ বায়ুর সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব গতির অনুরূপ ভাবে, প্রতিযোনিতে অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে, যেরূপ যোনিতে জন্ম সম্ভব হয় সেইরূপ যোনিতে গমন করে। কিসের জন্য গমন করে, না প্রাণ সমূহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্য গমন করে—অর্থাৎ দেহত্যাগের কালে পুরুষ প্রাণ সমূহ সহকারেই গমন

করে, তখন প্রাণসমূহ নিস্পন্দ থাকে। আধার ভিন্ন প্রাণের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। এজন্য পুরুষের একদেহ ছাড়িয়া দেহান্তর গমন হয় এবং ঐ দেহ দ্বারাই পুরুষের কর্ম্মফল ভোগরূপ স্বার্থ সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল প্রাণ মাত্র বিদ্যমান থাকিলেই হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—পুরুষ যে সময়ে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে সময়ে তাহার নিজের চেষ্টায় অপর দেহ ধারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, কারণ তখন তাহার স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়,—অথচ রাজার ভৃত্যগণ যেমন রাজার মৃগয়া গমন বার্ত্তা পাইয়া রাজার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তেমন এই পুরুষের ভৃত্য স্থানীয় এমন কোন বান্ধব নাই যে মৃত পুরুষের জন্য দেহান্তর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে ? এমত অবস্থায় পরলোকগামী পুরুষের দেহান্তর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় কিরূপে ?

বেশ কথা ;—তাহা বলা যাইতেছে। এই সমস্ত জগৎ পুরুষের স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের সাধনারূপে প্রাপ্ত। সেই পুরুষ স্বীয় কর্ম্মফল উপভোগের নিমিত্তই এক দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে যাইতে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং সমস্ত জগতই তখন তাহার কর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া তদীয় কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন অর্থাৎ শরীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। শ্রুতিতেও তেমন কথা আছে—"কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে"

ইতি শ্রুতেঃ—অর্থাৎ পুরুষ স্বকৃত লোকেই জন্মলাভ করে। ইহার উদাহরণ এই যে, যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের জন্য ভোগ্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি—অর্থাৎ জীবগণ যখন জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থাব মধ্য দিয়া সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন তাহার বাহ্য জগতের সহিত কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না। আবার যখন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় আসিয়া ভোগ করার আবশ্যক হয়, তখন তাহার ভোগ্যবস্তু যোগায় কে? না, জগৎ। তাহার স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং জগতই তাহার উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রী আনিয়া সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এইরূপ মৃত্যুর পরেও জগতই, জীবের কর্ম্মানুযায়ী ভোগ্য বিষয় আনিয়া উপহার দেয়। তাহা যে কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে লোক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—

যদি কোন রাজা, আপনার রাজধানী ছাড়িয়া রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হয়েন,—তখন গ্রামিক মণ্ডল প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ যেমন রাজা আসিতেছেন জানিয়া, রাজার জন্য সুপরিস্থিত বাসস্থান রচনা করিয়া নানাবিধ ভোগ্য পানীয় প্রভৃতি আহরণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—তদ্রূপ কর্ম্মফলাভিজ্ঞ সংসারীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ভূতগণ অর্থাৎ শরীর নির্ম্মাতৃগণ ও ইন্দ্রিয়াধিপাত সূর্য্যাদি দেবতাগণ উক্ত সংসারীর কর্ম্ম দ্বারা প্রোরত হইয়া, পূর্ব্বদেহের সম্পাদিত কর্ম্মফলের উপভোগ সাধন সমূহ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। "আমাদের ভোক্তা কর্ত্তা এই আসিতেছে," এইরূপ করিয়াই অপেক্ষা করিতে থাকে।

সেই আত্মা যে সময়ে এইপ্রকারে পরলোকে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হয়, সে সময়ে কাহারা তাহার সহিত গমন করে? এবং যাহারা তাহার সহিত গমন করে, তাহারা কি সেই পুরুষের প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া গমন করে, অথবা তাহারই কর্ম্মানুসারে উহারা এবং তাহার পারলৌকিক শরীর নির্ম্মাতা ভূতগণ স্বয়ংই তাহার সহিত গমন করে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—রাজার আদেশ ব্যতিরেকে ও কেবল তাহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া যেমন রাজানুচরেরা একযোগে রাজার অভিমুখে গমন করে, ঠিক সেইরূপই মৃত্যুকালে, যখন ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ জীবের ভোগোপকরণ বাক্ প্রভৃতি ঐ ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া থাকে।

জীব যখন পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করে, তখন এই পুরুষই আবার সেই দেহকে আশ্রয় করিবে। স্বপ্ন এবং জাগরণ কালেও এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লয় হয়। জাগ্রদবস্থায় আবার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই কথাই বলিতেছেন যে—পুরুষ যে সময়ে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপারহীন হয়, সেই সময়ে ভোক্তা পুরুষ অরূপজ্ঞ হয়। অর্থাৎ তখন তাহার আর রূপ বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। দেখিতেও পাওয়া যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তি ত কোনপ্রকার রূপ অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা স্বপ্ন সময়ের ন্যায় এসময়েও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজো মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যু সময়ে ইন্দ্রিয়-নিচয় স্বীয় লিঙ্গ দেহের সহিত সম্মিলিত,— একারণে

সেই সময়েই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা-সমূহের নিবৃত্তি ও প্রাণ প্রভৃতি করণ-সমূহের, হৃদয় মধ্যে একীভাবে বুঝিতে পারা যায়। চক্ষু প্রভৃতি করণবর্গ হৃদয়মধ্যে সমাহৃত হইলে পর দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত ব্যাপার হইতে থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। তখন এই হৃদয়-স্থিত রন্ধ্রের বা আকাশের অগ্রভাগ নাড়ীমুখ অর্থাৎ যে স্থান হইতে নাড়ী সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়াছে,—আত্মনির্গমনের দ্বার-স্বরূপ সেই নাড়ীমুখটি—স্বপ্ন সময়ে যেরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি সমাহরণের ফলে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ এই লিঙ্গ শরীরো-পাধিযুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা সেই প্রদীপ্ত হৃদয়াগ্র দ্বারা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আথর্ব্বণ উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে—"কস্মিন্ন্বহমুৎক্রান্ত-উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠা-স্যামীতি স প্রাণমসৃজত ইতি" অর্থাৎ প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, কে উৎক্রমণ (দেহত্যাগ) করিলে আমি উৎক্রমণ করিব এবং কে দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব,—এই ব্যবস্থার জন্য তিনি প্রাণসৃষ্টি করিলেন।

হৃদয়-মধ্যেই আত্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ সর্ব্বসময়ে সমধিক অভিব্যক্ত থাকে, এবং সেই হৃদয়-প্রধান সূক্ষ্ম-শরীররূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃই আত্মার জন্ম, মরণ, গমন, আগমন প্রভৃতি বিকারাত্মক সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার করণ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দ্বাদশ প্রকার করণ অর্থাৎ আত্মার ভোগ-সাধন ঐ লিঙ্গ দেহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত থাকে এবং তাহাই সর্ব্বপ্রাণীতে

সেই আত্মা যে সময়ে এইপ্রকারে পরলোকে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হয়, সে সময়ে কাহারা তাহার সহিত গমন করে? এবং যাহারা তাহার সহিত গমন করে, তাহারা কি সেই পুরুষের প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া গমন করে, অথবা তাহারই কর্ম্মানুসারে উহারা এবং তাহার পারলৌকিক শরীর নির্ম্মাতা ভূতগণ স্বয়ংই তাহার সহিত গমন করে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—রাজার আদেশ ব্যতিরেকে ও কেবল তাহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া যেমন রাজানুচরেরা একযোগে রাজার অভিমুখে গমন করে, ঠিক সেইরূপই মৃত্যুকালে, যখন ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ জীবের ভোগোপ-করণ বাক্ প্রভৃতি ঐ ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া থাকে।

জীব যখন পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করে, তখন এই পুরুষই আবার সেই দেহকে আশ্রয় করিবে। স্বপ্ন এবং জাগরণ কালেও এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লয় হয়। জাগ্রদবস্থায় আবার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই কথাই বলিতেছেন যে—পুরুষ যে সময়ে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপারহীন হয়, সেই সময়ে ভোক্তা পুরুষ অরূপজ্ঞ হয়। অর্থাৎ তখন তাহার আর রূপ বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। দেখিতেও পাওয়া যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তি ত কোনপ্রকার রূপ অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা স্বপ্ন সময়ের ন্যায় এসময়েও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজো মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যু সময়ে ইন্দ্রিয়-নিচয় স্বীয় লিঙ্গ দেহের সহিত সম্মিলিত,— একারণে

সেই সময়েই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা-সমূহের নিবৃত্তি ও প্রাণ প্রভৃতি করণ-সমূহের, হৃদয় মধ্যে একীভাবে বুঝিতে পারা যায়। চক্ষু প্রভৃতি করণবর্গ হৃদয়মধ্যে সমাহৃত হইলে পর দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত ব্যাপার হইতে থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। তখন এই হৃদয়-স্থিত রন্ধ্রের বা আকাশের অগ্রভাগ নাড়ীমুখ অর্থাৎ যে স্থান হইতে নাড়ী সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়াছে,—আত্মনির্গমনের দ্বার-স্বরূপ সেই নাড়ীমুখটি—স্বপ্ন সময়ে যেরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি সমাহরণের ফলে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ এই লিঙ্গ শরীরো-পাধিযুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা সেই প্রদীপ্ত হৃদয়াগ্র দ্বারা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আথর্ব্বণ উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে—"কস্মিন্ন্বহমুৎক্রান্ত-উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠা-স্থামীতি স প্রাণমসৃজত ইতি" অর্থাৎ প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, কে উৎক্রমণ (দেহত্যাগ) করিলে আমি উৎক্রমণ করিব এবং কে দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব,—এই ব্যবস্থার জন্য তিনি প্রাণসৃষ্টি করিলেন।

হৃদয়-মধ্যেই আত্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ সর্ব্বসময়ে সমধিক অভিব্যক্ত থাকে, এবং সেই হৃদয়-প্রধান সূক্ষ্ম-শরীররূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃই আত্মার জন্ম, মরণ, গমন, আগমন প্রভৃতি বিকারাত্মক সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার করণ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দ্বাদশ প্রকার করণ অর্থাৎ আত্মার ভোগ-সাধন ঐ লিঙ্গ দেহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত থাকে এবং তাহাই সর্ব্বপ্রাণীতে

অনুস্যূত, তাহাই জীবন এবং তাহাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের অন্তরাত্মা।

আত্মা সেই হৃদয়াগ্র-প্রকাশের সাহায্যে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় যে পথে নির্গত হয়, এখন তাহা বলা যাইতেছে। আদিত্য লোক প্রাপ্তির উপযুক্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে সে চক্ষুপথে নিষ্ক্রান্ত হয়। যদি কাহারও ব্রহ্মলোক লাভের উপযুক্ত সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে নিষ্ক্রান্ত হয়, কিম্বা মৃত ব্যক্তির জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে যেখানে তাহার গমনের সম্ভাবনা হয়, তন্নিয়মানুসারে অপরাপর দেহাবয়ব পথেও নিষ্ক্রান্ত হয়। সেই বিজ্ঞাতা জীব যখন উৎক্রমণ করে, অর্থাৎ পরলোকের উদ্দেশে প্রস্থান করে, তখন দৈহিক প্রাণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করে এবং সেই প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময়ে বাক্ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণই সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করিয়া থাকে।

এখানে যাহা বলা হইল, প্রধানের অনুগমন বা অনুসরণ-পদ্ধতি জ্ঞাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু দলবদ্ধ ব্যক্তিরা যেমন ক্রমশঃ পর পর গমন করিয়া থাকে, সেরূপ গতিক্রম বা পারম্পর্য্য প্রকাশ করা অভিপ্রেত নহে। সে সময়ে এই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ হয় অর্থাৎ স্বপ্ন সময়ের ন্যায় সে সময়ে ও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই তাহার বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ পায়। কিন্তু তখন তাহার সেই বিজ্ঞানের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যদি তাৎকালিক বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিত, তবে জীব নিশ্চয়ই

কৃতার্থ হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ ভাব ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভবাভাবিতঃ।

অর্থাৎ—মানুষ সারা জীবন যে বিষয়ে অনুরাগী থাকিয়া নিরন্তর ভাবনা করে, সেইরূপ তীব্র ভাবনার ফলে মন তন্ময়তা লাভ করে. মৃত্যু সময়ে তাহার সেই চিন্তাই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুকালীন সেই ভাবনায় মুমূর্ষুর ভবিষ্যৎ গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মৃত্যু সময়ে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, পরলোকেও তাহার সেইরূপই জন্ম ও অবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

মৃত্যু সময়ে জীবের কর্ম্মানুসারে অন্তঃকরণ মধ্যে বিভিন্নাকার বৃত্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বাসনাময় সেই সমুদয় বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সমস্ত লোকই সে সময় বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই বিজ্ঞানের সহিতই গন্তব্য স্থানে গমন্ করে, অর্থাৎ মরণ-সময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যেরূপ গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, মুমূর্ষু জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব যাহারা পরলোকে হিত চাহে. তাহাদের পক্ষে মৃত্যু সময়ে স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা ও সাবধানতা সহকারে যোগানুষ্ঠান, পরিসংখ্যান বা তত্ত্ব-বিবেকাভ্যাস ও উত্তম পুণ্য সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক এবং সমস্ত শাস্ত্রের সার গ্রহণ করা এবং যাহা হইতে নিবৃত্তির উপদেশ

দিয়াছেন, বিশেষ আগ্রহসহকারে সেই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকাও আবশ্যক।

কারণ মৃত্যু সময়ে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, দারা প্রভৃতি কেহই কোন উপকার করিতে পারে না, কেবল স্বীয় কর্ম্মরাশিই তাহার সঙ্গী হয়। তখন জীবের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, সুতরাং সে সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি কোনমতেই আপনার অভিপ্রায়-অনুযায়ী কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। জীবের সম্ভাবিত এই অনিষ্ট প্রশমনের নিমিত্তই সমস্ত উপনিষদ্ সচেষ্ট। এই উপনিষদ্ বিহিত উপায়ানুষ্ঠান ব্যতীত এমন কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই, যাহা দ্বারা উক্ত অনর্থ রাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে।

আত্মা যখন পরলোকে প্রস্থানোদ্যত হয়, তখন বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। এখানে বিদ্যা অর্থে বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বিহিত বিদ্যা—দেহ-আত্মাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান। প্রতিষিদ্ধ—নগ্ন স্ত্রী দর্শনাদি। অবিহিত—ঘট পটাদি লৌকিক বস্তু বিষয়ক জ্ঞান; অপ্রতিষিদ্ধ—পথিমধ্যস্থ তৃণাদি স্পর্শ; তদ্রূপ বিহিত কর্ম্ম—যাগ যজ্ঞাদি; প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান প্রভৃতি; অবিহিত কর্ম্ম—পরস্ত্রী সংসর্গাদি। অপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—নেত্র সংকোচ বিকাশাদি; পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করা হইয়াছে, বর্ত্তমান

জন্মে সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ করিতে হয়, সেই ফলানুভব হইতে আবার একপ্রকার বাসনা বা সংস্কার সৃষ্টি হয়—সেই ফলানুভবজনিত বাসনাই এখানে 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ।

এই যে উপরে বাসনার কথা বলা হইল, এই বাসনাই জীবের অদৃষ্ট-জনিত কর্ম্মের এবং কর্ম্মফল-ভোগের প্রারম্ভে অঙ্গ বা সহায়। এইজন্য জীবের প্রয়াণ-সময়ে সেই বাসনা ও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। এই বাসনার সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কিংবা ফলভোগ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। কারণ যে বিষয়ে কখনও অভ্যাস হয় নাই, অর্থাৎ যে বিষয়ে অভ্যাসজনিত সংস্কার নাই, সেই বিষয়ে কখনও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হইতে পারে না। অথচ পূর্ব্ব-জন্মকৃত অনুভবানুসারে, বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সমূহের ইহজন্মে অভ্যাস না থাকিলেও যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা করিতে দেখা যায়। কোন কোন লোকের ঐহিক অভ্যাস ব্যতীত ও চিত্র কর্ম্মাদি কোন কোন ক্রিয়ায় জন্ম হইতেই পটুতা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন লোকের অতি সহজসাধ্য কার্য্যেও অত্যন্ত অপটুতা লক্ষ্য হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে, এ সমস্তই প্রাক্তন সংস্কারের প্রাদুর্ভাব ও অপ্রাদুর্ভাবের ফল। অর্থাৎ যাহার যে কার্য্যে প্রাক্তন সংস্কার থাকে, সে কার্য্যে তাহার আপনা হইতেই দক্ষতা জন্মে, আর যাহার সেরূপ সংস্কার নাই, সহস্র চেষ্টায় ও তাহার সেই কার্য্যে দক্ষতা জন্মে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাক্তন

সংস্কার না থাকিলে কোন প্রকার কর্ম্ম কিংবা ফলভোগে কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিদ্য, কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞাই পারলৌকিক দেহান্তর প্রাপ্তি ও ফলভোগের প্রধান সহায়। সেই হেতু বিদ্যা, কর্ম্ম প্রভৃতি বাহা করিবে। যাহাতে অভীষ্ট দেহ-প্রাপ্তি ও অভিমত ভোগ-সম্পত্তি সম্পন্ন হইতে পারে।

অনন্তর দেহান্তর প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি বলা যাইতেছে। আতিবাহিক দেহই লোকান্তর গমনের সহায় বা আশ্রয়। জীব মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক দেহের আশ্রয় লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় আতিবাহিক নামে আরও একটি দেহ আছে, সেই দেহও স্থূলই বটে, তবে বায়বীয় (বায়ুর ভাগ অধিক) বলিয়া ইহা সাধারণের প্রত্যক্ষ হয় না। মৃত্যুকালে জীব সেই দেহে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী গন্তব্য স্থানে গমন করে। জীবকে বহন করিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যায় বলিয়া এই দেহের নাম আতিবাহিক। অভীষ্ট স্থানে যাইয়া ভোগায়তন দেহ-প্রাপ্তির পর এই দেহ আর থাকে না। বলা আবশ্যক যে, এই আতিবাহিক দেহে কোন প্রকার স্থূলভোগ সম্বন্ধ থাকে না; স্থানান্তর স্থাপনই ইহার একমাত্র কার্য্য। আতিবাহিক দেহে স্থূলভোগ সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া প্রেতেরা স্থূল শরীরের সাহায্য লাভ করিয়া ভোগ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকে। পরলোকগামী আত্মা আনিবার জন্য এখন নানাবিধ উপায়

অবলম্বিত হইতেছে,—ঐ সকল আত্মার আতিবাহিক দেহ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবের কর্ম্মানুসারে অপর দেহ ধরাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত আতিবাহিক দেহের কর্ম্ম। যেই জীব প্রকৃষ্ট দেহ ধারণ করিল,—তন্মুহূর্ত্তে আতিবাহিক দেহেরও অস্তিত্ব বিনাশ ঘটিল। প্রেতদিগের আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি হইলেই বুঝিতে হইবে, তাহাদের প্রেতত্ব দূর হইয়াছে। সেই সকল প্রেতাত্মারা শত আহ্বানেও আসিবে না বা আসিতে পারে না। যেহেতু তাহাদের প্রেতত্ব দূর হইয়া আতিবাহিক দেহ লাভ হইয়াছে।

যে আত্মা এইরূপে পরলোকে প্রয়াণ করে, সেই আত্মা ব্রহ্মই—পরমাত্মাই—যিনি অশনয়াদি ধর্ম্মের অতীত ; সেই আত্মা বিজ্ঞানময়.—বুদ্ধিতে লক্ষিত হয় বলিয়া আত্মা বিজ্ঞানময়। মনের সহিত সান্নিধ্য থাকায় আত্মা মনোময়, পঞ্চবৃত্তি সমন্বিত প্রাণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মা তন্ময় হয়, এইরূপে দর্শনকালে চক্ষুর্ম্ময়, এবং শব্দ শ্রবণ সময়ে শ্রোত্রময়—এইপ্রকার যখন যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারে বুদ্ধিও প্রাণের সাহায্যে আত্মা চক্ষু প্রভৃতি করণবর্গের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া শেষে শরীরোৎপাদক পৃথিবী প্রভৃতি ভূতময় ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পার্থিব শরীরোৎপত্তিতে আত্মা পৃথিবীময় হয়, জলীয় শরীর সৃষ্টিতে আপোময় হয়, বায়বীয় শরীর সৃষ্টিতে বায়ুময় হয়, আকাশাত্মক শরীরোৎপত্তিতে আকাশময়, তৈজস দেবশরীর সৃষ্টিতে তেজোময়,

এতদ্ভিন্ন পশুপক্ষীর শরীর এবং নরক ও প্রেতাদি শরীর অতেজোময়। যাহারা বন্ধ ও মোক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদি সহকৃত পুণ্য পাপই জীবের শরীর গ্রহণের কারণ। সত্য, তথাপি কামনার প্রেরণায়ই লোক পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কামনা পরিত্যাগ করিলে, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও পুণ্য বা পাপ জন্মায় না। পক্ষান্তরে পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত থাকিলেও যদি কামনা-রহিত হয়, তাহা হইলে ঐ পুণ্য ও পাপ কোনরূপ ফলজনক হয় না। অতএব প্রকৃত পক্ষে কামনাই সংসার প্রাপ্তির মুখ্য কারণ।

জীবের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ফলের জনক। কামনা তাহার সহকারী, কিন্তু কামনা সহকারী হইলেও ফলোৎপাদনে তাহারই প্রাধান্য। তণ্ডুল যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়াও তূষরহিত হইলে, অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না—এইজন্য তূষ নিজে অঙ্কুরোৎপাদক না হইলেও, অঙ্কুরোৎপাদনের প্রধান সহায়। এইরূপ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম ফলজনক হইলেও কামনাই তাহার প্রধান অবলম্বন। কামনার অভাবে কোন কর্ম্মই ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। এজন্যই নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে, ঐ সকল কৃতকর্ম্ম দ্বারা অনুষ্ঠাতা সংসারে আবদ্ধ হয় না। এতৎ সম্বন্ধে আথর্ব্বণ শ্রুতি এই যে,—"কামান্ যঃ কাময়াতে মন্যমানঃ স কর্ম্মভির্জায়তে তত্র তত্র"। যে লোক অভিনিবেশ সহকারে বিবিধ কাম্য বিষয়

কামনা করে, সেই লোক, সেই কামনানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করে।

পুরুষের মৃত্যুকালে কাম্য বিষয়ে অভিলাষ সমুদ্বুদ্ধ হওয়ায়, মৃত্যুর পর সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের সহিত ফলাভিলাষী হইয়া পুরুষ যে কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই কর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গেই সেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। যে প্রাপ্ত হয় সে কে ? না, লিঙ্গ-দেহ। লিঙ্গ-শরীরের মধ্যে মনই প্রধান। সেই মন যে বিষয়ে নিবক্ত অর্থাৎ নিঃসংশয়িতরূপে আসক্ত থাকে, তদনুকূল কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেইহেতু মন তাদৃশ আসক্তি-ফলেই আচরিত কর্ম্ম দ্বারা সেই অভিনিবিক্ত ফল লাভ করে। এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কামনাই সংসার প্রবৃত্তির মূল কারণ। এজন্য নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিবিধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিয়াও ফল প্রসবে সমর্থ হয় না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে,—"পর্য্যাপ্ত-কামস্ত কৃতাত্মনশ্চ ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ"। যাহার কামনা পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই কৃতার্থ পুরুষের সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায়।

এখানে আরও একটু কথা স্মরণ করা আবশ্যক যে, সকাম পুরুষই এই প্রকারে সংবরণ করে, কামনাহীন পুরুষ কোথাও গমন করে না। কেননা যে ব্যক্তি ফলাসক্ত, তাহার পক্ষেই পারলৌকিক গতি সম্ভব হয়,—কাজেই বুঝিতে হইবে যে কামনাবিহীন পুরুষের লোকান্তর গতি সম্ভব হয় না। সে নিশ্চয়ই

বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত অর্থ, কর্ম্ম বন্ধন হইতে অব্যাহতি বা নিষ্কৃতি লাভ।

যাহার নিকট হইতে সমস্ত কামনা দূর হইয়াছে, তিনিই 'অকাম'। যিনি সমস্ত কাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই 'আপ্তকাম'। যাহার অপর কোনও বস্তু প্রার্থনীয় নাই, আত্মাই একমাত্র কাম্য, বাহ্যাভ্যন্তর ভাববিহীন পরিপূর্ণ প্রজ্ঞানৈক রস আত্মাই যাহার সমস্ত, ঊর্দ্ধে, অধে ও পার্শ্বে আত্ম-ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই যিনি দেখিতে পান না,—এরূপ অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তাঁহার আর কাম্যবস্তু কি থাকিতে পারে ?

আপনা ছাড়া কোন পদার্থ প্রতীতিগম্য হইলেই তদ্বিষয়ে কামনা হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ত আর সেরূপ ভেদ-দর্শনের সম্ভাবনাই থাকে না। তখন তিনিই বিমুক্ত হন। যাঁহার আত্মাই সর্ব্বময় হইয়া যায়, তাহার পক্ষে কখনও অনাত্ম কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। আত্ম-ব্যতিরিক্ত অন্য কাম্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে "সর্ব্বঞ্চাত্মৈবাভূৎ" সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, এই যে, শ্রুতি রহিয়াছে,—তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব এই রূপ সর্ব্বাত্মদর্শীর অন্য কোনও কাম্য পদার্থ না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান উপপন্ন হয় না।

আমরা কিন্তু তাহাকেই 'ব্রহ্মবিদ্' বলিয়া জানি যিনি নিত্যই অশনায়া—পিপাসাদি সংসার ধর্ম্মের অতীত ও পাপের সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই

আপনাকে সর্ববপ্রকার সংসার ধর্ম্মাতীত আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, এবং আপনার অতিরিক্ত ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য অন্য কোন পদার্থ দর্শন করেন না। কর্ম্ম কখনই তাহাকে স্পর্শ করে না। অতএব কামনা না থাকায় অকামময়মান পুরুষ কখনও পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না, দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিমুক্ত হয়।

এবংবিধ পুরুষের কর্ম্ম সম্ভব হয় না। তন্নিবন্ধন পরলোকেও গতি হয় না। এখানে স্মরণ করা উচিত যে, যাহাদের পরলোক গমন আকাঙ্খিত বা কর্ম্মবশাৎ অবশ্যম্ভাবী, তাহাদের জন্যই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে,—কিন্তু যাহারা অকায়মান তাহাদের দেহপাতের পরই সমস্ত বন্ধন কাটিয়া যায়,—সুতরাং পরলোকে যাওয়া তাহাদের প্রয়োজনাভাব, সুতরাং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও নিরর্থক। এজন্য যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাই।

ঐ যে বিদ্বান্ পুরুষ, যাহার প্রাণ সমূহ এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ দেহ হইতে উর্দ্ধগামী হয় না, সেই বিদ্বান্ জ্ঞানী পুরুষ, আত্ম-কামত্ব-নিবন্ধন, এখানেই ব্রহ্মস্বরূপ হন।

এবং-ভূত পুরুষ যে কিরূপে মুক্তিলাভ করেন, তাহা বলা যাইতেছে। যে লোক সুষুপ্তি অবস্থাপন্নের ন্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত নিত্য চৈতন্য জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) দর্শন করেন, সেই অকালয়মান পুরুষের, কর্ম্মাভাব বশতঃ গমনের কারণ

বিলুপ্ত হওয়ায়, বাক্ প্রভৃতি প্রাণ সমূহ ঊর্দ্ধগামী হয় না। পরন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের ন্যায়ই দৃষ্ট হন সত্য, তথাপি এখানেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই ব্রহ্মই হইয়া যান। যেহেতু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন অব্রহ্মভাবের হেতুভূত কামনাসমূহ বিদ্যমান থাকে না, সেই হেতু ইহজন্মেই তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রবুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না। কেন না জ্ঞানীর যে মৃত্যুর পর অন্য ভাব প্রাপ্তি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে জীবদবস্থা হইতে কোনও স্বতন্ত্র অবস্থা নহে। পরন্তু অজ্ঞ লোকের মৃত্যুর পর যেমন দেহান্তর সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাঁহার সেরূপ হয় না।

এখানে এ কথার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক যে,—ব্রহ্মবিদের মুক্তি দুই প্রকারে হইতে পারে। এক—দেহ সত্বে বর্ত্তমান জন্মে। আর দেহপাতের পর বিদেহমুক্তি। ইহজন্মেই যাহার ব্রহ্মভাব করামলকবৎ প্রত্যক্ষানুভূত হইয়াছে, ভেদদৃষ্টি ও তন্মূলীভূত অজ্ঞান আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার মুক্তিতে আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না। এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ মুক্তি সম্পন্ন হয়। শ্রুতি আছে, "তস্য তাবদেব চিরম্ যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে।"; "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"। আর যাহার ব্রহ্মভাব সেরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, তাহার মুক্তি দেহপাতের পরে হয়, উভয়ের মধ্যে এই বিশেষত্ব রহিয়াছে। জীবন্মুক্ত ও ও নির্ব্বাণমুক্ত উভয়ই জ্ঞানস্বরূপ ; ইহাদের পরস্পর ভেদ নাই।

মুক্ত পুরুষদিগের পরমার্থ দৃষ্টি সদেহ মুক্তি বা বিদেহ মুক্তির উপর নাই, কিন্তু দ্বৈতহীন জীব ব্রহ্মের অভেদই পরমার্থ দৃষ্টির বিষয়ীভূত।

মোক্ষ যদি অবস্থান্তর প্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে 'সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত যে মোক্ষের আত্মৈকভাব বা কৈবল্য-রূপতা তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু ঐরূপ হইলে মোক্ষের অনিত্যত্ব দোষ ও আপতিত হয়। যেহেতু যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, কোথাও তাহার নিত্যত্ব দেখা যায় না। অথচ সকলেই মোক্ষকে 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করে। "এষ নিত্যো মহিমা'— ইহা আত্মার নিত্য মহিমা বা ঐশ্বর্য্য, এই মন্ত্রবাক্য ও এ বিষয়ে প্রমাণ। স্বভাব-সিদ্ধ আত্মভাবাতিরিক্ত অন্য প্রকার নিত্য বস্তু কেহ কল্পনা করিতে পারে না। মোক্ষ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উহা নিশ্চয়ই অগ্নির উষ্ণতা ধর্ম্মের ন্যায় আত্মার ও স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই স্বভাবকে কখনই লোকের ক্রিয়ানুগত ও ক্রিয়াসাধনও বলিতে পারা যায় না। কেন না অগ্নির উষ্ণতা কখনই অগ্নির কোনরূপ ক্রিয়ার পরভাবী (ব্যাঘাতক) হয় না।

পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন অবস্থার নাম 'মোক্ষ'। যেহেতু "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"। এই শ্রুতিই সেই একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এ জন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,—রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি বিষয়ক যে ভ্রান্তি, ঐ ভ্রান্তি নিবৃত্তির পর যেমন

সর্পাদি নিবৃত্তি হয়, তেমনি, শুধু অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই তাহাকে মোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সংসার ও মোক্ষ এই উভয় অবস্থায়ই যদি আত্মা নির্বিবশেষ একরূপ হয়, তাহা হইলে মোক্ষের জন্য আর কাহারও অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না এবং মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিরও কোন সার্থকতা থাকে না। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না,—কারণ, অবিদ্যা-জনিত ভ্রম দূরীকরণ জন্য ঐ সকল শাস্ত্রগুলির সার্থকতা রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে মুক্তি ও অমুক্তি নিবন্ধন আত্মার কিছুমাত্র স্বরূপ বৈলক্ষণ্য হয় না বটে, কারণ আত্মা নিত্যই একরূপ (পরিবর্ত্তন রহিত), তবে এইমাত্র বিশেষ যে, শাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা, আত্মবিষয়ক বিদ্যালাভের অন্তরায় স্বরূপ যে অবিদ্যা, তাহা দূরীভূত হয়। অতএব অবিদ্যানাশের জন্য, ঐরূপ উপদেশ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টারও আবশ্যক হয়। বিশেষতঃ বহুতর ব্যাপার সংস্পর্শেই অবিদ্যা ভ্রম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ বিষয়াকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি জন্মে, পরে তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার পর আমি সংসারী ইত্যাদি ভ্রান্তিজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং অবিদ্যা ভ্রমের কারণ যে বহু, তাহাতে আর সংশয় নাই। কেবল এই জন্যই আত্মগত তাদৃশ অবিদ্যাকে স্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ যাহা স্বাভাবিক, তাহার কখন স্থিতি, কখন বিলয় এরূপ অবস্থা হইতে পারে না। যে লোক অবিদ্যাজনিত ভ্রমকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পৃথক ভাবে দর্শন করিতে পারে, সে লোক নিশ্চয়ই অবিদ্যা-জনিত ভ্রম সম্পন্ন নহে।

সর্ব্বদা সমান, একরূপ, অদ্বৈত, অবিক্রিয়, জন্ম, জরা ও মরণ বর্জ্জিত, অমৃত, অক্ষয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া থাকি। অতএব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে দেহেতে যে অহম্ ভাবরূপ বিপরীত বুদ্ধি থাকে, ব্রহ্মবিজ্ঞান, সেই বিপরীত বুদ্ধি অপনয়ন করিয়া দেয়,—সেই দেহ-বিচ্ছেদরূপ, বিজ্ঞানফল লক্ষ্য করিয়া "ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র।

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসার বর্ণিত হইয়াছে, সংসারের হেতুরূপ যে, কর্ম্ম, বিদ্যা ও পূর্ব্ব-প্রজ্ঞা তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মাকে যে সমস্ত উপাধি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীব নিজের সংসারিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সে সমুদয়ও কথিত হইয়াছে, তাহার পর ধর্ম্মাধর্ম্মই যে সেই সমুদয় উপাধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজক বা প্রবর্ত্তক তাহার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া পরিশেষে কামনারই মুখ্য প্রয়োজকত্ব অবধারিত হইয়াছে। অতঃপর সর্ব্বজনবিদিত সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার সর্ব্বাত্মভাব মোক্ষ উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যাই মুক্তির মুখ্য কারণ। অতএব পূর্ব্বে যদিও কামকে সংসারের মূল কারণ বলা হইয়াছে সত্য, তথাপি মোক্ষ-কারণের বিপরীত বস্তুই যখন বন্ধের কারণ, তখন অবিদ্যাও যে বন্ধের অপর কারণ, এ কথাও এক রকম বলাই হইয়াছে। অনন্তর মোক্ষের দৃঢ়তা প্রতিপাদক বাক্য বলা যাইতেছে।

ঐহিক বা পারলৌকিক পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোকৈষণা নামে প্রসিদ্ধ যে সমুদয় কাম, এই পুরুষের হৃদয়ে আশ্রিত অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে,—আত্মকাম ব্রহ্মবিদের দেহ মরণ-ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও সমূলে কাম-নিবৃত্তি হওয়া হেতু,—তখন অমৃত হয়। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে, অবিদ্যামূলক অনাত্ম-বিষয়ক যে কামনা, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। অতএব অবিদ্যারূপ মৃত্যু বিধ্বস্ত হওয়ায় বিদ্বান পুরুষ জীবৎ দশায়ই অমৃত হইয়া থাকেন, এখানে অর্থাৎ এই শরীর মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াই ব্রহ্মভোগ করেন।—ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে, মোক্ষ কখনও দেশান্তর গমনের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ দেশান্তরে যাইয়া যে মোক্ষলাভ করিতে হইবে, এ কথা হইতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। যে ভাবে ছিল, ঠিক্ সেই ভাবেই স্বকারণীভূত পুরুষে (আত্মায়) বিলয় প্রাপ্ত হয়। কেবল নাম মাত্র তাহার অবশিষ্ট থাকে,—অর্থাৎ মুক্তপুরুষের দেহ ত্যাগ হইলে, ঐহিক সমস্তই ফুরাইয়া যায়, কেবল তাহার নামটী মাত্র জগতে থাকিয়া যায়।

ভাল কথা, প্রাণ-সমূহ বিলীন হইয়া গেলে, এবং দেহও স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হইলে, মুক্ত বিদ্বান পুরুষ, এখানেই সর্ব্বাত্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেহীত্ব (সংসারিত্ব) লাভ করে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, সর্পের

খোলস অনাত্মভাবে পরিত্যক্ত হইয়া যেমন বর্ত্তমান থাকে, ঠিক্ এই রূপই এই শরীর সর্প-স্থানীয় মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক অনাত্মভাবে পরিত্যক্ত হইয়া "ইহা আমি বা আমার নহে" এই জ্ঞানে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের দেহে সর্প পরিত্যক্ত খোলসের ন্যায় আত্মবুদ্ধি থাকে না। তিনি সেই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও অশরীরীই থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় আর শরীরাভিমানী হন না। কেন না, পূর্ব্বে যে তাঁহার স্বশরীরত্ব ও মর্ত্ত্যত্ব ছিল, কামকর্ম্মজনিত শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ। মুক্ত হওয়ায় এখন তাঁহার কামনার অবসান হইয়াছে, কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কাজেই তিনি অশরীরী। এই কারণেই তিনি অ-মৃত।

সম্রাট জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির নিকট মোক্ষ বিষয়ক এই সমস্ত উপদেশ পাইয়া বলিলেন,—আপনি আমাকে বিমুক্তি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়া মুক্তি লাভের সাহায্য করিয়াছেন, অতএব পূজনীয় আপনাকে বিদ্যার মূল্যস্বরূপ সহস্র গো দান করিতেছি। এবংবিধ পথ—মোক্ষ-সাধন জ্ঞানমার্গ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আমা দ্বারা লব্ধ হইয়াছে, কেন না যাহা লব্ধ হয়, সেই লব্ধ বস্তু লাভকর্ত্তাকে যেন স্পর্শই করিয়া থাকে, সেই হেতু উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা আমা দ্বারা লব্ধ হওয়ায়, আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, বলা হইতেছে। আমি যে ইহা কেবল লাভই করিয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু আমি নিশ্চয়ই ইহার অনুবেদন করিয়াছি। ভোজন বলিলে যেমন উদর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি পর্য্যন্ত

বুঝায়, তেমনি এখানে অনুবেদন অর্থে বিদ্যার পরিপক্কতা অনুসারে ফলের চরম অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রথমে মাত্র জ্ঞান-প্রাপ্তির সম্বন্ধ মাত্র ছিল, এখন তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল, ইহাই উভয়ের মধ্যে বিশেষ।

ধীর—অর্থাৎ উত্তম জ্ঞান-সম্পন্ন অপরাপর ব্রহ্মবিদগণও এই ব্রহ্মবিদ্যাপথে জীবদবস্থায়ই মুক্তিলাভ করেন। শেষে দেহপাতের পর, ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলোক গমন করেন। যদিও স্বর্গ শব্দ সাধারণতঃ সুরলোকবাচক, তথাপি এখানে, প্রকরণানুসারে (বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্মার্থানুসারে) মোক্ষই ইহার প্রতিপাদ্য অর্থ।

ইহাই মোক্ষ পথ, যাহা মুমুক্ষুর আত্ম-বিষয়ক কামনা দ্বারা আপ্তকামত্ব নিবন্ধন, সমস্ত কামনা ক্ষয় হইলে পর প্রদীপ নির্ব্বাণের ন্যায় চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় এখানেই বিলীন হইয়া যায়। এই জ্ঞানমার্গই সেই পথ। এই পথটী সর্ব্বকামনা বিনির্ম্মুক্ত পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুবৃত্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনুভূত। অন্য ব্রহ্মবিধ পুরুষও সেই ব্রহ্মবিদ্যাপথে গমন করিয়া থাকেন।

কি প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই পথে গমন করেন? তাহা বলা যাইতেছে—যিনি প্রথমে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া, এবং পুত্র বিত্তাদি সম্বন্ধে কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্ম-তেজে, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে আত্মসংযোগ করতঃ সেই পরমাত্ম-তেজ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন

তৈজস স্বত্ব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহলোকে আত্মস্বরূপ হইয়াছেন, এবংবিধ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই সেই পথে গমন করেন। স্মৃতি শাস্ত্রে এভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥

অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের নিবৃত্তি হইলে পর, পুনর্জন্মের ভয় হইতে বিমুক্ত অতএব শান্ত—নিরুদ্বিগ্নচিত্ত সন্ন্যাসিগণ যাহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই স্বভাবযুক্ত আত্মাকে নমস্কার করি। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ হেতুকে আশ্রয় করিয়া, অতঃপর "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ত্যাগ কর বলিয়া স্মৃতির বচন আছে। বিশেষতঃ—

নিরাশিষ-মমারম্ভং নির্ণমস্কারমস্তুতিম।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

অর্থাৎ যিনি কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তন্নিমিত্ত কোন কর্ম্ম ও করেন না, নমস্কার ও স্তুতি-রহিত; নিজে অক্ষীণ (অনিষিদ্ধ কর্ম্ম) ও ক্ষীণ কর্ম্মা (যাহার ধর্ম্ম ক্ষয় পাইয়াছে) দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বলিয়া জানেন। এই সকল স্মৃতি-বচন দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান সিদ্ধ হইতেছে না।

সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়স্থ ও হৃদয়স্থ এবং ক্ষুধাপিপাসাদি সংসার ধর্ম্মের অতীত স্ব-স্বরূপ পরমাত্মাকে যদি সহস্রের মধ্যে একজন ও

জানিতে পারে,—কি প্রকারে ? না—এই যে সর্ব্ব প্রাণীর প্রতীতির সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি নেতি নেতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যাহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই, এবং যিনি বৈষম্য-বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতস্থ নিত্য শুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, আমি হইতেছি তৎস্বরূপ—এই প্রকারে জানে, সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় অর্থাৎ স্ব-ব্যতিরিক্ত কোন্ বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিয়া—কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত অন্য কাহার প্রয়োজনে, অনাত্মধর্ম্মী শরীরের অনুগত থাকিয়া শরীরের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-রূপভ্রষ্ট হইবেন ! শরীর রূপ উপাধি-জনিত দুঃখ লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইবেন। অর্থাৎ শরীর-গত সন্তাপের অনুগত হইয়া সন্তাপ অনুভব করিবেন ? অনাত্মদর্শী পুরুষই আপনার অতিরিক্ত বস্তু পাইতে অভিলাষী হয়, আমার পুত্র হউক, অর্থ হউক, স্ত্রীর অমুক হউক, এইরূপ কামনার বশবর্ত্তী এবং বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহে পতিত হইয়া শরীর-গত রোগের অনুসরণ করিয়া—রোগানুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আত্মভাব দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ সন্তাপ ভোগ করা কখনই সম্ভবপর হয় না।

আত্ম-বিদ্যারত পুরুষের যে কেবল কায়-ক্লেশই নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, পরন্তু কৃতার্থতাও হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ,—বিবেক-জ্ঞানের বহুসহস্র প্রতিকূল ভাবাপন্ন, বিবিধ অনর্থ রাশিতে পরিপূর্ণ এই দেহে প্রবিষ্ট (শরীরাধিপতিরূপে অবস্থিত) এই আত্মাকে

উপলব্ধ করিয়াছেন এবং প্রতিবোধ-গোচর অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, কি প্রকারে ? না, আমিই সেই পরব্রহ্ম—এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; তিনি 'বিশ্বকৃৎ'—জগতের কর্ত্তা। অর্থাৎ সকলে তাহার আত্মা, এবং তিনিও সকলের আত্মা। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন—

বড়ই আনন্দের কথা যে,—অনেক অনর্থ পরিপূর্ণ এই দেহে থাকিয়া অজ্ঞানময় দীর্ঘ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়াও আমরা অতি কষ্টে সেই ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতেছি, এই যে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতেছি, যদি তাহা না জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে 'অবেদী' হইতাম—অর্থাৎ অপর সাধারণ শরীরাভিমানীর ন্যায় অজ্ঞ থাকিতাম। অধিকন্তু দুজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া মহা বিনাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। আমরা যেরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া মহা বিনাশ বা অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি, এইরূপ আরও যাহারা এই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাহারাও অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে।

দেখিতে পাওয়া যায়,—সাধারণতঃ ভেদদর্শী লোক মাত্রই ভীত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে চায়, কিন্তু উপরের বর্ণিত একত্বদর্শী কোথা হইতেও ভীত হয় না, এইজন্যই বিমুক্ত ব্যক্তি যখন ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমানকালবর্ত্তী ঈশানকে সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তখন আর সেই ঈশান হইতে

আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে না। অথবা সে কাহাকেও নিন্দা করে না। কারণ সে তখন আত্মময়—তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেহ নাই,—সুতরাং কাহার নিন্দা করিবে।

সেই আত্মবিদ্ পুরুষ আরও দেখিতে পায় যে,—গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণ—এই পঞ্চজন, কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ—এই পাঁচজন এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ যে ব্রহ্মের মধ্যে ওতঃপ্রোত রহিয়াছে, সেই আত্মাই অমৃত—ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি সেই আত্মাকে অমৃত ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ বলিয়া জানি না। তবে কিনা, আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কেবল এতদিন অজ্ঞানবশতঃ আমি মর্ত্ত্য অর্থাৎ নিজের অমরত্ব ভুলিয়া গিয়া মরণশীল বলিয়া মনে করিতাম,—জ্ঞানোদয়ে সেই ভ্রম অপনীত হওয়ায় আমি অমৃতই আছি।

অতঃপর ব্রহ্মদর্শনোপায় কথিত হইতেছে—আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভপূর্ব্বক, তত্ত্বজ্ঞান-পরিশোধিত মনের দ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করিবে। (স্মরণ রাখা উচিত, এই আচার্য্য শব্দে কিন্তু এখনকার গুরু বুঝিতে হইবে না ;—আর লোকে চক্ষু দ্বারাই দর্শন করে, মন দ্বারা দর্শন করে না ;—ইহাই জানা আছে,—বস্তুতঃ দর্শন কর্ত্তা চক্ষু নহে, মনই ; চক্ষু দর্শনের দ্বার মাত্র। দ্রষ্টা মনঃ) এইজন্যই মন দ্বারা দর্শনের কথা বলা হইল। সেই দ্রষ্টব্য ব্রহ্মে নানা কিছু নাই, নানাত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে নানাত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। যে লোক ইহাকে নানার মত

দেখে, সে লোক মরণের পর মরণ প্রাপ্ত হয়। একথার তাৎপর্য্য এই যে,—অবিদ্যাকৃত অভ্যাস ভিন্ন, বাস্তবিক আত্মাতে কোনরূপ দ্বৈত বা বিভাগ নাই।

আকাশ যেরূপ নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ আত্মাকে একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ নিয়ত দর্শন করিবে। যেহেতু এই ব্রহ্ম অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর সহিত একীভূত বলিয়া প্রমাণের অবিষয়। অন্যেই অন্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই ব্রহ্ম ত একই, তাহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই, এইজন্যও অপ্রমেয়। জগতের অন্যান্য বস্তু যেমন শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকেও প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কিন্তু এই আত্মাকে শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন ও প্রমাণ দ্বারা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যাহার সর্ব্বাত্মভাব পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহারই সমস্ত ভেদ বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সময়ে, কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে।

ব্রহ্ম বিষয়ক যে জ্ঞান—তাহা হইল, অনাত্ম বস্তুতে যে আত্ম-বুদ্ধি, তাহার নিবৃত্তি। ব্রহ্মের সহিত সকলেরই আত্মভাব নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ তাহা প্রতীতি হয় না। অন্য পদার্থ দেহাদি হইতে আত্মভাবজনিত ভ্রম নিবৃত্তি হইলে পর, প্রকৃত আত্মাতে যে অত্মভাব, তখন কেবল তাহাই স্ফুরিত হইতে থাকে। এইজন্য আত্মা জ্ঞাত হয়, এই কথা বলা হইয়া থাকে।

ধীর অর্থাৎ পরিশুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ)

২৩

উক্ত প্রকারে আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা অর্থাৎ যাহাতে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে বিজ্ঞাত বিষয়ে আর কোনও জিজ্ঞাসা না থাকে অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা না থাকে, এমন ভাবে জ্ঞান লাভ করিবে। এবং জ্ঞানসাধন সংন্যাস শম, দম, উপরতি (ভোগ-বিরতি) তিতিক্ষা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। অধিক পরিমাণে শব্দের অনুধ্যান ও চিন্তা করিবে না।

এই যে, মহান্ অজ আত্মা, এবং যাহা প্রাণপদবাচ্য ইন্দ্রিয়-বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধি বিজ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকাশমান, তিনি সকলের অধিপতি—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। আরও এক কথা,—হৃদয় মধ্যবর্ত্তী এবংবিধ গুণসম্পন্ন সেই স্ব-স্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম দ্বারা বড় হয়েন না, পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কোনগুণে বৃদ্ধি পান না এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন অপকর্ম্ম দ্বারা ও নিজের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন হন না। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে দেখা যায়, পরিচালনা ও পালনাদি কর্ম্ম করিতে যাইয়া পরের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু এই পরমাত্মার তাহা হয় না। কেন হয় না—যেহেতু এই পরমেশ্বর সকলেরই ঈশ্বর, সুতরাং সর্ব্বেশ্বর বলিয়া তিনি কর্ম্মকেও শাসনে রাখিতে সমর্থ। যেহেতু ইহাই তাহার স্বভাব, এইজন্য কর্ম্ম দ্বারা ও সম্বন্ধ হন না। বিশেষতঃ তিনি ভূতাধিপতি, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত বস্তু মাত্রেরই অধিপতি।

তিনি যাহাদের অধিপতি, তিনি সেই সমস্ত ভূতবর্গেরই পালক—রক্ষক। ইনিই সেতু স্বরূপ, কিরূপ? অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থার বিশেষরূপে ধারণকর্ত্তা। এ কথার অর্থ এই যে,—পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোক সমূহের সনাতন নিয়ম-পদ্ধতি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য তিনি সেতু স্বরূপ আছেন. পরমেশ্বর যদি সেতুর ন্যায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে জগতের সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি বা স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি ভাঙ্গিয়া যাইত, যাহাতে তাহা না হইতে পারে সেইজন্য এই পরমেশ্বর সেতুরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই সেই সেতুভূত পরমেশ্বরই স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে,—কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন যত রকমের কর্ম্ম আছে, সে সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই ব্রহ্ম-বিদ্যার উপকার সাধন করিয়া থাকে। কিরূপে যে সেই উপকার সাধন করে, তাহা দেখান যাইতেছে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে সাধারণতঃ বেদের দুইটি ভাগ—মন্ত্র ভাগ, ও ব্রাহ্মণভাগ। এই উভয় ভাগ লইয়া বেদ পূর্ণ হইয়াছে। আপস্তম্ভ-সংহিতায় আছে—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ-নামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এতদুভয়ের নাম বেদ। মন্ত্রভাগ কর্ম্মকাণ্ড ও সংহিতা নামে, আর ব্রাহ্মণভাগ উপনিষৎ ও আরণ্যক প্রভৃতি নামে ও স্বনামে পরিচিত।

প্রশ্ন উঠিতেছে যে, স্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা

আত্মাকে জানা যায় কিরূপে ? কেননা, কর্ম্ম বিষয়ক ঐ সমস্ত শাস্ত্র ত আর উপনিষদের ন্যায় আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে না, তবে, কাম্যকর্ম্ম ছাড়া যত রকমের কর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বিদ্যার উপকার হয়—একথা বলিতেছ কিরূপে ?

একথার উত্তর এই যে,—স্মৃতিতে আছে—জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ—

অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হইলে পর, লোকদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ কর্ম্ম-সমূহ চিত্ত-শুদ্ধির হেতু অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাহাদের চিত্ত উত্তমরূপে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, সেই সকল শুদ্ধচিত্ত লোকই বিনা বাধায় উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মাকে জানিতে সমর্থ হয়।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, নিত্যকর্ম্ম সমূহের ফল যে চিত্তশুদ্ধি, ইহা বুঝা যাইতেছে কিসে ? শ্রুতির বাক্য ও স্মৃতির বাক্যই তাহার প্রমাণ—স হ বা আত্মযাজী যো বেদেদং মেহনেনাঙ্গং সংক্রিয়তে, ইদং মেহনেনাঙ্গমুপধীয়তে।—ইতি শ্রুতি। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই আত্মযাজী, যে ব্যক্তি জানে যে, এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত (শোধিত) হইতেছে, এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ উপযুক্ততা লাভ করিতেছে। ভগবদ্ গীতাতেও আছে—

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্।
সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই সমস্তই মনীষিগণের (ধ্যান-নিষ্ঠদিগের) শুদ্ধিকরণ। যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদের হৃদয়গত সমস্ত পাপক্ষয় হইয়াছে, তাহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ যজ্ঞ রহস্য অবগত আছেন।

দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞসমূহ) এবং জ্ঞানযজ্ঞ সমূহ (যে সমস্ত যজ্ঞ দ্রব্য নিরপেক্ষ কেবলই জ্ঞানাত্মক, সেই সমুদয় যজ্ঞ) এই উভয়েরই উদ্দেশ্য চিত্ত শুদ্ধি। কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার সাধিত হইলে পর, বিশুদ্ধ চিত্তে বিনা বাধায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। এই কারণেই জ্ঞানিগণ যজ্ঞ দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। দান পাপক্ষয় এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির অন্যতর উপায়। এজন্য তাহা দ্বারা ও আত্মবেদন সম্ভব হয়। তপস্যা শব্দে সাধারণতঃ কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি সমস্তই ধরা যায়,—এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত আত্ম-বিদ্যার একার্থপরতাও সিদ্ধ হইতেছে। এখানে যে সমস্ত উপায় উপদিষ্ট হইল, সে সমস্তের সাহায্যে যথাবর্ণিত এই আত্মাকে অবগত হইয়া মুনি হয়। আত্মবিষয়ে মনন করে বলিয়া মুনি—যোগী হয়। বুঝিতে হইবে, যথোক্ত প্রকারে এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি হয়,—অন্য তত্ত্ব জানিয়া নহে।

যাহারা বাহ্য বিষয় লইয়া আসক্ত, অর্থাৎ, পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদিলোক লাভের অভিলাষী, তাহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই। কেনন', কাশী হইতে যদি কেহ হরিদ্বারে যাইতে চাহে, সে কখনই কাশী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে না।

অতএব যাহারা পুত্রাদি বাহ্যলোক প্রার্থী, তাহাদিগের পক্ষে পুত্রোৎপাদন, কর্ম্ম, এবং অপরব্রহ্মবিদ্যাই তাহাদের অভীষ্ট লাভের উপায়। পুত্রাদি কর্ম্মদ্বারা যে, আত্মলোক লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং সম্ভাবনা নাই বলিয়াই ঐ সকল সাধন আত্ম-লোকের বিরোধী, একথা আর প্রমাণ করার আবশ্যক নাই। কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যাহারা আত্মলোক পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবেন। ত্রিবিধ অনাত্মলোক প্রার্থীদিগের জন্য যেমন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পুত্রাদি সাধন-সমূহ বিহিত আছে, তেমনই আত্মলোক প্রার্থী ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে ও সর্বক্রিয়া-নিবৃত্তিরূপ পারিব্রজ্য বা সন্ন্যাসই বিহিত হইয়াছে।

অতএব ব্রহ্মবিদগণ, আত্মাকে উত্তমরূপে জানিয়া অবশ্যই প্রব্রজ্যা করিবে, কিন্তু কর্ম্মারম্ভ করিবে না। যেহেতু প্রাচীনগণ এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, সন্তান কামনা পরাঙ্‌মুখ হইয়া, এইরূপ-সাধ্য সাধন ব্যবহারকে অজ্ঞজন সেবা বলিয়া নিন্দাকরতঃ পুত্র কামনা হইতে, বিত্তকামনা হইতে এবং স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে ব্যুত্থান করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেন। অতএব, জ্ঞানীদিগের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অবিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ভগবদ্‌ গীতাতেও আছে—

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। হে পার্থ সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফল

জ্ঞানফলের অন্তর্ভূর্ক্ত হয়। অতএব ব্রহ্মবিদের পক্ষে কর্ম্মারম্ভ নিতান্তই অসম্ভব।

যেহেতু সর্ব্বাভিলাষবিবর্জ্জিত সেই পুরুষ নেতি-নেতিরূপে সর্ব্ব নিষেধের অবধিরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া, নিজেও তৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, সেই হেতুই যথোক্ত আত্মস্বরূপে বর্ত্তমান সেই আত্মজ্ঞ পুরুষের বক্ষ্যমান দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হয় না। আমি পাপকর্ম্ম করিয়াছি এজন্য আমি নরকে যাইব, আর পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি এজন্য আমি স্বর্গে যাইব,—ইত্যাকার বিষাদ ও হর্ষে তাহাকে অভিভূত করে না। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পাপ ও পুণ্যাত্মক উভয়বিধ কর্ম্মই অতিক্রম করিয়া থাকেন।

এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর উভয় প্রকার কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,—অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পুণ্য পাপ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত এবং ইহজন্মেও যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম করিয়াছেন সে সমস্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অনুষ্ঠেয় কোন কর্ম্মই আর পুণ্য পাপরূপ অদৃষ্ট সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ কৃত যাহা অবশ্যানুষ্ঠেয় আর অকৃত—সেই অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মের অকরণ, সেই কৃতাকৃত ও তাঁহাকে তাপ দেয় না। যেহেতু আত্মজ্ঞ পুরুষ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন, গীতাতে আছে.

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ রাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি ও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলে এই বর্ত্তমান (প্রারব্ধ) দেহ আরব্ধ হইয়াছে, কেবল সেই সমুদয় পুণ্য পাপেরই উপভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মবিদের সহিত কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই।

এই যে, নেতি-নেতি নির্ব্বিশেষরূপে মহিমা, ইহাই নিত্য। অন্য যে সমস্ত মহিমা, সে সমস্তই কর্ম্মকৃত অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন, এজন্য অনিত্য। কিন্তু সমস্ত বাসনা-বিনির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণের এই মহিমা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ. এজন্য নিত্য। যেহেতু—ইহা কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিরূপ বিকার লাভ করে না। এখানে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিষেধেই উপচয় ও অপচয়ের হেতুভূত, অতএব অবিক্রিয়ত্ব নিবন্ধই এই মহিমা নিত্য।

যেহেতু ব্রাহ্মণের নেতি-নেতি ইত্যাদি রূপ মহিমা কোন কর্ম্ম দ্বারাই সম্বন্ধ নহে, সেই হেতু যথোক্ত প্রকার মহিমাভিজ্ঞ পুরুষ শান্ত—বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে বিরত; দান্ত—অন্তঃকরণগত তৃষ্ণা ও ভোগাভিলাষ হইতে নিবৃত্ত; উপরত—সর্ব্ববিধ কামনা হইতে বিরত; সন্ন্যাসী—নানা ভাবরহিত হইয়া এক রসময়; তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু এবং সমাহিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তিরূপ একাগ্রতা দ্বারা সমাধি-সম্পন্ন

হইয়া—আত্মাতেই—স্বীয় দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের মধ্যেই আত্মাকে প্রত্যক্-চেতনকে দর্শন করিয়া থাকেন। তবে কি কেবল দেহ মাত্র পরিচ্ছিন্নই দর্শন করেন? না, সমস্তই আত্মরূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত কেশের অগ্রভাগটুকুও নাই—এইরূপে দর্শন করেন। ঐরূপ মনন বা চিন্তার ফলে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া মুনি হন।

এইরূপ দর্শনশীল ব্রাহ্মণকে কোনরূপ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। পরন্তু ব্রহ্মবিদই সমস্ত পাপকে তাপ দেন অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মভাব-দর্শন-রূপ বহ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ,—বিপাপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-রহিত, বিরজ অর্থাৎ নিষ্কাম; অবিচিকিৎস—ছিন্ন সংশয়। এবম্ভূত জ্ঞানীই এই অবস্থায় যথার্থ ব্রাহ্মণ হন। এই ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতির পূর্ব্বে যে ইহার ব্রাহ্মণত্ব তাহা মুখ্য নহে, গৌণ।

ইহাই ব্রহ্মলোক, এখানে ব্রহ্ম ও লোক পৃথক পদার্থ নহে, ব্রহ্মই প্রাপ্য বলিয়া লোক শব্দ বাচ্য। গৌণার্থ সম্বন্ধ-শূন্য এই ভাবই যথার্থ ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, (জনক) তুমি সর্ববনিষেধের অবিষয় এই অভয় ব্রহ্মলোক প্রাপিত হইয়াছ। জনক এই প্রকারে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মভাব প্রাপিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবান্ আপনাকে এই বিদেহ দেশ অর্থাৎ আমার সমস্ত রাজ্য দান করিতেছি, এবং দাস্য-কর্ম্ম করিবার জন্য রাজ্যের সহিত আমাকে ও দান করিতেছি।'

সন্ন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অঙ্গ ও ইতিকর্ত্তব্যতার (ব্রহ্মলাভের জন্য পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য প্রণালীর) কথা এখানে সমাপ্ত করা গেল যে, পুরুষের এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, ইহাই নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম অবস্থা, ইহাই জীবের পরমাগতি এবং ইহাই পরম মঙ্গল। ব্রাহ্মণ এই নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিয়াই কৃত-কৃত্য হয়, ইহাই সমস্ত বেদের উপদেশ।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

পঞ্চম অংশ

মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য

মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য

'মাধুকরী' মাতা আমার, 'বৈরাগ্য' মোর পিতা।
'বিচার' আমার রক্ষা-দণ্ড, 'ধৈর্য্য' মম ভ্রাতা॥
'শ্রদ্ধা' আমার প্রিয়া পত্নী, 'বিজ্ঞান' মম পুত্র।
'ঈশ-ভক্তি' সুতা আমার, 'সন্তোষ' মম মিত্র॥
এত বড় সংসারী মুই, তবু বোলাও 'যতি'।
জানিনা কোন্ গুণের মোহে, ডাক মোরে ইতি॥

"আত্মনেঽস্তু নমো মহ্যমবিচ্ছিন্ন চিদাত্মনে।
পরামৃষ্টোঽস্মি লব্ধোঽস্মি প্রোদিতোঽস্ম্যচিরদেহম্।
উদ্ধৃতোঽস্মি বিকল্পেভ্যো যোঽস্মি সোঽস্মি নমোঽস্তুমে॥
তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং চিদাত্মনে।
নমস্তুভ্যং পরেশায় নমো মহ্যং শিবায় চ॥"

(সন্ন্যাসোপনিষৎ, ৩১।৩২)

ভগবন্নিষ্ঠার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে ভজন অভ্যাস করিতে হইবে; কেবল কল্পনা দ্বারা সে মাধুর্য্য অনুভব করা যায়

না। সাধক যতই ভজনাভ্যাসে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে, ততই উক্ত মাধুর্য্য অধিকাধিক অনুভূত হইতে থাকে। ভগবন্নিষ্ঠা-লাভের মুখ্য সাধন—বৈরাগ্য ও উপরামতা। ভগবানকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, সে কি একক্ষণও তাঁহার ধ্যান ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? বিষয়ের কোনও প্রকার আসক্তি থাকিতে ভগবন্নিষ্ঠার কথা ভগবৎ-কথার দোকানদারি মাত্র,—তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি সুদূর পরাহত সুনিশ্চয়। দীর্ঘকাল নিত্য নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত তপস্যার অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই দৃঢ় নিশ্চয় লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রগ বায়ুকে বিশেষরূপে অনুভব ও তদ্দ্বারা সুখলাভ করিবার জন্য যেমন পাখার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিলেও, উপাসনা ব্যতীত তাহার বোধ জন্মে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দৃষ্টান্তের সহিত বলেন ঃ—

> ‘গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
> তদেব কর্ম্মরচিতং পুনস্তস্যৈব ভেষজম্॥
> এবং সর্ব্ব শরীরস্থং সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
> বিনা চোপাসনাং দেবো ন করোতি হিতং নৃষু॥’

অর্থাৎ ঘৃত গাভীর সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও, তাহার অঙ্গ পোষণ করে না। সেই ঘৃত যদি উপায় অবলম্বনে সংগৃহীত হয়, তবে তাহাই সেই গাভীর ঔষধ হইয়া থাকে (গাভীর শরীরের

ক্ষতাদি আরোগ্য বিষয়ে)। সেইরূপ পরমেশ্বর সর্ব্ব শরীরে ঘৃতের ন্যায় সর্ববব্যাপিভাবে অবস্থান করিলেও, উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যের কল্যাণকারী হন না॥—দুঃখের অবসান ও আনন্দের উপলব্ধি করিতে হইলে, উপাসনা দ্বারা ত্রিবিধ দেহ হইতে ব্রহ্ম বা আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দীর্ঘকাল নিত্য নিরন্তর তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্র যে পথের নির্দ্দেশ দেন, তাহা হৃষ্ট মনে অবলম্বন করিয়া দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইতে থাকিলেই সাফল্য-লাভের আশা, নতুবা মনোমুখী হইয়া পথভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। শাস্ত্র ও মহাপুরুষ নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নিজ অসংযত (অপরিপক্ক) মনের নির্দ্দেশে চলিলেই স্বতন্ত্রতা হয় না। নিজ অসিদ্ধ মনোমুখী হওয়া ও একপ্রকার তন্ত্রতা পরাধীনতা, উহা মনস্তন্ত্রতা। মনস্তন্ত্রতার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচার; তৎফলে মনুষ্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া প্রকৃতির দাসত্ব করিতে বাধ্য হয় এবং ফলস্বরূপ মহাদুঃখ ভোগ করে। স্বতন্ত্রতা ও স্বৈরাচারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। স্বতন্ত্রতা (স্ব-তন্ত্রতা) পরম সুখ আস্বাদন করায়, আর স্বৈরাচার জীবকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে লইয়া যায়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় দয়া ও পরোপকারকে চিত্তশুদ্ধির সহায়করূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু আত্মনিষ্ঠেচ্ছু সাধকের পক্ষে উহারা বন্ধনস্বরূপ। দয়ার পরিণাম কি, তাহা জড়ভরতের দুঃখপূর্ণ পরিণাম দেখিয়া বিচার করিতে হয়। পরোপকার বাসনার ফলে বহু সাধু সন্ন্যাসীকে আত্মনিষ্ঠা হারাইতে

হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান, নাম-যশ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-জালে জড়িত হইতে হইয়াছে। অতএব, পরমকল্যাণ-লাভেচ্ছু সাধকের কর্ত্তব্য, সিদ্ধাবস্থায় স্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, সর্ববপ্রকার বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া অভ্যাসে নিজেকে ডুবাইয়া রাখা। বাসনা-বদ্ধ থাকিয়া কেহ কখনও সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং, অপরিপক্ক মনকে যে কোন বাসনা হইতে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিপক্ক করিয়া লইতে হইবে। যেভাবে বা যেরূপেই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, অভ্যাস ত্যাগ করিবার দুর্ম্মতি যেন না হয় ; তৎকালেও নিয়মিত-ভাবে অভ্যাস করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অভ্যাস দ্বারাই অভ্যাসপথের বিঘ্ন সমূহ অপসারিত হইয়া যায়। অধিকন্তু, অভ্যাস অবলম্বন না করিয়া কেহ কোনকালে মনকে স্থির করিতে পারে নাই। পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষ দেখাইয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয়-বিমুখ করতঃ তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া মনকে দেখাই মনোজয় করিবার সহজ ও সুগম উপায়।

বিষয়চিন্তা মনে প্রবেশ লাভ করিবার কারণ—বৈরাগ্যসহ বিচারের অভাব। বৈরাগ্যসহ বিচার যাহার সাথী, বিষয়চিন্তা তাহার মনে প্রবেশ করিবার অবসর পায় না। যখনই জানিতে পারিবে যে বিষয়চিন্তা মনে উদয় হইয়াছে, তখনি বিচার ও ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে মনোঘট হইতে বহিষ্কৃত করিবে এবং আত্মচিন্তার দ্বারা মনোঘটটি ভরিয়া ফেলিবে। কুচিন্তা মনে উদিত হইলেই উহা সংস্কার জন্মাইতে পারে না, উহা কার্য্যে পরিণত

হইলেই সংস্কারের রেখাপাত হয়। পূর্ব্বার্জিত অসৎ কর্ম্মের ফলহেতু কখন কখন কুচিন্তা মনে উদিত হইতে পারে। সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া উহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কুচিন্তা উদিত হওয়া মাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে মন হইতে বিতাড়িত করিবে। জাগিয়া থাকিয়া সতর্ক থাকিলে বিষয়চিন্তারূপ মনশ্চোর আত্মচিন্তারত্ন চুরি করিতে পারিবে না। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিতে থাকিলে, আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ প্রবলতর হইতে থাকে এবং বিরুদ্ধশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে ও ততই দুর্ব্বলতর হইতে থাকে এবং ক্রমে সাধকের বশে আসিয়া পড়ে। বশীভূত মন আপনা হইতেই আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিঃসঙ্কল্প ও সুশান্ত হয়।

অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া একান্তে বাস করিয়া অবিলম্বে মনোনিরোধ করিবার জন্য জন-সংস্রব হইতে দূরে যান; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে বিপরীত ফল ফলিয়াছে; মনোনিরোধ ত হয়ই নাই, বরং মনের উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিচার বৈরাগ্যকে সাথী করিয়াছেন, তাঁহারাই একান্ত স্থানে থাকিয়া লাভবান্ হইতে পারেন। বিচার-বিধৌত বৈরাগ্য-মার্জিত বিষয়চিন্তা-বর্জিত মন একান্ত প্রদেশে আপনা হইতে বিক্ষেপ-রহিত হইয়া শান্ত হয় এবং আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু বিষয়ভোগ-লোলুপ ইন্দ্রিয়-বশ পুরুষ নির্জ্জন স্থানে গেলে তাহার মন পূর্ব্বভোগ-সংস্কারবশতঃ

মনোরাজ্য-সৃজনে মত্ত হইয়া পড়ে। অনতিবিলম্বে আত্মদর্শনে ধন্য হইবার আশায় অপরিপক্ক মন লইয়া একান্তবাসে গেলে মনোজয়ের পরিবর্ত্তে মনোদাসই হইতে হয় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাসকাল পর্য্যন্ত যাযাবরের মত মঠ হইতে মঠান্তরে অথবা তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে কিম্বা মেলা হইতে মেলান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধের সাধন-জীবনটি বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ অশান্ত দুঃখপূর্ণ ব্যর্থ স্বতন্ত্র জীবন যাপন বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ বিড়ম্বিত ব্যথিত জীবনযাপন করা অপেক্ষা কোন বিবেকী সমদর্শী সদাচারী সাধকের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রীতমনে তাঁহার সেবায় নিরত হইতে হয় এবং তাঁহার উপদেশ মত আপন মনকে গঠিত করিতে নিরলসভাবে সচেষ্ট থাকিলে জীবন সফল হইবার অত্যধিক সম্ভাবনা।

সাধন-জগতে হঠকারিতার স্থান নাই। মনকে ধীরে ধীরে জয় করিতে হইবে। বিচারপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হয়। হঠপূর্ব্বক একেবারে মনকে বশ করিবার জন্য অস্বাভাবিক জোর প্রয়োগ করিতে গেলে, হিতে বিপরীত হইয়া, মস্তিস্ক বিকৃত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘকাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই নিরঙ্কুশ পন্থা। যথাশক্তি শাস্ত্রপাঠ, সৎসঙ্গ, বিচার ও ধ্যান অবলম্বন করিয়া মনকে বশ করিবার জন্য যত্নশীল হইলে মন ক্রমশঃ তাহার চঞ্চল স্বভাব

পরিত্যাগ করে। অন্যথা হঠকারী সাধকের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। জীবনে মনোজয় বা মনোনাশ তাহার দ্বারা হওয়া দূরের কথা—সে নিজেই মনোদাস হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে।

প্রথমে সুনিপুণ বিচার দ্বারা আত্মার স্বরূপ অবগত হইতে হয়। পরে আত্মার শ্রবণ, মনন ও ধ্যানে দৃঢ়তার সহিত অভ্যাসরত থাকিলে মনের বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং মনও ক্রমে অন্তর্ম্মুখীনতা লাভ করে। যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া যখন বিষয়ের অনিত্যতার দৃঢ় বোধ জন্মে, এবং নিঃসংশয়রূপে বুঝা যায় যে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"—বিষয় ভোগ দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি কখন সম্ভব নহে, ভোগ কেবল ভোগস্পৃহা বাড়াইয়া দুঃখভার বৃদ্ধি করে,—তখন মন হইতে বিষয়াসক্তি দূর হইয়া যায় এবং মন আর বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতে চায় না।

যতদিন বিষয়ভোগেচ্ছা মন হইতে নির্ম্মূল না হইয়া যায়, ততদিন হাজার বিচার করিলে ও, মনে বিষয়াসক্তির সংস্কার থাকাতে, মন বিষয়ভোগ করিবার জন্য লালায়িত থাকে। ব্যক্তভাবে নিজ ইচ্ছা পূরণে ব্যাঘাত পাইলে, গোপনে বিষয়ভোগে ব্যাপৃত হয়।

বৈরাগ্যশূন্য বিচার সুফল প্রদান করিতে পারে না। কেবলমাত্র বিচার দ্বারা সংস্কার নিবৃত্তি ও জ্ঞানলাভ হয় না। বৈরাগ্যহীনের বিচারকথা বাক্‌চাতুরী মাত্র, ইহা লোক প্রতারণার

কৌশলমাত্র, ইহা সংসারী লোকের নিকট জ্ঞানী মহাপুরুষ সাজিবার উপায় মাত্র, ইহা আপন সংস্কার অনুযায়ী ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার এক সুগম পন্থা মাত্র। মনকে বিষয়ভোগ হইতে উপরত করিতে হইলে, বৈরাগ্যের সাহায্য লইতেই হইবে, বিচারের সেবা করিতেই হইবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত মন হইতে বিষয় বাসনা সমূলে কিছুতেই দূরীভূত হইবার নয় এবং মনের উপরামতা ও সম্ভব নহে। বিষয়ের প্রতি উপরাম হইয়া শান্ত না হইলে, মন সমাধি অভ্যাসের অধিকারী হইতে পারে না। সে ক্ষেত্রে জোর করিয়া সমাধির অভ্যাস করিতে গেলে, নিদ্রাদেবীর কোলে সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র।

সকল প্রকার লৌকিক ব্যবহার হইতে আত্মনিষ্ঠ সাধককে দূরে থাকিতে হইবে। মুমুক্ষুর পক্ষে লৌকিক ব্যবহার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ ; কেন না, তদবস্থায়, লোকবার্ত্তা ও লৌকিক ব্যবহার আত্মবিস্মৃতির হেতু ; সুতরাং ধীরে ধীরে তাহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মনিষ্ঠা লাভের এই বিশেষ বিঘ্ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের প্রয়োজন। সন্ন্যাস ব্যতীত আত্মবিস্মৃতির হেতু লৌকিক ব্যবহারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর নাই। আবার লৌকিক ব্যবহার ধ্যান নিষ্ঠার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন ও বিশেষ বিরোধী সুতরাং সমাধি-লাভেচ্ছু গুরুমুখী মুমুক্ষুর পক্ষে বিবিদিষা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া একান্তবাসে

সমাধি অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক। সমাধি ব্যতীত আত্মদর্শন অসম্ভব।

* * * *

সংসার মিথ্যা বলিয়া যাঁহার দৃঢ়বোধ জন্মিয়াছে, লৌকিক ব্যবহারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বেদান্তের আলোচনা ও বিচার চলিতেছে, অথচ ব্যবহারিক প্রবৃত্তির বিরামের লক্ষণ যদি না দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সংসারে মিথ্যাত্ব-বুদ্ধি এখনও দৃঢ় হয় নাই, এবং অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদি-বাসনা চিত্তকে তখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রোক্ত বিচার-পন্থা অনুসরণে যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা না করিলে, বিচারশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জীবকে পশুতে পরিণত করে। এজন্য বিচার করিয়া যাহা ত্যজ্য বলিয়া নিশ্চিত বোধ জন্মে, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হয়; তাহাতে ইতস্ততঃ করিতে নাই এবং তাহাতে যদি সাময়িক অসুবিধা বিশেষ ভোগ করিতেও হয়, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ও করিতে নাই। বিষয়ভোগে ও লৌকিক ব্যবহারে যাঁহার মন যত উপরত, তাঁহার আনন্দের মাত্রাও তত অধিক। নতুবা ব্যবহারের মধ্যে বিহার করিয়া দু তিন ঘণ্টা চক্ষু বুজিয়া জপ, ধ্যান বা প্রাণায়ামের প্রহসন করিলেই আত্ম-দর্শন হইবে,—এরূপ আশা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। বিষয়রসে সম্পূর্ণ অনাস্থা না জন্মিলে, ভগবৎ রস প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করা যায় না।

সাধক যদি কার্য্য গতিকে এমন অবস্থায় পতিত হন যে, ব্যবহার না করিয়া উপায়ান্তর না থাকে, তবে নিজ আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবেন। নিজ মহান্ উদ্দেশ্যের কোন প্রকার হানি করিয়া ব্যবহার করিতে যাওয়া আত্মনিষ্ঠেচ্ছু সাধকের পক্ষে আত্মহত্যা তুল্য।

ব্যবহার-কালে সর্ব্বদা সমদৃষ্টি রাখিবার জন্য সাধককে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সমবর্ত্তী না হইয়া যথাসাধ্য দেশ, কাল ও পাত্র বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া চলিতে হইবে। সকলের মন রক্ষা করিতে গিয়া, নিজ কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দেওয়া, সাধকের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এইরূপ করিলে উভয়তঃ ক্ষতি হইয়া থাকে,—পরের ও প্রকৃত মঙ্গল হয় না, নিজের ও অহিতই হয়। যদি দায়ে পড়িয়া পরোপকার করিতেই হয়, তবে তাহা ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু না করিলে নিজ সাধনমার্গে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। অনিবার্য্য গতিতে যদি কোন ব্যবহারিক কর্ম্ম স্কন্ধের উপর আরোহী হয়, তবে তাহা কর্ম্মব্রহ্ম-বিচারে প্রসন্ন মনে সম্পাদন করিতে হয়। অন্যথা অন্বেষণ করিয়া পরোপকার করিতে গেলে, পরোপকার-রোগগ্রস্ত হইতে হয় এবং তাহা সাধনার বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় ও বন্ধনে পরিণত হয়। বিচার-বর্জিত জাগতিক লোকের অভাব অভিযোগ কখনও দূর হইতে পারে কি? সুতরাং সাধনাবস্থায় কাহারো দুঃখে দুঃখী হইয়া স্বীয় সাধন-কর্ত্তব্য ত্যাগপূর্ব্বক পরদুঃখ দূরীকরণে প্রবৃত্ত

হওয়া, সাধকের পক্ষে কল্যাণজনক ত নহেই, বরং খুবই অনিষ্টকর। ব্রহ্মানন্দনিষ্ঠেচ্ছু সাধকের কর্ত্তব্য, অনুষ্ঠান মাত্রকেই হলাহল-বোধে পরিত্যাগ করা। যজ্ঞ-দানাদি শুভকর্ম্মসমূহ ও আত্মদর্শনেচ্ছু সাধকের পক্ষে মূর্ত্তিমান্ বন্ধন বিশেষ। আত্মানন্দলাভে ধন্য হইতে যিনি সমুৎকণ্ঠিত, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে তাঁহাকে বিনির্ম্মুক্ত হইতেই হইবে; নতুবা বিশেষ ব্যবহারিক আনন্দকেই আত্মানন্দ-বোধে গ্রহণ করিয়া প্রকৃত আনন্দাস্বাদে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

অহো দুর্ভাগ্য, যিনি সন্ন্যাস নাম ও সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ ও ধারণ করিয়াও. নিজ আশ্রমোচিত আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবহারিক সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাকে হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইতে না পারেন! —সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদুঃখ বরণ করিয়া লইয়াও যিনি আদর্শ লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তিকে প্রসন্ন মনে উপেক্ষা করিতে না পারেন. তাঁহার অপেক্ষা ভাগ্যহীন আর কে আছে? তাঁহার পক্ষে আদর্শ লাভ কোন কালেও সম্ভব নহে।

পথিকেরই পথকষ্ট সহন করিতে হয়, বিরহীকেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হয়,—সেইরূপ সাধককেই বিঘ্নবিপৎ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। বিঘ্নবিপৎগুলি সাধকের পরীক্ষক; সেগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া সাধককে নিজ শক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে তাঁহার সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির উপযুক্ততা অর্জিত হয় এবং তাহাতে সাধকের শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা হয়। বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ না হইলেও সাধকের কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে

তাঁহার লাভই হয়. যেহেতু তদ্দারা সাধকের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

* * * *

প্রতিদিন একজনের অন্ন গ্রহণ করিলে অন্নদাতার উপরোধ, অনুরোধ, আব্দার প্রভৃতি রক্ষা করিতে হয় এবং তাহাতে নিজ আশ্রমধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়। অনেক চতুর্থাশ্রমীকে দেখিয়াছি যে অর্থদাতা সেবকের পুত্র বা কন্যা বিবাহে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিয়া নিজ আশ্রমধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাতিত্য-স্বীকার করিয়াছেন। একান্ন গ্রহণের এরূপ শোচনীয় পরিণাম বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। ইহাতে যে উভয়পক্ষই স্বধর্ম্মচ্যুত হন, সে বিচার তাঁহাদের মোটেই উদয় হয় না। বরং 'পরোপকারের' দোহাই দিয়া এরূপ ধর্ম্মাচরণবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব ও প্রকাশ করেন! ধন্য কলির প্রভাব!

যে ভাবেই হউক, প্রতিদিন কাহারও সেবা গ্রহণ করিলেই তাহার অধীন হইতে হয় এবং মনুষ্যস্বভাববশতঃ সেবকের পার্থিব হিত চিন্তা করিতে যাইয়া সাধন-জগৎ হইতে দূরে যাইতে হয়। সে জন্য যতদূর সম্ভব, কাহারও সেবার অধীন হওয়া উচিত নহে। স্বতন্ত্র না থাকিলে কি স্বেচ্ছামত সাধনায় মগ্ন হওয়া যায়! পরাধীনের সাধনা কখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে না।

শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার উপযোগী শীতবস্ত্র ও পরিধেয় ব্যতীত অধিক বস্তু সঙ্গে রাখা সাধকের সাধনার প্রতিকূল। পদার্থ

নিকটে থাকিলেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় এবং সাধনার ব্যাঘাত হয়। অধিকন্তু পদার্থ থাকিলে তাহা প্রাপ্তির আশায় মনুষ্য আসিয়া প্রার্থনাদি করে এবং কীটাদি ও তাহার আশ্রয় লইয়া বা নষ্ট করিয়া অধিকারীকে বিরক্ত ও বিব্রত করে এবং আত্মচিন্তায় ব্যাঘাত হয়।

গ্রন্থাসক্তি ও সাধন জগতের মূর্ত্তিমান বিঘ্ন। তাহাও সর্ব্বদা ত্যজ্য। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ২।৩ খানি গ্রন্থের অতিরিক্ত পুস্তক সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য নহে। গ্রন্থ-সংগ্রহ সাধকের পক্ষে এক অনিষ্ট-কর ব্যাধি ও বন্ধন বিশেষ। গ্রন্থের মোহে কত সাধককে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও স্থানত্যাগে অসমর্থ দেখিয়াছি। অহো দুর্ভাগ্য, সাধন ভুলিয়া শেষে গ্রন্থ সংগ্রহেই সে মজিয়া যায়!

* * * *

পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা মিথ্যাভূত দ্বৈতপদার্থের সত্যতা বুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে পরিত্যক্ত হইয়া বিষয়ে বৈরাগ্য অর্থাৎ জগতে অসত্যতাবুদ্ধি দৃঢ় হইলে, বিষয়ে যখন চিত্ত উপরাম হয়, তখন সমাধির অধিকার হইয়া থাকে। সমাধি অভ্যাসের প্রথম অবস্থায়ই কেহ ব্রহ্ম-আত্মাকে ধারণা করিতে পারেন না। ধারণার জন্য ক্রমশঃ বাহিরে ও ভিতরে সবিকল্পক (সম্প্রজ্ঞাত) এবং নির্ব্বিকল্পক (অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধির অভ্যাস করিতে হয়।

'সরস্বতীরহস্যোপনিষদে' ও 'দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে' উক্ত সমাধিদ্বয় বর্ণনে কথিত হইয়াছে,—

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্ ।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

—'অস্তি' বিদ্যমান রহিয়াছে, 'ভাতি' প্রকাশ পাইতেছে, 'প্রিয়ং' প্রীতির আস্পদ, 'রূপং' জগতের বিবিধ রূপ, 'নাম' বিবিধ রূপের বিবিধ নাম। এই সকলগুলি মিলিয়া পঞ্চাংশ বিশিষ্ট একই বস্তু। এই পাঁচটি লইয়াই জগতের যা কিছু এবং সমস্ত ব্যবহার। এই সকল অংশের মধ্যে 'আদ্যত্রয়ং' প্রথম তিনটি অর্থাৎ 'অস্তি'-সৎ-সত্তা, 'ভাতি'-চিৎ-স্ফূর্ত্তি-প্রকাশ ও 'প্রিয়'-আনন্দ-প্রীতি এই অংশ তিনটি ব্রহ্মের রূপ, তদ্ভিন্ন দুইটি অর্থাৎ নাম ও রূপাত্মক অংশ দুইটি জগতের রূপ ॥ ২০ ॥

. উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দতৎপরঃ।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ ॥ ২২ ॥

—পূর্ব্বোক্ত নাম ও রূপ অংশ দুইটিকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ ঐ দুইটিকে অগ্রাহ্য করিয়া (উদাসীন ভাবে দেখিয়া) এবং সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মায় একচিত্ত হইয়া, হৃদয়ে অথবা বাহিরে (শরীরের বাহ্যদেশে) সর্ব্বদা সমাধির (অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মাত্মারূপে চিত্তের স্থায়ী ভাবের) অভ্যাস করিবে ॥ ২২ ॥

সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধি র্দ্বিবিধো হৃদি ।
দৃশ্যশব্দানুবিদ্ধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা ॥ ২৩ ॥

—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত। সবিকল্প সমাধি আবার দৃশ্যানুবিদ্ধ (দৃশ্যের সহিত মিশ্রিত) সবিকল্পক এবং শব্দানুবিদ্ধ (শব্দের সহিত মিশ্রিত) সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকারের। [তাহা হইলে, হৃদয়ে তিন প্রকার সমাধি হয়;—(১) দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি, (২) শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি, এবং (৩) নির্ব্বিকল্প সমাধি। এই তিন প্রকার সমাধি হৃদয়ে অভ্যাস করিতে হয়] ॥ ২৩ ॥

কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যাস্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনম্।
ধ্যায়েদ্ দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পগঃ ॥ ২৪ ॥

—চিত্তগত কাম-ক্রোধ-সঙ্কল্পাদি বৃত্তিসমূহ*—দৃশ্যবস্তু এবং

* চিত্তগত বৃত্তিসমূহ—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বংমন এব"। (বৃ, উ, ১৷৫৷৩) [কাম-স্ত্রীসমালিঙ্গনাদির অভিলাষ; সঙ্কল্প-সম্মুখে উপস্থিত রূপাদিবিষয়ে বিশেষাবধারণ, অর্থাৎ ইহা শুক্ল ইহা নীল ইত্যাদি প্রকার; বিচিকিৎসা—সংশয়াত্মক জ্ঞান; শ্রদ্ধা—অদৃষ্টার্থ পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আস্তিক্য-বুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান, বিশ্বাস); অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধার বিপরীত; ধৃতি—ধারণা করা, অর্থাৎ দেহাদির অবসন্নতাদশায় উত্তম্ভন—উত্তেজনা করা; অধৃতি—ধৃতির বিপরীত; হ্রী—লজ্জা; ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধশক্তি; ভী—ভয়; এ সমস্ত মনই, এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ।]—পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ।

"সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি"। (ঐতরেয় উ, ৩৷১৷২)—[সংজ্ঞান—চেতনভাব, যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত

ইহাদের প্রকাশক আত্মচৈতন্য ইহাদের দ্রষ্টা। এইরূপে আত্মাকে প্রত্যক্-চৈতন্যকে (কামাদি দৃশ্য পদার্থের প্রকাশক ও দ্রষ্টা, কামাদি হইতে স্বতন্ত্র ও নির্বিকাররূপে) ধ্যান করিবে অর্থাৎ উক্ত কামাদি অন্তঃকরণবৃত্তির প্রত্যেকটিকে প্রতিযোগী (দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তু) করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির সাক্ষীকে নিজের যথার্থস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্বদা সেই আত্মচৈতন্যের ধ্যান করিবে। এইরূপে কামাদিদৃশ্য বস্তুসমূহকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সাক্ষিরূপে অন্তরাত্মস্বরূপ চৈতন্যমাত্রের ধ্যানকে 'দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি' বলে ॥ ২৪ ॥

অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽহয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ ২৫ ॥

—চৈতন্যস্বরূপ (চেতনভাবরূপ) আমি কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্ত হইতে অসঙ্গ ["অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃহদা, উ, ৩।৪।৫)], সচ্চিদানন্দ—দুঃখলেশশূন্য আনন্দস্বরূপ ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১), "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদা, উ, ৩।৯।৩৭)], স্বয়ংপ্রকাশ ["অদৃষ্টং দ্রষ্টাশ্রুতং শ্রোতৃ" (বৃ, উ,

---

হয়। আজ্ঞান—প্রভুভাব। বিজ্ঞান—চৌষট্টি কলাবিষয়ক জ্ঞান। প্রজ্ঞান—প্রতিভা। মেধা—গ্রন্থার্থ-ধারণক্ষমতা। দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি। ধৃতি—ধারণা করা। মতি—মনন, কর্ত্তব্যচিন্তা। মনীষা—কর্ত্তব্য চিন্তায় নিজের স্বাধীনতা। জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ। স্মৃতি—স্মরণ। সঙ্কল্প—নীলপীতাদি বিষয়ক বিকল্প। ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)। অসু—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-নির্বাহক প্রাণবৃত্তি। কাম—তৃষ্ণা। বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা।]—ঐ কৃত অনুবাদ।

৩।৮।১১)] ত্রিবিধভেদশূন্য ["একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১)]—এই প্রকার আত্মচৈতন্য মাত্রভাবে ভাবিত হইয়া চিদাভাসমাত্রে অবস্থান করাকে 'শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি' বলে ॥ এই সমাধির অভ্যাস দ্বারা কামক্রোধ সঙ্কল্পাদি অন্তঃবৃত্তি সমূহ নির্বীজ হইয়া যায় এবং বিজাতীয় প্রবাহরহিত সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ মাত্র বর্ত্তমান থাকে ॥ ২৫ ॥

স্বানুভূতিরসাবেশাৎ দৃশ্যশব্দানুপেক্ষিতুঃ।
নির্বিকল্পসমাধিঃ স্যান্নিবাতাস্থিতদীপবৎ ॥ ২৬॥

দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ এই দুই প্রকার সবিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতে করিতে 'স্ব' নিজের 'অনুভূতি'-তে প্রত্যক্-চৈতন্যে (জীবাত্মাতে) 'রসের' আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার 'আবেশ' ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ হইলে (একাকারতা প্রাপ্তি হইলে) অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্যভূত জ্ঞানানন্দরসের আবির্ভাব হইলে, সাধক যখন 'কামসঙ্কল্পাদি দৃশ্যকে' অর্থাৎ মনকে এবং 'অসঙ্গাদি' শব্দকে উপেক্ষা করেন (অনাদর করেন) অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ তাহারা চিত্তে উঠিতে থাকিলে ও তাহাদের প্রতি উদাসীন হন অর্থাৎ যখন দৃশ্য ও শব্দ উভয়ই ছাড়িয়া যায়, তখন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখার অচঞ্চলাবস্থা তাঁহার লাভ হয়। আনন্দস্বরূপে এইরূপ নিশ্চলচিত্ত অবস্থায় স্থিতিলাভ করাকেই চিত্তনিশ্চলতারূপ 'নির্বিকল্প সমাধি' বলে ॥—সবিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতে করিতে ইহা আপনা হইতেই আসিয়া থাকে অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির অভ্যাস-

পরিপক্কতাই নির্বিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। এই অচঞ্চল অবস্থা 'বাশিষ্ঠ রামায়ণে' এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"সংশান্ত সর্বসংকল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রা বিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ স্মৃতা॥" (উৎ, প্র, ১১৭।৯)

—'যে অবস্থায় সকল প্রকার সঙ্কল্প একেবারে নিরোধ হওয়াতে চিত্ত, প্রস্তরের আভ্যন্তর ভাগের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করে, কিন্তু যাহা মূর্চ্ছা নহে বা সুষুপ্তি ও নহে, তাহাকেই স্বরূপস্থিতি বলে'।

উক্ত অবস্থা 'মুক্তিকোপনিষদে' নিম্নলিখিতভাবে উক্ত হইয়াছে—

"প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দ দীপকম্।
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ॥" (৬।১৯)

—'চিত্তের সর্বপ্রকার বৃত্তি প্রশমিত হইয়া যাইলে, চিত্ত পরমানন্দকে প্রকটিত করিয়া থাকে, তাহাকেই 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে'।

'মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে' উক্ত হইয়াছে—

"লয় বিক্ষেপরহিতং মনং কৃত্বা সুনিশ্চলম্।
যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎপরমং পদম্॥"

—নিদ্রা ও বিষয়স্মৃত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মন যখন স্বস্বভাব চাঞ্চল্য ত্যাগ করতঃ সুস্থির হয় এবং আত্মচিন্তনে বিভোর থাকে,

সেই অবস্থায় জীবের পরম পদ লাভ হয় অর্থাৎ সর্ববৃত্তি শূন্য নিরুদ্ধ মনোরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগে অপুনরাবৃত্তি লাভ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥" (৬।১৯)

—বায়ুশূন্যস্থানে অবস্থিত প্রদীপের শিখা যেমন বিচলিত হয় না (নিশ্চলভাবে থাকে), আত্মসমাধির অনুষ্ঠাতা সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের তাহাই উপমা।

এইরূপে হৃদয়ে (শরীরের অভ্যন্তরে) অভ্যাসযোগ্য তিন প্রকার সমাধির কথা বলা হইল। এক্ষণে শরীরের বাহ্যদেশে যে তিনপ্রকার সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা বর্ণনা করা হইতেছে।—

হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমাধিরাদ্যঃ সন্মাত্রান্নামরূপ পৃথক্ কৃতিঃ॥ ২৭॥

অর্থাৎ যেমন হৃদয়ে 'দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি' অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ দেহের বহির্দেশেও এই সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপে? বলা যাইতেছে—নিজের ইচ্ছামত যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া [বস্তুমাত্রই সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচ অংশ বিশিষ্ট] সেই বস্তুর সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপী ব্রহ্মস্বরূপ হইতে তদুপরি অধ্যস্ত নাম ও রূপকে পৃথক্ করিতে

হইবে। পরে সেই নাম ও রূপকে উপেক্ষা করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) নাম ও রূপের অধিষ্ঠান সৎ-চিৎ, আনন্দ-স্বরূপই শ্রুতিসিদ্ধ 'ব্রহ্ম' এবং তাহাই 'আমি', এইরূপ অনুচিন্তত করিতে হইবে। এইরূপ অনুচিন্তনকেই 'বাহ্য দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি' বলে। —সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই এই সমাধির লক্ষ্য ॥ ২৭॥

অখণ্ডৈকরসং বস্তু সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্।
ইত্যবিচ্ছিন্ন চিন্তেয়ং সমাধির্মধ্যমো ভবেৎ ॥ ২৮॥

অর্থাৎ দেশ-কাল-বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত এই ত্রিবিধভেদ রহিত সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ যে বস্তু, তাহাই 'ব্রহ্ম' এবং তাহাই 'আমি,' এইরূপ যে অবিচ্ছিন্ন চিন্তা অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়রহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহে মনোভিনিবেশ (চিত্তের সমাধান) তাহাই 'বাহ্য শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি' ॥ ২৮॥

স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাৎ তৃতীয়ঃ পূর্ববন্মতঃ।
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্‌ভি র্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ 'পূর্ববর্ণিত আভ্যন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে যেরূপ, সেইরূপ এইস্থলেও দুইপ্রকার সবিকল্প সমাধির অভ্যাসে পটুতালাভ করিয়া ভূমানন্দের আস্বাদন বশতঃ ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চকে এবং "অখণ্ড" "একরস" ইত্যাদি শব্দসমূহকে উপেক্ষা করিয়া, চিত্ত, আস্বাদিত ভূমানন্দের বশীভূত হইয়া যাইলে নিবাতদেশে স্থাপিত দীপের ন্যায় চিত্তের যে "স্তব্ধীভাব" নিশ্চলভাব, হয়, তাহাই

"তৃতীয়ঃ মতঃ"—'নির্বিকল্প সমাধি' বলিয়া সুধীগণের অভিপ্রেত। [পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ]।

অন্তরে ও বাহিরে এই ছয়প্রকার সমাধি অভ্যাস করিয়া মুমুক্ষু সর্ব্বদাই কালযাপন করিবেন অর্থাৎ স্বভাবসমাধিতে আরূঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে আদরপূর্ব্বক সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে॥—এই সমাধিতে ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপ সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়। এই ছয় প্রকার সমাধির মধ্যে যে কোনও একটিকে অবলম্বন না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান করিতে নাই॥ ২৯।

আর্য্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"বিলাপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সম্ভব-ব্যত্যয় ক্রমাৎ।
পরিশিষ্টং চ সন্মাত্রং চিদানন্দং বিচিন্তয়েৎ॥"

অর্থাৎ উৎপত্তির বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বিলোমক্রমে (সংহারমার্গে) সমস্ত বিকৃতির প্রবিলাপন করিয়া অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়সমূহকে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়সমূহকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত তাহার অধিষ্ঠিত পুরুষে এবং পুরুষ স্বকীয় মহিমায় পরমপুরুষে— এইরূপে বিলোমক্রমে বিলীন করিয়া, অবশিষ্ট চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র সদ্‌বস্তুকে চিন্তা করিবে।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"পৃথিব্যপ্সু, পয়ো বহ্নৌ বহ্নির্বায়ৌ নভস্যসৌ।
নভশ্চাব্যাকৃতে তচ্ চ শুদ্ধে শুদ্ধোঽস্ম্যহং হরি॥"

অর্থাৎ ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অব্যাকৃত মায়োপাধি পরমেশ্বরে এবং সেই মায়োপহিত পরমেশ্বরকে শুদ্ধব্রহ্মে, প্রবিলাপিত করিবে এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রপঞ্চের হরণকর্ত্তা হরি বা শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে।

"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪) আরম্ভরণ বাক্য হইতে এবং একাত্মতা প্রতিপাদক বাক্য হইতে জানা যায় যে কার্যও কারণ এক, কার্য কারণ হইতে অভিন্ন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন (১) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (৬।১।৪) বিকার অর্থাৎ কার্যপদার্থ কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র, মৃত্তিকাই (ঘটশরাবাদি দ্রব্যে) সত্য পদার্থ এবং (২) "ঐতদাত্ম্যম্ ইদংসর্বম্" (৬।৮।৭) ঐকাত্ম্য প্রতিপাদক বাক্য সমূহ হইতেও জানা যাইতেছে কার্যমাত্রই কারণাতিরিক্ত নহে। কারণকে ছাড়িয়া কার্য থাকিতে পারে না। যেমন মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া ঘট থাকিতে পারে না, সেইরূপ রূপরসাদিকে ছাড়িয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি থাকিতে পারে না। শব্দস্পর্শাদিই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া বাহিরে প্রতীত হইতেছে। ইহাদের সত্তা শব্দস্পর্শাদির সত্তা হইতে পৃথক নহে,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে বহির্জগৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইয়া যায়, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র ব্যতীত বহির্জগতের অপর কোন স্বতন্ত্র সত্তাই উপলব্ধ হয় না।

তৎপরে, পঞ্চ তন্মাত্র ও মনের সত্তাতেই সত্তাবান্। মন

দেখিলেই চক্ষু দেখে, মন শুনিলেই কাণ শুনে, মন স্পর্শ করিলেই ত্বক স্পর্শ করে ইত্যাদি। মনের সত্তাতেই যাহার সত্তা, তাহাও মনোমাত্রই। এরূপ বিচার করিতে করিতে পঞ্চ তন্মাত্রতা দূর হইয়া মনোমাত্রতা অবশিষ্ট থাকে। তখন জগৎও নাই, পঞ্চ তন্মাত্রও নাই, থাকে কেবল মন। এই অবস্থাতে, স্বপ্নাবস্থাতে যেমন ক্ষণে ক্ষণে বিষয়ের উৎপত্তি ও লয় হয়, সেইরূপ বিষয়ের সংস্কার উঠিয়াই মনে লীন হইতে থাকে। জগৎ স্বপ্নে পরিণত হয়।

এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব মনোমাত্রতাও ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছু নহে,—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মনকে ব্রহ্মাকার করিবার সময় অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মের মূর্ত্তি ঈশ্বররূপ সাধকের মনোগোচর হইয়া থাকে। এই ঈশ্বর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া মনে হয়। এই ঈশ্বররূপে চিত্তসমাধানের নাম 'সবিকল্প সমাধি'।

"ব্রহ্মাকার-মনোবৃত্তি-প্রবাহোঽহং কৃতিং বিনা।
সম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস-প্রকর্ষতঃ ॥"

—'ধ্যানের অভ্যাস উৎকর্ষতা লাভ করিলে, যখন মনোবৃত্তিসমূহ ব্রহ্মাকার গ্রহণ করিয়া প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে, অথচ তাহাতে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি ধ্যান করিতেছি'—এরূপ বোধ থাকে না, তখন তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি'।

এখানে মন অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মাত্মাকে বিষয় না করিয়া মনঃকল্পিত বা শাস্ত্রবিশ্রুত ঈশ্বররূপকে বিষয় করিয়া সত্ত্বগুণের

উৎকর্ষতা ও দ্বৈতাভাব হেতু একপ্রকার আনন্দের অনুভব করিয়া থাকে। ইহাকে 'রসাস্বাদ' বলে। ব্রহ্ম সর্বাত্মক, "রসো বৈ সঃ," জীবাত্মাও সেই রসরূপ সর্বাত্মক ব্রহ্মের অন্তর্ভূত বলিয়া, জীবাত্মাকেও সেই রসরূপ বলিয়া স্বীকার করার নাম 'রসাস্বাদ'। "রসাস্বাদো ধন্যোঽহম্ মিত্যাত্মানন্দাকারাবৃত্তিঃ"—'আমি ধন্য হইয়াছি,' এইরূপ আনন্দাকারাবৃত্তিকে 'রসাস্বাদ' বলে। এই অবস্থায় ধ্যেয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সমাধির পরে ব্যুত্থানকালে উক্ত রসাস্বাদের আনন্দানুভূতির স্মৃতি বহুক্ষণ থাকে। এই অবস্থায়ও অজ্ঞান বর্তমান থাকায় স্বরূপানন্দের উপলব্ধি হয় না।

এই রসাস্বাদকেও সমাধির বিঘ্ন ও মায়াময় জানিয়া যখন ত্যাগ করা যায়, তখন কোন মূর্ত্তিও থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না, লয় বা নিদ্রা, বিক্ষোভ বা দ্বৈতপ্রপঞ্চও থাকে না। মন-বুদ্ধি চিত্ত-অহঙ্কার সব একাকার হইয়া অনির্বচনীয় এক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া স্বতঃই আনন্দরূপ হইয়া যায়। এখানে ধ্যেয় ও থাকে না। ইহা ত্রিপুটীশূন্য অবস্থা। আত্মা স্বয়ংজ্যোতি বলিয়া বুদ্ধ্যাদির অভাবেও নিজেই নিজকে অনুভব করে। ইহাই 'নির্বিকল্প সমাধি'। এইরূপ সমাধি একবার হইলে চিত্ত উক্ত অবস্থা ত্যাগ করিয়া বিষয়ের দিকে যাইতে চায় না। প্রবল প্রারব্ধ বশে, স্বরূপাবস্থা হইতে, চিদাভ্যাসের আকারে ব্যুত্থিত হইয়া যদি কখন জীব জগৎ প্রভৃতি দেখেন, তবে তৎসমুদায় মিথ্যা বলিয়াই জানেন। অথবা যদি বা পূর্বের অভ্যাসবশে কখনও ভোগোন্মুখ হন, তখনও সমাধির নেশা বর্তমান থাকায়, ভোগের ভিতরেও ব্রহ্মানন্দেরই আস্বাদন

করিতে থাকেন। যেমন উপপতির প্রতি অনুরক্তা নারীর বুদ্ধি সকলপ্রকার ব্যবহার কার্যের মধ্যেও উপপতিকেই ধ্যান করিয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি, সেই নারীর উপপতি চিন্তার ন্যায়, নিরন্তর তত্ত্বেরই ধ্যান করিয়া থাকে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্।
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগত
স্তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি॥" (উপশমে প্রকরণ, ৭৪।৮৩, ৮৪)

—পরমপুরুষানুরক্তা দুষ্ট চরিত্রা নারী গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃতা থাকিয়াও পরপুরুষ-সঙ্গজনিত সেই পূর্বাস্বাদিত আনন্দ মনে মনে আস্বাদন করিতে থাকে। সেইরূপ যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে ব্যবহার পরায়ণ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে সেই পরমতত্ত্বই (ব্রহ্মানন্দই) আস্বাদন করিয়া থাকেন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সকল তখন (সে অবস্থায়) তুরীয় হইয়া যায়। উক্তং চ—

রাগ-দ্বেষ-ভয়াদীনা মনুরূপং চরন্নপি।
যোহন্তর্ব্যোম-বদচ্ছন্নঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥—বরাহোপনিষৎ

—অন্তরে আসক্তি, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি ভাব উপস্থিত, হইলে, যে তদনুরূপই আচরণ করে, অথচ অন্তরে আকাশের ন্যায় উহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

যাবৎ শরীরং তাবদ্ধি দুঃখেঃ দুঃখং সুখে সুখম্।
অসংসক্তধিয়ো ধীরা দর্শয়ন্ত্য-প্রবুদ্ধবৎ ॥—যোগবাশিষ্ঠে
(স্থিতি)

—শরীর থাকা পর্য্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীর ন্যায় দুঃখকর বিষয়ে দুঃখ এবং সুখকর বিষয়ে সুখ দেখাইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার মন উহাতে অনাসক্ত থাকে।

ক্বচিন্ মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজ-বিভবঃ
ক্বচিদ্ ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদ-জগরাচার-কলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদ-বমতঃ ক্বাপ্য-বিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সতত-পরমানন্দ-সুখিতঃ ॥ বিবেকচূড়ামণি

—জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তরে সতত পরমানন্দ অনুভবকরতঃ কখন মূর্খের ন্যায়, কখন বিদ্বানের ন্যায়, কখন মহারাজার ন্যায়, কখন ভ্রান্ত, কখন সৌম্য, কখন অজগর সর্পের ন্যায় একস্থানেই পড়িয়া থাকে এবং তদবস্থায় যাহা পায় তাহাই মাত্র খায়, কখন দান গ্রহণকারী, কখন অপমান প্রাপ্ত, কখন বা অবিদিত হইয়া বিচরণ করে।

সাধারণ লোকের অর্থ ও কাম-ই পরম পুরুষার্থ। তদপেক্ষা বিচারবান্ ব্যক্তি ধর্মকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াই জানেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অর্থ, কাম ও ধর্মের অনিত্যতা বিচার করিয়া ও বুঝিয়া উহাদের প্রতি স্বভাবতঃ বিরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন,—ইঁহারা উত্তম শ্রেণীর লোক। ইঁহাদের মধ্যেও অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যাঁহারা

স্ত্রী, পুত্র ও বিত্তাদিকে দুঃখের কারণ জানিয়া বিচারপূর্ব্বক ঐ সকল ত্যাগ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, এবং আশ্রমে বাস করিয়া মোক্ষের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা অধম শ্রেণীর। (২) আশ্রম বা মঠও একপ্রকার স্ত্রীহীন সংসার, এরূপ বিচার করিয়া যাঁহারা সর্ব্বাশ্রম ত্যাগ করতঃ অনিকেত-বাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বিচার করেন, তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর। (৩) যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াও ভূমিকারূঢ় হইয়া ব্যুত্থানরহিত অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য প্রবল পুরুষকার আশ্রয় করেন, তাঁহারা উত্তম শ্রেণীর মধ্যে উত্তম। ব্রাহ্মীস্থিতির পরাকাষ্ঠা ইঁহারাই লাভ করিতে পারেন। নিরঙ্কুশ ব্রহ্মানন্দলাভ ও ইঁহাদের দ্বারাই হইতে পারে। সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা ব্রাহ্মীস্থিতির পুরুষার্থই সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব, তজ্জন্যই মুমুক্ষু মাত্রের যত্নশীল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অস্তু—

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥ আত্মবোধ, ৬৬

—'যে জীব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা প্রদীপ্ত, জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমুজ্জ্বল, যিনি সর্বপ্রকার মল হইতে বিমুক্ত, তিনি সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন'।

"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্।
অলেপকং সর্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্ত ওম্॥"

—'যিনি দ্রষ্টৃস্বরূপ ও আকাশের ন্যায় সর্বাতিশায়ী, যিনি একবার

মাত্র বিস্ফুরিত হইয়াছেন (অর্থাৎ সদাই স্পষ্ট ভাসমান), যিনি জন্মহীন, সমরস, নির্বিকার, নিরঞ্জন (কর্মাদিলেপশূন্য), সর্বগত ও অদ্বিতীয়, আমি চিরদিনই সেই বস্তু, সেই হেতুই আমি মুক্ত। হাঁ, তাহাই বটে ॥'

"দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো নমেঽস্তি কশ্চিদ্বিষয়ঃ স্বভাবতঃ।
পুরস্তিরশ্চোর্দ্ধমধশ্চ সর্বতঃ সম্পূর্ণ ভূমা ত্বজ আত্মনি স্থিতঃ ॥"

—'আমি জ্ঞানস্বরূপ, সেইহেতু পরমার্থতঃ শুদ্ধ, নির্বিকার স্বভাব, যেহেতু আমার স্বরূপতঃ কোন বিষয় সংসর্গ নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধদিকে, অধোদেশে সর্বত্রই আমি সম্পূর্ণ ভূমা, আমি আবির্ভাব-বর্জিত, যেহেতু আমি আপন মহিমাতেই অবস্থিত রহিয়াছি অর্থাৎ অনন্যাধীন ॥'

"অজোঽহমরশ্চৈব তথাজরোঽমৃতঃ স্বয়ংপ্রভঃ সর্বগতোঽহমদ্বয়ঃ।
ন কারণং কার্য্যমতীব নির্মলঃ সদৈব তৃপ্তশ্চ ততো বিমুক্ত ওম্ ॥"

—'আমি সদাই অজ ও অমর, অজর ও অমৃত, স্বপ্রকাশ, সর্বগত ও অদ্বয়; আমি কারণও নহি, কার্যও নহি; আমি অতীব নির্মল ও সদাই তৃপ্ত; সেইহেতু আমি বিমুক্ত। হাঁ, আমি তাহাই বটে (শিষ্যোক্তি) ॥'

['উপদেশসহস্রী'-তে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য]

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ষষ্ঠ অংশ

উপাস্য—ধ্যান ও স্মরণের বস্তু

উপাস্য—ধ্যান ও স্মরণের বস্তু

অনন্ত শাস্ত্রের, বহু বেদিতব্যের মধ্যে যাহা সারভূত, সেই চৈতন্যই একমাত্র উপাস্য। চৈতন্য নিরবয়ব, চৈতন্য নিরাকার। চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করেন অবয়ব ধরিয়া—চৈতন্য প্রকটিত হ'ন উপাধির মধ্য দিয়া। উপাধি ক্ষুদ্র, উপাধি খণ্ড, চৈতন্য কিন্তু ভূমা, চৈতন্য অখণ্ড। চৈতন্যের রূপ খণ্ড মত দেখা গেলেও, রূপ চৈতন্যকে খণ্ড করিতে পারে না—অখণ্ড চৈতন্য খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও, খণ্ড খণ্ড উপাধির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইলেও, চৈতন্য চিরদিনই অখণ্ড, তিনি কখন খণ্ডিত হন না।

"আমি আছি"—এই অনুভবে যে চৈতন্যকে ধরা যায়, তিনিও নিরবয়ব, নিরাকার, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। এই চৈতন্যও আত্ম-প্রকাশ করেন দেহ ধরিয়া। সকল জীবেরই এই জড় দেহ আছে। কিন্তু চৈতন্য আপন চিৎপ্রভা দিয়া আর একটি দেহ ধারণ করেন, সেটি তাঁহার চিন্ময় দেহ। এই চিন্ময়দেহবিশিষ্ট আত্মাই—এই চিৎশক্তিবিশিষ্ট আত্মাই—এই চিন্ময়দেহধারী আত্ম-চৈতন্যই—এই মহাশক্তি পরমাত্মাই উপাস্য দেবতা—ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী।

সামান্য চৈতন্য যিনি, তিনি ধ্যানের বস্তু নহেন। 'সামান্য চৈতন্য' যখন মায়িক উপাধি ধরিয়া 'বিশেষ চৈতন্য' হয়েন, তখন

ইনিই ধ্যানের বস্তু। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বস্তু ন'ন কিন্তু ইনিই যখন উপাধি ধরিয়া সগুণ হ'ন, যখন ঘনচিৎপ্রকাশ হ'ন, তখন এই ঘনচিৎপ্রকাশই উপাসনার বস্তু। ঘনচিৎপ্রকাশ যিনি, তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বব্যাপী আবার মূর্ত্তিধারী। সকল স্থানে তিনি আছেন, আবার সর্ব্বত্র মূর্ত্তি ধরিয়াও তিনি প্রকাশমান—ইনিই **ধ্যানের বস্তু**। চৈতন্য ভাবিয়া, চৈতন্য দেখিয়া, সাধক যখন 'চেতন' হইয়া যান, তখনই সিদ্ধি।

পরম শান্ত, চলন রহিত, পরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তি-বিজড়িত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব। এখানে চৈতন্য ও চৈতন্যশক্তি—চিৎ ও চিৎশক্তি চন্দ্রে চন্দ্রিকার ন্যায়, সূর্য্যে দীধিতির ন্যায়, পাবকে উষ্ণতার ন্যায় অভিন্ন হইয়াই থাকেন। শাস্ত্র বলেন 'পাবকস্যোষ্ণতেবেয়-মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকে বেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥' স্বভাবতঃ অস্পন্দ-স্বভাবে সঙ্কল্প-বিকল্পময়ী স্পন্দস্বভাব জাগে—ইহাই মায়া। যখন ব্রহ্মের সহিত ইনি এক হইয়া থাকেন, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু আছে ইহাও বলা যায় না, নাই ও বলা যায় না। এইজন্য মায়াকে 'অনির্ব্বাচ্যা' বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মে যে বরণীয় ভর্গ সর্ব্বদা মিলিত, তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হয় "সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমাদেবী শিবাঽভিন্না শিবঙ্করী॥" মায়াধিষ্টান চৈতন্যই উপাস্য।

অস্পন্দে যখন স্পন্দ এক হইয়া থাকে—তখন কোন কিছুই ত ধরিবার উপায় নাই। অবিজ্ঞাতস্বরূপকে দেখিবে কিরূপে?

ভজিবেই বা কিরূপে ? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিময় না হইতেন, তবে কি স্বপ্রকাশের কোন প্রকাশ ইন্দ্রিয়গোচর হইত ? স্বপ্রকাশের দ্বিতীয় প্রকাশ স্পন্দ-প্রকাশে—অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তি এই স্পন্দন। স্বপ্রকাশের প্রকাশ এই স্পন্দনরূপ উপাধি-গ্রহণে।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত যিনি, তাঁহার আত্মপ্রকাশ জন্য প্রথম উপাধি 'জ্ঞান'—ইহাই বিদ্যাপাদ। দ্বিতীয় উপাধি 'আনন্দ' —ইহাই আনন্দপাদ। তুরীয়ের বিদ্যা ও আনন্দ উপাধি— ইহাই নিরাকারের নিরুপাধিক সাকারত্ব। তুরীয় যিনি, তিনি নিরাকার। তুরীয় যখন বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) উপাধি গ্রহণ করেন, ইনি যখন আনন্দ উপাধি গ্রহণ করেন, ইনি যখন বিদ্যানন্দ মিশ্রিত উপাধি গ্রহণ করেন, তখন ইহাকে 'নিরুপাধিক সাকার' বলা হয়। সাকার কিন্তু অনিত্য, নিরাকারই নিত্য। তবে, বিদ্যা ও আনন্দ তুরীয়ের সহিত অভিন্ন হওয়াতে বিদ্যাপাদ ও আনন্দ-পাদকে 'নিত্য' বলা হয়। ব্রহ্মের চারি পাদ—তুরীয়পাদ, বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও অবিদ্যাপাদ। তুরীয় পাদই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ; বিদ্যাপাদ ও আনন্দপাদ সাকার হইলে ও তুরীয় হইতে অভিন্ন ; আর অবিদ্যাপাদেই এই মায়িক সৃষ্টি।

স্পন্দনের এক নাম প্রাণ। আদি স্পন্দনের আদি নাম মহাপ্রাণ। "অনেজৎ একম্" যিনি, তিনি বিদ্যাপাদ ও আনন্দ-পাদ উপাধি ধরিয়া যখন বহির্ম্মুখে নৃত্য করিতে আসিতেছেন— এখনও নৃত্য আরম্ভ হয় নাই—শক্তিময়ের বক্ষে শক্তির স্পন্দন

উঠে নাই—মহাকালের বক্ষে মহাকালীর স্পন্দন আরম্ভ হয় নাই—অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় সর্ব্বশক্তি চৈতন্য আসিবেন তাহারই রেখাপাত হইয়াছে মাত্র—'অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের' মত, 'অনুত্তরঙ্গ অপাধারের' মত 'নিবাত নিষ্কম্পদীপ পর্ব্বতের' মত কি যেন কি বাহিরে আসিতে দাঁড়াইয়াছেন—এখনও সমস্তই নিজগর্ভে—এখনও স্থির—ইহারই নাম দেওয়া হইল 'ঝঙ্কার পরিপূরিত ওঁকার'। যাঁহার নাম নাই, যাঁহাকে প্রকাশ কারিবার ভাষা নাই, সেই অপ্রকাশের যে প্রকাশ, তাঁহাকে ভজন করিবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই 'ওঁকার'। ওঁকার পরব্রহ্মের প্রিয়তম নাম। নিরাকারের নিরুপাধিক সাকার অবলম্বন এই প্রণব। উপাস্য যিনি, তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই ওঁকার। শান্ত পরম ব্যোমে স্পন্দশক্তির আদি ক্রীড়াই ওঁকার। সর্ব্বসৌন্দর্য্যভরিত অত্যদ্ভুত জ্যোতিস্বরূপ পরমব্রহ্ম সাগরে অত্যদ্ভুত অতি সূক্ষ্মশক্তি লহরীই এই ওঁকার।

স্পন্দনভরা অস্পন্দের অভিব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই ঝঙ্কার-ভরা ওঁকার ঊর্দ্ধ সপ্তলোক ও অধঃ সপ্তলোক যেন আপন গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—মানুষ যেমন নিজের ভিতরে ত্রিভুবনের সঙ্কল্প ভরিয়া রাখে সেইরূপ। বহির্ম্মুখ হইয়া এই ওঁকার-ঝঙ্কার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি যেন ফুটাইয়া তুলিলেন। এই চতুর্দ্দশ ভুবন পরিপূরিত করিয়া যে শক্তিমান ও শক্তি একসঙ্গে চিদানন্দে ভাসিলেন, তিনিই বৈদিক আর্য্যের 'উপাস্য'।

যে প্রসিদ্ধ সবিতার—যে স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের কথা বেদ সর্ব্বত্র বলিতেছেন, এই উপাস্য সেই ভগৎ-প্রসবিতার ত্রিভুবন-বরণীয় (উপাসনীয়) মহাশক্তি। রাহু যেমন শির ভিন্ন অন্য অঙ্গবিশিষ্ট নহেন,—'রাহুর শির' এই বাক্যে যেমন রাহু ও শির অভিন্ন, সেইরূপ এই সবিতাই ভর্গ—মহাশক্তিই সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বশক্তিই সর্ব্বশক্তিমান। স্পন্দ ও অস্পন্দ-জড়িত পরম-পুরুষের প্রকট মূর্ত্তিই হইলেন উপাস্য দেবতা। বৈদিক আর্য্যের উপাস্য দেবতা হইতেছেন দীপ্তিশীল ও ক্রীড়াশীল। এস আমরা ইঁহাকেই ধ্যান করি—"তৎ সবিতুর্ভর্গো দেবস্য ধীমহি।" কেন ধ্যান করিব? কারণ এই দেবতা—এই শক্তিপূরিত শক্তিমান—এই সগুণব্রহ্ম-পুটিত নির্গুণ ব্রহ্মই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থে প্রেরণ করেন—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রেষ্ঠ অধিকারীর শ্রেষ্ঠধ্যান হইতেছে "আমিই তুমি" এই ভাবনায়। এই কথাই 'প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রের' প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—"প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং, সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্। যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্ত-মবৈতি নিত্যং, তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কল-মহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥" ইহা যিনি না পারেন, তাঁহার ধ্যান হইবে "আমি তোমার" ও "তুমি আমার" এই ভাবনায় ও ব্যবহারে। ইহাই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় এইভাবে বলা হইয়াছে—"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" ইহাও যেখানে ঠিক মত হয় না,

সেখানে হইবে প্রার্থনা "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।" অর্থাৎ যেখানে তোমাকে জানিবার মত জানিতেও পারি না, ধ্যানের মত ধ্যানও করিতে পারি না, সেখানে পূর্ণভাবে স্মরণে আসিয়া প্রার্থনা—মা! ঠাকুর! তুমি আমায় তোমার ক্রোড়ে লইয়া চল। বৈদিকের সঙ্গে তান্ত্রিকের মিলনে বৈদিক আর্য্যের পূর্ণ সাধনা হয়। এই জন্যই বৈদিক ব্যাপারের সহিত তান্ত্রিক ব্যাপার জড়িত। এইজন্য বৈদিক, তান্ত্রিক উভয়ই আবশ্যক।

ইষ্টদেবতা হৃদয়ে। তোমার, আমার, সবার ইষ্টদেবতা—তোমার, আমার, সবার হৃদয়ে সর্ব্বদা আছেন। ইনি আবার বাহিরেও সর্ব্বত্র। ইনি আর কেহ নহেন, ইনিই "চৈতন্যং মম বল্লভঃ"—ইনিই হৃদয়-বল্লভ চৈতন্য। স্ত্রী মূর্ত্তিতে চৈতন্য, পুরুষ মূর্ত্তিতেও চৈতন্য, আবার প্রণব মূর্ত্তিতেও চৈতন্য—সকল মন্ত্র-মূর্ত্তিতেও এই এক চৈতন্যই বিরাজমান। তবে ইষ্ট-মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন কেন হয় যদি জিজ্ঞাসা কর,—উত্তরে বলি—এক সূর্য্যের ছায়া যেমন কাল জলে কাল, লাল জলে লাল, সাদা জলে সাদা, সেইরূপ এক চৈতন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন মাত্র; কিন্তু প্রকাশস্বরূপ যিনি, তিনি একই। যেমন লাল, শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কাঁচ দেওয়া লণ্ঠনের ভিতর হইতে এক আলোককেই লাল দেখা যায়, শুভ্র দেখা যায়, কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের ভিতরে প্রতিফলিত হয়েন বলিয়া, সেই এককেই বহুরূপে দেখা যায়। এই চৈতন্য প্রকাশস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—ইনি নিত্যই আছেন, ছিলেন, থাকিবেন।

ইঁহার কোন আকার নাই। ইনি নিরবয়ব সত্য কিন্তু দেখিতে গেলেই ইনি আকারবান। যিনি ইঁহাকে যখন দেখিয়াছেন, তখন আকার বিশিষ্টই দেখিয়াছেন। মানুষে ইঁহার কল্পনা করে না—মূর্ত্তি ধরিবার সামর্থ্য ইঁহার আছে। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" সাধকগণের কল্যাণের জন্য ব্রহ্ম স্বয়ং রূপধারণ করেন। "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ"—ইনি জন্মান না সত্য "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" কিন্তু ভক্ত-চিত্তে তৃপ্তি দিবার জন্য ইনি রূপ ধরেন—জগতের পাপভার হরণ জন্য ইনি আত্মমায়া সাহায্যে নিরাকার থাকিয়াও নরাকার হয়েন, নার্য্যাকার ধারণ করেন। এই কথাই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' এইভাবে বলা হইয়াছে—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

এই 'ইষ্ট দেবতা'—এই চৈতন্য মূর্ত্তি জনে জনের হৃদয়ে 'আত্মা,' ইনিই সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও 'বিশ্বমূর্ত্তি' আবার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ করিয়া ইনি 'আপনি আপনি নির্গুণ'—আর ইনিই পটের ছবিতে, ধাতু পাষাণ কাষ্ঠের মূর্ত্তিতে, তীর্থে তীর্থে বহুরূপে বহুনামে ভাসেন। "স্ব-মায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা, নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ। সর্ব্বান্তরস্থো হি নিগূঢ় আত্মা, স্ব-মায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ॥" এই আমার, তোমার, সবার হৃদয়ের রাজা আপনার মায়া-প্রভাবে চর অচর (স্থাবর জঙ্গম) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া আকাশের ন্যায় সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন—সকলের অন্তরে নিগূঢ় আত্মারূপে ইনিই।—ইনিই

২৯

উপাস্য; ইনিই ধ্যানের বস্তু, ইনিই নিত্যস্মরণের বস্তু।

স্বর্ণ আপন স্বুবর্ণতা ত্যাগ না করিয়াই যেমন বলয়, কঙ্কন, চন্দ্রহার প্রভৃতি হয়, অখণ্ড চিৎচৈতন্যও অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যও আপন অদ্বৈতভাব—মূলচৈতন্য—জ্ঞান ত্যাগ না করিয়া দ্রবত্ব-ভাবনাবলে জল হ'ন, উষ্ণতা ভান করিয়া অগ্নি হ'ন, সুর-নর-বোধে সুর-নর হ'ন। এইরূপে ব্রহ্মচৈতন্যের একাধারে দুই রূপ হয়। অর্থাৎ চিন্ময় দেবভাব, ও বাহ্য দেহভাবে অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে এক মহাচৈতন্যই প্রকাশ পাইতেছেন। তাই বেদ বলিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

যিনি জগতের মূলে—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে দাঁড়াইয়া—জগৎকে—ব্রহ্মাণ্ডকে গতি দিতেছেন, জগতের নিখিল কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন, জগৎকে বিচিত্র আকারে আকার দিতেছেন, যিনি ইহাকে গড়িতেছেন, রাখিতেছেন, আবার যিনি ভাঙ্গিতেছেন, তিনি শক্তি। "তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্ম'ায়েতি বিশ্রুতা"—ব্রহ্মের এই স্বতঃসিদ্ধা শক্তি মায়া নামে শ্রুতিতে (বেদে) কথিত হইয়াছেন। তাই বলা হয়, শক্তির মূলে যিনি, তিনি ব্রহ্ম। অগাধ, অপরিসীম, স্থির, শান্ত (শ্রুতির ভাষায় "অনেজদেকং") চৈতন্য-সমুদ্রই ব্রহ্ম। এই সীমাশূন্য চৈতন্যের এক পাদে মাত্র শক্তি ভাসেন। পূর্ণ চৈতন্যে পূর্ণ শক্তি এক হইয়াই থাকেন—কিন্তু শক্তির অভিব্যক্তি এক দেশেই হয়। চৈতন্যকে চলন দেন, আকার দেন এই শক্তি

—আবার শক্তিকে চৈতন্য দেন এই ব্রহ্ম। উভয়ে যখন মিলিত থাকেন তখন যিনি "অনেজদেকং", তিনিই "মনসো জবীয়ঃ"—যিনি কম্পনশূন্য এক, তিনিই মন অপেক্ষা ও গতিশীল। একপাদে দৃষ্টি রাখ, দেখিবে "তৎএজতি" ব্রহ্ম চলিতেছেন—সর্ব্বপাদে দৃষ্টি রাখ, দেখিবে "তন্নৈজতি" ব্রহ্ম চলিতেছেন না; একপাদে দেখ, দেখিবে "তদ্দূরে" ব্রহ্ম বহুদূরে—পূর্ণপাদে দেখ, দেখিবে "তদ্বণ্ডিকে—তদ্ উ অন্তিকে" ব্রহ্ম সর্ববাপেক্ষা নিকটে আত্মারূপে। এই উভয়ে লক্ষ্য রাখিতে পার, বুঝিবে "আসীনো দূরং ব্রজতি" ব্রহ্ম একস্থানে সদা স্থির কিন্তু শক্তিযোগে দূরেও ভ্রমণ করিতেছেন আবার "শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" ব্রহ্ম একস্থানে শয়ন করিয়া আছেন সদা কিন্তু শক্তিযোগে সর্ব্বত্র যাইতেছেন। বল দেখি এই ব্রহ্ম ও শক্তির পূজা কে না করে? এই ব্রহ্ম ও শক্তিকে ছাড়িয়া কে বাঁচিতে পারে? ব্রহ্ম ছাড়া শক্তি অথবা শক্তিশূন্য ব্রহ্মকে কে কোথায় দেখিয়াছে? জাতি বা ব্যক্তি, সমষ্টি সৃষ্টি বা ব্যষ্টি সৃষ্টি এই চৈতন্য-জড়িত শক্তিই।

এক চিন্মাত্র প্রদীপ—চিত্তস্থানে থাকিয়াই সর্ব্বত্র অজস্র আলোক দিতেছেন। এই চেতনাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান হইয়াছে—"জ্বলতঃ সর্ব্বতোজস্রং চিত্তস্থানেষু তিষ্ঠতঃ। যস্য চিন্মাত্র-দীপস্য ভাসা ভাতি জগত্রয়ম্॥" জগৎ নাই, একথা ত বেদ বলেন না। তুমি যেভাবে জড়রূপে জগৎ দেখ, সেভাবে জগৎ নাই। তুমি যাহাকে জগৎ বলিতেছ—তিনি শক্তিই, তিনি ঈশ্বরই তিনি সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই। ব্রহ্মকেই তুমি অজ্ঞানে জগৎরূপে

দেখিতেছ, অখণ্ডকে খণ্ডরূপে দেখিতেছ, চেতনকে জড়রূপে দেখিতেছ। এক অখণ্ড চৈতন্য এক অখণ্ড শক্তি এক হইয়া ব্রহ্ম—আবার সেই অখণ্ড খণ্ডরূপে ভাসিয়া এই মূর্ত্তি।

যখন মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, তখন তাঁহাকে কে বলিবে, তিনি প্রকাশ বা অপ্রকাশ, চেতন বা জড়, জ্ঞানস্বরূপ বা অজ্ঞান-রূপ, সৎ অসৎ বা সদসৎ—তাই বলা হয় "যন্ন বেদা বিজানন্তি, মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্। ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। এই নির্গুণ ব্রহ্মের কথা যখন বলাই যায় না, তখন আর তার বিচার কি হইবে ? মহাপ্রলয়ে সমস্ত নাশ করিয়া, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ভক্ষণ করিয়া, তিনি আপনি আপনি থাকেন—ইঁহার উপাসনা হয় না—ইঁহাতে স্থিতিলাভ হইতে পারে। উপাসনা হয় শক্তিপূর্ণ চৈতন্যের—শক্তিরূপে প্রকাশিত চৈতন্যের—সগুণ ব্রহ্মের।

জ্ঞানটি ত সর্ববব্যাপী পদার্থ। ব্রহ্ম ত জ্ঞানস্বরূপ সর্ববব্যাপী। এই নিরাকার নিরবয়বের ধ্যান হইবে কিরূপে ? নিরাকারের ধ্যান হয় না—নিরাকারের উপাসনা হয় না—নিরাকারের কাছে বসা যায় না। নিরাকার যিনি তাঁহাতে বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে—বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা মাত্র চলিতে পারে—অন্তে নিরাকারে স্থিতি হইতে পারে।

এই যে বাহিরে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে, এটা কি ? উপরে সমন্তাৎ প্রসারিত আকাশ আর নীচে এই বিপুলা পৃথ্বী, এই জগৎটা কি ? আর ভিতরে জগতের নরনারী সদাসর্ববদা যে 'আমি'

'আমি' করিতেছে, এই 'আমি' ই বা কে ?—শক্তিরূপে প্রকটিত চৈতন্য অর্থাৎ শক্তিমাখা চৈতন্য অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎরূপ ধরিয়া বাহিরে আর ইনিই 'আমি' 'আমি' রূপে ভিতরে। যতদিন এই 'আমি' কে—এই 'আত্মা'কে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস না করিবে, ততদিন সেই আপনার হইতেও আপনাকে ভাল করিয়া স্মরণের সুবিধা করিতে পারিবে না; যতদিন এই বাহিরের জগৎটাকে ঈশ্বরের উপরে প্রতিবিম্বস্বরূপে না বুঝিবে, যতদিন অতিবিস্তৃত সীমাশূন্য স্ফটিকশীলাবৎ অতি শুদ্ধ অতি নির্ম্মল শক্তিরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত চৈতন্য পুরুষে জগৎ-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া নিরাকারকে আকার দিতেছে, এই বোধ না জন্মিবে—ততদিন সর্ব্বদা স্মরণের সুবিধা হইবে না। আরও যতদিন না এই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের চিদ্‌ঘনপ্রকাশ মূর্ত্তির—শক্তিজড়িত মূর্ত্তির—ইষ্টমূর্ত্তির—অবতার মূর্ত্তির ধারণা করিতে পারিবে, ততদিন সর্ব্বহৃদিস্থ ভগবানের সর্ব্বদা স্মরণের সুবিধা হইবে না। নিজের দেহস্থ আত্মাকে যেমন মানুষ সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে পারে, সেইরূপে আপনার স্বরূপ ঘনচিৎপ্রকাশ পরমপুরুষকে মানুষ সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারে।

স্বরূপ চিন্তায় যেমন নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারের চিন্তা সমকালে করিতে হয়, যেমন ভাবনা করিতে হয়—এক অখণ্ড জ্যোতি, এক অখণ্ড প্রকাশ সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া আছেন, আর কিছুই নাই, শুধু প্রকাশ, জগৎ নাই, জগতের কোন কিছু নাই, জগৎ তখন একটা সমন্তাৎ প্রসারিত অন্ধকার মাত্র, পূর্ণ প্রকাশে এই পরিপূর্ণ

অন্ধকারটা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; পরে এই পূর্ণ প্রকাশ যখন আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, 'নির্গুণ ব্রহ্ম' সগুণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন, যন্ত্র না হইলে যেমন শক্তির প্রকাশ হয় না, সেইরূপ সৃষ্টি না হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয় না— সেইজন্য সৃষ্টি যবনিকার অন্তরালে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই শক্তি-জড়িত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে সমষ্টি-সৃষ্টির ভিত্তিরূপে দাঁড়ান—এখনও তিনি নিরাকারই—ইনিই 'সগুণ ব্রহ্ম' নামে পরিচিত। কাজেই জগতের সমস্ত বস্তুই সেই জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, তাঁহার চেতনাতেই জগৎ চৈতন্য মত প্রকাশ পায়। ইহাতেও হয় না—তিনি তখন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের প্রতি বস্তুর মধ্যে 'আত্মা'রূপে প্রবেশ করেন— সমষ্টি ব্যষ্টির আত্মা সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যই। পূর্ণ চৈতন্য চিরদিনই পূর্ণ চৈতন্যই আছেন, ছিলেন, থাকেন, থাকিবেন ; তথাপি, ঘট উঠিলে ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশকে যেমন ঘটাকাশ নাম দেওয়া হয়, পরন্তু ঘটের মধ্যে আকাশের খণ্ড হওয়া যেমন কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কল্পনা যেমন মিথ্যাবুদ্ধি মাত্র, সেইরূপ পূর্ণ-প্রকাশের জীবভাবে আত্মপ্রকাশ ও মিথ্যাবুদ্ধি মাত্র, পূর্ণ আত্মার বদ্ধ জীবাত্মা সাজাও মৃষাবুদ্ধি মাত্র। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা হইয়াও হয় না—এই নির্গুণ, সগুণ, আত্মারূপী পরমপুরুষই ঘনচিৎপ্রকাশ হইয়া 'অবতার' হয়েন। মানুষের 'বুদ্ধি' আপ্যায়িত হইতে পারে এই চৈতন্য-বিচারে, এই আত্ম-বিচারে, এই বিম্বশূন্য প্রতিবিম্বরূপ জগৎ-বিচারে কিন্তু ভক্তের 'হৃদয়' পূর্ণ করিতে, ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়

তৃপ্তি করিতে, জগৎকে আপন আচরণ দিয়া আপ্যায়িত করিতে, জগতের পাপান্ধকার দূর করিয়া জগৎকে সত্য ধরাইতে এক অবতার ভিন্ন আর কোনরূপে হইতে পারে না। এই অবতারের, এই ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়া যে কেহ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, সে দ্বিজ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক বা ধার্ম্মিক হউক, মৃত্যুকালে এই রামের স্মরণে, এই রামকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারিলে, সে পরমপদ লাভ করিবেই—"দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোঽপি বা। ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃতা যাতি পরং পদম্।" কারণ পরমপুরুষই মায়াপোষাক পরিয়া অবতাররূপে প্রকট হন।

ইষ্টমূর্ত্তিটি ঘনচিৎপ্রকাশ। নিরাকার আত্মজ্যোতিই কৃপাবশ ঘন হইয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেন। ইঁহারই ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। মনকে ভ্রূমধ্যে অথবা হৃদয়পদ্মে কিম্বা সহস্রারে ধারণ করিয়া ঐ সুন্দর ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে হয়।

ব্রহ্ম আপন স্বরূপে স্বপ্রকাশ। ইনি এই অবস্থায় ব্যাপ্যও নহেন, ব্যাপকও নহেন। যখন তিনি আপনি আপনি থাকেন—যখন নিগুর্ণ-ভাবে থাকেন, তখন ত আর কিছুই নাই—ব্যাপ্য ব্যাপক-ভাব থাকিবে কোথা হইতে? ইঁহার তখন কোন আধারও নাই, কোন আধেয়ও নাই। আর কিছুই নাই যখন, তখন তিনি কাহাকে ধরিয়া থাকিবেন, কাহার দ্বারাই বা ধৃত হইয়া থাকিবেন? আপন আধারে আপনিই আধার—আপনিই আধেয় "স্বমহিম্নি স্থিতঃ"। সর্ব্বদাই তখন ইনি অদ্বিতীয়—দ্বিতীয় কিছুই নাই।

তারপরে যখন ব্রহ্মের স্পান্দনাত্মিকা শক্তি আপনা হইতে (স্বভাবতঃ) তাঁহার উপরে স্ফুরিত হইল--এই স্ফুরণ তাঁর সর্ব্বাঙ্গেই হইল—তখন তিনি শক্তিমণ্ডিত হইয়া হইলেন 'সগুণ ব্রহ্ম'—এই অবস্থায়ও ইনি নিরাকার। ইঁহাকে 'ঈশ্বর'ও বলা হয়। ইনিই 'হিরণগর্ভ' ও 'বিরাট্' রূপ ধারণ করেন। এই বিরাট্ হইতেই অনন্ত 'অবতার' আবির্ভূত হন এবং লীলাশেষে এই বিরাটে প্রবেশ করেন—"বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ। কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ॥" (যোগবাসিষ্ঠ) সূর্য্যকিরণে যেমন মরীচিকা ভাসে, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রভায়—ব্রহ্মের স্পন্দশক্তিতে জগৎ মরীচিকা তাহাতেই ভাসে, যেমন শুভ্রপটে চলচ্চিত্রের ছবি ভাসে সেইরূপ। এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু দেখা যায় সেই সমস্তই মায়াময়—মায়ারই খেলা মাত্র। এই সমস্তই মিথ্যা। সমস্ত ভাসমান বস্তুই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য—"স্বপ্রকাশং মহাদেবি ! ব্যাপ্যব্যাপক-বর্জ্জিতম্। নাধেয়ঞ্চৈব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরন্তরম্ ॥ ইদং হি সকলং দেবি ! সর্ব্বং মায়াময়ং পুনঃ। মিথ্যৈব সকলং দেবি ! সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥" (যোগিনী-তন্ত্র, দশম পটল)

শক্তির অস্তিত্ব স্পন্দনে। এই স্পন্দশক্তি 'বহির্মুখে' নাচিয়া নাচিয়া মোহ বিস্তার করিয়া জগৎ রচনা করেন। কিন্তু, যখন ইনি 'চৈতন্যমুখী' হন, তখন পরমশান্ত চিন্ময় পুরুষকে স্পর্শ করিবামাত্র—শিবকে আলিঙ্গন করিবামাত্র আর তাঁহার স্পন্দ-

নাস্তিকা বৃত্তি থাকে না। শান্তকে স্পর্শ করিয়া তিনি শান্তই হইয়া যান। শান্তশক্তিও যাহা চৈতন্যও তাহাই। এইখানে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ; মায়া ও চৈতন্য এক—এইখানে দুই নাই, এক চৈতন্যই থাকেন। এই কারণে 'প্রয়োগসাগরে' বলা হইয়াছে "শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্মৃতা।" যদি বলিতে হয় বল—শক্তি নির্গুণা হইয়া আপন পূর্ববস্বভাব—স্পন্দ-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া তুরীয়ভাবে অবস্থান করেন। তুরীয় (নির্গুণ) ব্রহ্মের উপরে স্বভাবতঃ যখন তাঁহার শক্তির স্ফুরণ হয়, তখন নির্গুণ ব্রহ্মই শক্তিমণ্ডিত হইয়া 'সগুণ ব্রহ্ম' হয়েন—ইনিও নিরাকার।

দেবী অর্থে শক্তি, এই শক্তি মহামায়া। এই মহামায়া আপন স্পন্দশক্তিদ্বারা জগৎ রচনা করেন আবার যখন তিনি চৈতন্যোন্মুখী হন, তখন তিনি স্ত্রী থাকেন না, পুরুষ হইয়া যান। তন্ত্রে স্ত্রীর নাম শিবা আর পুরুষের নাম শিব ("যত্র জীব স্তত্র শিবঃ, যত্র নারী তত্র গৌরী") অথবা এই শিব শিবাই হইতেছেন 'চৈতন্য ও শক্তি। স্পন্দরূপিণী জগন্মাতা যখন পরমশান্ত, সর্ববিধ চলনরহিত, শ্রুতি যাঁহাকে বলেন "অনেজদেকং"—এই পরম শিবকে স্পর্শ করিতে প্রধাবিত হ'ন, তখন তাঁহাকে এই জগতের খেলা গুটাইয়া লইতে হয়। ফলে 'বহির্ম্মুখিনী শক্তি'—'অবরণীয় ভর্গ' কোনকালে উপাস্য নহেন। রজস্তমঃকে পরিবর্জ্জন করিয়া, সত্ত্বগুণের প্রকাশ ধরিয়া, চৈতন্যোন্মুখী হইতে পারিলে, অজ্ঞানের

৩০

হস্ত হইতে—পাপের কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শক্তি শিরোন্মুখী হইলে শক্তি যাহা হয়েন, তিনিই উপাস্য। বরণীয় ভর্গই উপাসনার বস্তু—অবরণীয় ভর্গ নহেন। মায়ের রজস্তমোগুণই মৃত্যুমুখে লইয়া যায়—এই স্বভাবে মায়ের পূজা নাই। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" হে অর্জ্জুন! পুরুষের পাপাচরণের হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, যৎপ্রেরিত হইয়া লোকে ইচ্ছা না থাকিলেও পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা 'কাম'—আর কাম প্রতিহত হইলে যাহা হয়, তাহাই 'ক্রোধ' [অতএব কাম ও ক্রোধ অভিন্ন]। এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা 'মহাশন'—ইহাদের ক্ষুধা (অশন) কিছুতেই পূর্ণ হয় না অর্থাৎ দুষ্পূরণীয়, ইহারা অপূর্ণোদর এবং ইহারা 'মহাপাপ্মা'—ইহাদিগ হইতেই অত্যুগ্রপাপ আচরিত হয়—ইহারা সংসারে ও মোক্ষমার্গে পরম শত্রু।—পরন্তু মা কোনকালেই শত্রু নহেন। অতএব, মায়ের রজস্তমোগুণ-স্বভাবে মায়ের পূজা নাই।

কোন আত্মবিষয়ে মনকে কেন্দ্রীকরণের নাম 'ধ্যান। (১) কেহ কেহ ধ্যানকালে ভগবানের শাস্ত্রীয় কোন ঈপ্সিত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতেই একাগ্র মনোযোগ স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান করেন। (২) কেহ বা নিজ শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তির ধ্যান করেন। শাস্ত্রে আছে "ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ।" (৩) কেহ বা পরমাত্মাকে ভ্রূযুগলমধ্যে অথবা হৃদয়পদ্মে দীপকলিকাকার শুভ্রজ্যোতিরূপে

ধ্যান করেন। (৪) কেহ বা আত্মার নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার ভাবের চিন্তাতে তন্ময় হইবার অভ্যাস করিয়া ধ্যান করেন। এবং (৫) কেহ বা আত্মার যে কোন অবতার লীলাতে তন্ময় হইয়া ধ্যান করেন।

ফলকথা মনকে যে কোন দৈবীভাবে একাগ্র ও তন্ময় করিতে পারিলে, ক্রমে মনের অন্য বৃত্তিগুলি লীন হইয়া গিয়া, মন এক বিষয়ে একতানতা অথবা গাঢ় তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া বৃত্তি-শূন্য হয়। তখন প্রথমে ব্রহ্মাভাস উপলব্ধি হয়, এবং পরে আত্মস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। বিচার, ধারণা ও ধ্যান-বলে মনকে নির্ব্বাসন অর্থাৎ বৃত্তি-শূন্য করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ভাবে ডুবাইয়া রাখিবার অভ্যাস করিলেই, মন মরিয়া যাইবে এবং জীব আত্মসংস্থ হইবে।

নিজেই নিজের ধ্যানের বিষয় হইতে হয়। 'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন আত্মা'—এই ভাবটির মনন ও ধ্যান করিতে হয় অর্থাৎ এই ভাবটিতে মনকে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আমি দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই ; মন নই বুদ্ধি নই ; স্থূল নই, সূক্ষ্ম নই ; শ্বেত নই, কৃষ্ণ নই ; ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই ; হিন্দু নই, যবন নই ;—এইরূপ 'নেতি' 'নেতি' করিয়া, 'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন আত্মা'—এই ভাবটিতে মনকে ডুবাইয়া রাখিবার অভ্যাসে, মন 'অ-মন' হইয়া যায় এবং ক্রমে স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়।

দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর লীলাময়। কিন্তু ঈশ্বর চিরদিন যদি লীলাই করিতেন—তবে সৃষ্টি, স্থিতির পরে 'লয়ের'—'ভঙ্গের'

ব্যাপার বলার কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু লীলা-ভঙ্গে তিনি "পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাঞ্জং" পুনরায় আছ্য ব্রহ্মভাব অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মভাব - স্বরূপস্থিতি প্রাপ্ত হ'ন। এই যখন হয়, তখন নির্গুণ ভাবকে বা স্বরূপ-বিশ্রান্তিকে 'গৌণ' বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আরও দেখ, জীব প্রতিদিন জাগ্রতের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তিতে "একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃপাদঃ" —এইস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এখানে কোন লীলা নাই। লীলা-ব্যাপার জাগ্রৎ, স্বপ্ন লইয়া। সুষুপ্তিতে কোন লীলা হয় না। জীব-চৈতন্য এই অবস্থা যখন লাভ করেন, তখনও তাঁর চেতন-স্বভাবটি ঠিক থাকে। কাজেই এই অবস্থাতেও তাঁহার প্রকাশ স্বভাবটি কাজ করে। এই চৈতন্য-স্বভাবে, এই প্রকাশে তিনি অনুভব করেন "আর কিছুই নাই"। সুষুপ্তিতে কোন অনুভব থাকে না যাঁহারা মনে ভাবেন, তাঁহারা দুই প্রকার ভ্রম করেন। (১) চৈতন্য-স্বভাবে যে প্রকাশটি আছে, সুষুপ্তিতে সেই প্রকাশের অভাব হয়—এই মতের প্রথম দোষ ইহা। (২) সুষুপ্তি-ভঙ্গে সকলেই যে বলিয়া থাকে—বেশ ছিলাম আর কোন কিছুই ছিল না—এই যে স্মৃতি—এই স্মৃতির মূলে একটা অনুভব ত থাকিবেই। কারণ, যাহার অনুভব হয় না, তাহার স্মরণ হইতেই পারে না। কোন অনুভব থাকে না—এই মতের দ্বিতীয় দোষ হইতেছে "স্মরণের" অস্বীকার। কাজেই সুষুপ্তিতে "আর কিছুই নাই" এইটির অনুভব থাকে। এই অনুভব-ব্যাপারে জীব এতই অনভ্যস্ত যে, অনুভব হইলেও স্পষ্ট ইহা ধরিতে পারে না। কারণ, জীব সুষুপ্তিতে একটি

তমোভাবে, একটি মাত্র অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই অজ্ঞানটি হইতেছে "আমাকে আমি জানিনা" এই মূল অবিদ্যা। ইহাই জীবের 'কারণ-শরীর'। নতুবা, "আর কিছুই নাই" এই অনুভবের সঙ্গেই অনুভূত হইবে "কেবল আমিই আছি"; "আর কিছুই নাই"—অর্থাৎ "কেবল আমিই আছি"—এই স্থিতি থাকিবেই। বিনা সাধনায় "কেবল আমিই আছি" এই তুরীয় অবস্থায় যাওয়া যায় না। এইজন্য বলা হইয়াছে—দ্বৈতভাব অবলম্বনেই অদ্বৈতভাবে স্থিতি লাভ করা যায়। অদ্বৈত-স্থিতির নামই 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না। কোন কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নাই তথাপি জ্ঞানস্বরূপ যিনি, তিনি আছেন। দ্বৈত-অবলম্বন কেবল অদ্বৈত-স্থিতির জন্য। অদ্বৈত ব্রহ্ম গৌণ নহেন—'মুখ্য'।

ভক্ত যে বলেন—এই জগৎটা ঈশ্বরের দেহ; তাহা হইলে বলিতে হয়, ভগবানের এই জগৎ-দেহ কখন থাকে না। যিনি নিত্য, তাঁহার দেহ কিন্তু অনিত্য। যাহা অনিত্য, তাহা নিত্যের মত চিরদিন থাকে না। জগতে যাহা কিছু আকারবান্ দেখা যায়, তাহা মায়াশবলিত মায়িক বাসনাদি দ্বারা আবৃত ব্রহ্মই। বহু বাসনার বিচিত্র কল্পনা—বিচিত্র আকার বিচিত্র জগদাকারে ভাসে। চিৎ-ই মায়া-আশ্রয়ে ব্রহ্মামূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি-রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। চিৎ-ই মায়া দ্বারা আবৃত মত হইয়া জগৎমত পদার্থের আকার ধারণ করেন। এই যে মায়াকে অধীন রাখিয়া, মায়াকে আশ্রয় করিয়া, চিৎ ভাসেন, এই মায়ার আশ্রয় চিৎ-ই উপাস্য, ইনিই ধ্যান ও স্মরণের বস্তু।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

সপ্তম অংশ

নাম সাধন

নাম-সাধন

বর্ত্তমান সময়েও আস্তিক মনুষ্য সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তর্পণ আদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু যে সাধনে হৃদয় ভরিয়া যায়, যেভাবে ডাকিলে প্রাণ তৃপ্ত হয়, মন মরিয়া যায় এবং জীবাত্মা পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমন সাধন কতটা হয় ? আনন্দঘনকে ডাকিতে ডাকিতে মনুষ্য আনন্দে ভরিয়া উঠে না কেন ? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে,— বৈরাগ্য-সাধনার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সত্যবস্তু-গ্রহণের নিমিত্ত যেমন তপস্যার প্রয়োজন, তেমনি অসত্যবস্তু-ত্যাগের নিমিত্তও তপস্যা আবশ্যক। প্রথম তপস্যা অভ্যাস, দ্বিতীয় তপস্যা বৈরাগ্য। অভ্যাসরূপ তপস্যা নিয়া থাকিতে মনুষ্যকে কোথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৈরাগ্য-তপস্যার সাধকের ত একপ্রকার অভাবই হইয়া গিয়াছে। অথচ, বৈরাগ্য-সাধন না করিলে কেবল অভ্যাসের তপস্যা দ্বারা মনুষ্য পূর্ণ হইতে পারে না। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের সাধনা না চলিলে, মনুষ্যের মন মরে না, প্রাণ তৃপ্ত হয় না, হৃদয় ভরে না এবং আত্মা পূর্ণ হয় না। এই কারণে ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" (৬।৩৫)—হে অর্জ্জুন ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইহা নিঃসংশয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আহার, বিহার, শয়ন, জাগরণ, জপ, পূজা, স্বাধ্যায়, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি নিয়মিত সময়ে ও নিয়ম-পূর্ব্বক প্রতিদিন করিয়া থাকে, সে বৈরাগ্য ও অভ্যাসরূপ সাধন

দ্বারা সেই স্বভাবচঞ্চল মনকে নিগৃহীত (সর্ব্ববৃত্তিশূন্য) করিতে পারে। অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ে মিলিত-ভাবে মনোনিগ্রহের সাধন। যেমন তীব্রবেগ নদী প্রবাহকে প্রথমে বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া, পরে খাল কাটিয়া তাহাকে তির্য্যগ্‌গামী প্রবাহরূপে ক্ষেত্রাভিমুখ করা হয়, তেমনি বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত-নদীর বিষয়রূপ প্রবাহকে বাঁধিয়া, মন্ত্রজপ, দেবতাধ্যান, সমাধি প্রভৃতির অভ্যাসবলে চিত্তে বিশুদ্ধ পরমাত্মভাব সম্পাদন করা যায়। বৈরাগ্য বিষয়-স্রোত বন্ধ করে আর অভ্যাস চিত্তে বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাব জাগাইয়া তুলে। অতএব, বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা দুই প্রকার ক্রিয়াঅনুষ্ঠিত হইলে পরই চিত্তের নিরোধ হয়। এই কারণে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" —অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুই প্রকার ক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইতে পারে · এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন —'তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে। বিবেকদর্শনাভ্যাসেন চ কল্যাণস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে ॥"—বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তনদীর বিষয়রূপ প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাসে কল্যাণস্রোত অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাব জাগিয়া উঠে।

প্রায়ই দেখা যায়, জপ, পূজা, পাঠ, ধ্যান, বেশ চলিতেছে কিন্তু বৈরাগ্যরূপ সাধন না থাকাতে, বিষয়ের সামান্য বিশৃঙ্খলা, শরীরে সামান্য রোগ, সংসারে সামান্য শোক কিম্বা টাকাকড়ির সামান্য অভাব হইলেই জপ, পূজা, পাঠ প্রভৃতি সব বন্ধ হইয়া যায়। এমন হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে,—সংসার যাহা কিছু

দেখাইতেছে তাহা সবই মিথ্যা, এই রহস্য ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম না হওয়ার দরুণই এই সব হয়, জপাদি সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অধ্যাত্মরামায়ণে বলা হইয়াছে—"শ্রূয়তে দৃশ্যতে যৎ যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা। অসদেব হি তৎসর্ববং যথা স্বপ্ন-মনোরথৌ॥"—যা শ্রবণ করা যায়, যা দেখা যায়, যা স্মরণ করা যায় স্বপ্ন ও মনোরথের মত সে সমস্তই অসৎ। শাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন, জগৎ মিথ্যা, সবই মায়ার খেলা, সবই মায়া। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। সৈষা প্রকৃতি রিত্যুক্তা, সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥" (অঃ বাঃ) ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মায়া নিতান্ত দুরত্যয়া, ইহাতে সংশয় নাই কিন্তু এই মায়ার হাত হইতেও ত উদ্ধার পাইবার উপায় আছে। মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্তই ত মায়াধীশ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয় না নিলে মিথ্যা কখন ঠিক ঠিক মিথ্যারূপে ভাসে না, ঠিক ঠিক মিথ্যা হইয়া যায় না। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিবার নিমিত্ত বিচারের সাহায্য আবশ্যক হয়। সেই বিচার সত্য ও মিথ্যার বিচার। মিথ্যাকে মন হইতে দূর করিবার জন্য—মিথ্যাকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য বিচার করিতে হয় যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু; ঈশ্বরাতিরিক্ত যদি কিছু থাকে বা ভাসে, তবে তাহা মিথ্যা, তাহা অগ্রাহ্যের বস্তু। সৃষ্টির বিচিত্রতাকে মিথ্যার রঙ্গ জানিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, অনন্ত মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান নিত্য, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য বারবার চেষ্টা

করিতে হইবে। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জল, স্থল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সবই ঈশ্বরই সাজিয়াছেন। এই সব সাজার ভিতরে তিনিই বিরাজিত, এই সব পোষাক পরিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন। যিনি একান্তে এই প্রকার সাধনা করেন, এই প্রকার বিচার করেন, তিনিই সকলের জন্য বাহিরে কার্য্য করিয়াও, ঈশ্বরের নিমিত্ত বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যের প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন। বাহিরের সংসার ত্যাগ করিলেই সংসার ত্যাগ হয় না, দেহ ও মনও ত স্বয়ং এক প্রবল সংসার। ঈশ্বর-চিন্তন করিতে করিতে মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে বসাইতে হইবে এবং ঈশ্বরাতিরিক্ত যাহা কিছু চিন্তা মনে উঠিবে, তাহাকে বৈরাগ্য-অগ্নি দ্বারা ভস্ম করিয়া ফেলিতে হইবে। তবেই ঠিক ঠিক সংসার ত্যাগ হইবে, তবেই ঠিক ঠিক সাধনা হইবে, — তবেই মন, প্রাণ, আত্মা শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

যেখানে ঠিক ঠিক ঈশ্বরচিন্তন হয়, সেখানে মনুষ্য শত বিপদে পড়িলেও ধৈর্য্য হারায় না, কর্ত্তব্য ত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারে সংসারে এমন কেহ বা কিছুই নাই—তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। এই ঈশ্বর-চিন্তাই একমাত্র অভ্যাসের বস্তু। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, মায়াধীশ—তিনি সমকালে নির্গুণ সগুণ, আত্মা ও অবতাররূপে লীলা করেন। এই ঈশ্বরের নরাকার বা নার্য্যাকার রূপের অবলম্বন কর, এই অমূর্ত্ত ঈশ্বরের মন্ত্র-মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরের স্বরূপ-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ, তাঁহার

গুণ এবং তাঁহার লীলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার ভাবে ডুবিয়া ধন্য হইয়া যাও। একান্ত-সাধনে এই ঈশ্বরের ভাবনা কর, ভজন কর আর লোকসংগ্রহকার্য্য দ্বারা এই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হও। অর্থাৎ যে কোন জীবকে তৃপ্ত করিয়া ঈশ্বর-তৃপ্তির অনুভব কর। ইহার জন্য, যাহা ঈশ্বরে কোনকালেও থাকে না, সেই 'অজ্ঞান'কে ভুলিবার নিমিত্ত, অজ্ঞানের প্রতি, অবিদ্যার প্রতি বৈরাগ্য-ভাবনার অভ্যাস কর। ইহাই মনুষ্য জন্ম সফল করিবার যথার্থ সাধন।

মনে মনে ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ের কথা বলাও পাপ-চিন্তা। মনের ঘসর-মসরই পাপচিন্তা—পাপজনিত অসম্বন্ধ প্রলাপ। মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ করিতে হইবে। মনে মনে নাম নিয়া নিয়া ইষ্টচিন্তা ভিন্ন সমস্ত চিন্তা মারিয়া ফেলিতে হইবে তবেই সদা সর্ব্বদা নাম-জপের দৃঢ়সঙ্কল্প করিতে পারিবে। এমন জপ করিবে যে, যেন রাত্রে ঘুমের অবসরই না পাওয়া যায়, তবে ত সর্ব্বদা জপ চলিবে। প্রথম প্রথম অল্প অল্প করিয়া অনেকবার অভ্যাস করিতে হয়—ক্রমে ধীরে ধীরে জপ বাড়াইতে হয়, আরও বাড়াইতে হয়, শেষে ঘুম ছাড়িয়া নাম জপিয়াই রাত কাটাইতে হয়। যখন এইভাবে জপ করিতে পারিবে, তখন দেখিবে যে, তোমার সম্পূর্ণ ভার তোমার ইষ্টই গ্রহণ করিয়াছেন। দিবারাত্র তাঁর নাম নিলে, তিনি নিজেই সমস্ত সুবিধা করিয়া দেন। তখন কোন ভাবনাই থাকে না,—কি খাইব, কোথায় থাকিব, কিছুই ভাবিতে হয় না। অতএব, সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকিতে থাক আর তিনি যে তোমার

জন্য সব কিছু করিতেছেন, তাহা দেখিতে থাক। যদি এইভাবে চলিতে পার, তবে এই জীবনেই তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণ হইয়া যাইবে। স্বরূপ-চিন্তন করিবার পর, ভিতরে রূপদর্শন করিতে করিতে, নাম-জপ করিতে থাকিলে, নামীর ভাবে ভাবিত ও ভরিত হইয়া জীবাত্মা পূর্ণ হইয়া উঠিবে আর তবেই দেখা যাইবে যে, একই পরমতত্ত্ব নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতাররূপে সমকালে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। এই দর্শনে, স্বরূপাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় সত্তার অভাব থাকাতে, অভয়পদে স্থিতিলাভ হয়। ইহাই পূর্ণ সত্যদর্শন, ইহাই নামসাধনের সার্থকতা, ইহাই মানব-জীবনের কৃতার্থতা।

নাম করা—নাম সর্ব্বদা করা—ইহাই সহজ সাধনা। মনে অন্য ভাবনা যখন সবলে আইসে, তখন উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া করিয়া কতক্ষণ পরে মনে মনে নাম জপ আবশ্যক। যাঁহার যে ইষ্টনাম, তিনি তাহাই জপিবেন। কিন্তু জপ সর্ব্বদা করিতে হইবে। ইহার জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে।

যেখানে মানুষ আসক্ত হয় না, সেখান হইতে মানুষ মনে মনে সরিয়াই থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ আসক্ত হয়, যাহা দেখিতে ভাল লাগে, যাহা শুনিতে ভাল লাগে, তাহাতে যখন ঈশ্বর ভুল হয়, তখন কি করিলে ঈশ্বরকে ভুলিতে হয় না ?—তাহার কৌশল হইতেছে, নাম করিতে করিতে দেখ, নাম করিতে করিতে শুন। অর্থাৎ নাম ছাড়িয়া কিছুই দেখিও না, কোন কিছুই শুনিও না। শুধু অভ্যাসেই ইহা হইতে পারে কিন্তু 'ইহা করিবই' এইরূপ পুরুষার্থ রাখা চাই।

ইহাতে কিরূপে সমস্ত আসক্তি ছুটিয়া গিয়া ঈশ্বরে আসক্তি আসিবে ? বলিতেছি—নাম কর কিন্তু রূপের দিকেও দৃষ্টি রাখ। যদি বল, নাম রূপ ত মিথ্যা—ইহাতে কি হইবে ? মিথ্যা বটে কিন্তু মিথ্যার ভিতর দিয়াই সত্যে পৌঁছিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

মিথ্যা আশ্রয় না করিলে সত্যের আপনস্বরূপ প্রকাশের অন্য পথ নাই। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার আত্মপ্রকাশ হয় না। কারণ দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, স্থূল দেহ না থাকিলে আত্মাকে ধরা যায় না—আত্মাকে অনুভব-সীমায় আনা যায় না। প্রতিবিম্ব না থাকিলে বিম্বকে ধরা ছোঁয়া যায় না। বিম্বটি সত্য—প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা মিথ্যা। জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ বিম্বদ্বারা চৈতন্য-দীপ্ত হইয়া, প্রতিবিম্ব বিম্বের মত দেখায়। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতেই বিম্ব প্রতিবিম্বরূপে ধরা দিয়া থাকেন। এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া, প্রতিবিম্ব মিথ্যাবোধে ত্যাগ করিয়া, বিম্বে পৌঁছিতে হইবে, ইহাই সাধনা। সত্ত্বে, রজে, তমে সেই একই বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে ভাসিতেছেন। কাজেই নামের সাহায্যে নামীকে ধরিতে হইবে, নাম ধরিয়া স্বরূপে যাইতে হইবে।

নাম কর—প্রতি নাম করাতে রূপের রেখাপাত হইবেই। অধিক নাম করিতে করিতে আপনা হইতেই রূপ আসিবেই। কিন্তু কলির জীব বড় দুর্ব্বল—বেশী সময়ও তত দিতে পারে না। সেইজন্য, যখন নাম করিবে, তখন ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়পদ্মে জ্যোতির

মধ্যে ইষ্টকে বসাইয়া অন্ততঃ তাঁহার চরণযুগলে চক্ষু রাখিয়া নাম জপ কর। অর্থাৎ রূপ দেখিয়া দেখিয়া নাম কর। তারপর ইষ্টের গুণ, ইষ্টের লীলা চিন্তা কর। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে ইষ্টের লীলা যে গ্রন্থে আছে, তাহা শুনা আবশ্যক অর্থাৎ ইষ্টের লীলাগুলি জানা আবশ্যক। তবেই হইল—নাম, রূপ ও লীলা চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতেছে 'স্বরূপ-চিন্তা'। স্বরূপ-চিন্তা শ্রীগুরুর নিকট শুনিতে হয়, সৎসঙ্গেও ইহার আলোচনা চাই। স্বরূপ-চিন্তায় প্রলয়ের চিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। —আর কিছুই নাই, শুধু নামের নামী মাত্র আছেন। শুধু নামের নামীই গ্রাহ্য বস্তু; অন্য যাহা কিছু—যাহাই অনাত্মা, তাহাই অগ্রাহ্যের বস্তু। অনাত্মাকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, আত্মা লইয়া সর্ব্বদা থাকা যাইবে না। অগ্রাহ্য কর এবং গ্রহণ কর কিন্তু উভয় কার্য্য কর সমকালে। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, সমকালে বাসনাক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাস অভ্যাস কর "বাসনাক্ষয়-বিজ্ঞান-মনোনাশা মহামতে। সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা ইমে॥"—নাম-সাধনাতেও গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য-অভ্যাস সমকালে চলিতে থাকুক। এইরূপে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও স্বরূপ-চিন্তা করিতে করিতে এমন পাথেয় সঞ্চিত হইবে যে, এই পাথেয় ইহ জগতের পথে চলিতেও ভুল হইবে না।

জপে শ্রান্ত হইলে ধ্যান করিবে, ধ্যানে শ্রান্ত হইলে পুনরায় জপ করিবে, আবার জপ ও ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আত্মবিচার করিবে,—ঋষিগণ সাধনপথে চলিবার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি

কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, যাহাদের সঙ্গে পড়িয়াছি, যাইব কোথায়—এই সব চিন্তাকে ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ হিতচিন্তা বলেন। জগতের যিনি জ্ঞানগুরু, যিনি প্রার্থীকে জ্ঞান দিবার জন্য এখনও উৎগ্রীব হইয়া আছেন, যিনি জীবের জন্য সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে অপেক্ষা করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন—জগতের সেই জ্ঞানগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

বিচারো যস্য নোদেতি কোঽহং কিমিদমিত্যলং।
তস্মান্ত নঁ বিমুক্তোঽসৌ দীর্ঘো জীব-জ্বর-ভ্রমঃ ॥

—আমি কে, এই সব কি, এই বিচার যার অন্তরে উঠিল না, সে কখন ত এই দীর্ঘ সংসার-রোগ হইতে মুক্ত হইতেই পারিবে না অধিকন্তু সে জীবভ্রান্তিরূপ দীর্ঘজ্বর ভোগ করিয়া করিয়া ক্রমেই জীর্ণ, জীর্ণতর, জীর্ণতম হইতে থাকিবে।

সত্যই ত আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কিরূপে আসিলাম, এসব কি দেখি শুনি, দেখিয়া শুনিয়া ভোগ করিয়া শান্তি পাই না কেন, সদা সর্ব্বদা এখানে এত ছট্‌ফট্ করি কেন, এক অবস্থায় ত থাকিতেই পারি না, চিরদিন কি আমি এমনি ছট্‌ফট্ করিব, না কখন ইহার নিবৃত্তি হইবে, কি করিলে নিবৃত্তি হইবে,—এই সব কথা যাহার মনে উঠিল না, তাহার যে বিষম অজ্ঞান-রোগ রহিয়া গেল, এবং সেই রোগ-জনিত বিকারে তাহাকে সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ কি!

আমি কে?—এই দেহটা কি আমি? না ইন্দ্রিয়গুলি আমি? না মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার আমি? কে আমি? যে দেহটা মরিয়া

যায়, যে দেহটাকে পুড়াইয়া ফেলিলে ভস্ম হইয়া যায়, যে দেহটাকে সিংহ ব্যাঘ্র খাইয়া ফেলিলে এটা পশুর বিষ্ঠা হইয়া যায়, যে দেহটা মরিয়া দুদিন পড়িয়া থাকিলে এটাতে কৃমি বিজ বিজ করিতে থাকে —বল, এই দেহটা কি আমি ? যেটা ত্বক্, অস্থি, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, রক্তাদি-যুক্ত—যেটা বিকারী, যেটা পরিণামী, সেটা 'আমি' হইবে কিরূপে ? দেহটাকে, ইন্দ্রিয়গুলিকে, মনকে, বুদ্ধিকে আমি জানি কিন্তু ইহারা আমাকে জানে না। আমি তবে একটি জ্ঞানময় বস্তু—ইনি সব জানেন, ইঁহাকে দেহাদি কেহই জানিতে পারে না। অহো ! আমি চৈতন্য—আমি জ্ঞানস্বরূপ। আমি আছি বলিয়া আমার চৈতন্যের দীপ্তিতে জড় দেহটা, জড় মনটা চৈতন্য-দীপ্ত হইয়া সজীব হইয়া আছে। আমি আছি বলিয়া চক্ষু দেখে, কর্ণ শুনে, পা চলে, হাত গ্রহণ করে—আহা ! আমি এমন বস্তু ! এই চৈতন্যই দ্রষ্টা, ইনিই সাক্ষী, ইঁনিই জ্ঞাতা। ইঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—যিনি না থাকিলে জানা বলিয়া বস্তুটাই হয় না, তাঁহাকে আবার জানিবে কে ? এই চৈতন্য অখণ্ড বস্তু—ইঁহাকে ছোট করিতে কেহই পারে না। ঘটের মধ্যে আকাশ থাকিলেও যেমন আকাশের খণ্ড হয় না, সেইরূপ আকাশ অপেক্ষা অনন্তগুণে সূক্ষ্ম, যিনি ব্যাপক—তাঁহাকে খণ্ড কে করিবে ! অহো ! এই আমিই সদা পূর্ণ-অনন্ত-সর্ব্বশক্তিমান ! অহো ! "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্, সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্" আমি দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবতা—আমি আর কিছুই নহি ; আমিই ব্রহ্ম, আমার রোগ

শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা সংসার কিছুই নাই, আমি অসঙ্গ, সৎচিৎ আনন্দ, আমি নিত্যই মুক্ত।—যদি এই মীমাংসাই অভ্রান্ত হইল, তবে আমাদের এই শোক, এই মোহ, এই আধিব্যাধি, এই ছট্ফটানি—এসব কোথা হইতে আসিল? কেন আমি সুখস্বরূপ হইয়া এত দুঃখী হই? ইহার একমাত্র উত্তর—এসব আমারই কল্পনামাত্র। আমার শক্তির স্পন্দনে কল্পনা উঠে—দেহ, মন, সংসার, জন্ম, মৃত্যু, জগৎ—যা কিছু তাহা চিত্তস্পন্দন মাত্র। আমি কল্পনা করিতেও পারি, আবার কল্পনা ভাঙ্গিতেও পারি। ভাঙ্গিতে পারি ত ভাঙ্গিনা কেন? কেন এত কল্পনার দুঃখ পাই? কল্পনা করিয়া করিয়া যখন বিষয় ভোগ করি, তখন আমি আমার স্বরূপকে অনেকদিন ভুলিয়া, অনেক ব্যভিচার করিয়া করিয়া, এমন একটা শক্তিশূন্য অবস্থায় আসিয়া পড়ি যে, আমি ইচ্ছা করিলেই আর আমার সেই রাজাধিরাজ অবস্থায় যাইতে পারি না—আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র একজন হইয়া যাই। রাজা বহুদিন ধরিয়া, বহু জন্ম ধরিয়া চামারের অভিনয় করিতে করিতে এত দৃঢ় চামার হইয়া যান যে, শতবার বলিয়া দিলেও তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইজন্য সাধনা করা চাই। বিচারে দেখি আমিই সেই, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া কাম ক্রোধাদির কার্য্য করিয়া এমন হইয়া গিয়াছি যে, কার্য্যে আমি যেন "সেই" হইতে পৃথক্। সেইজন্য সর্ব্বদা "সোঽহং সোঽহং" করিয়া, সর্ব্বদা শিব শিব করিয়া, দুর্গা দুর্গা করিয়া, রাম রাম করিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া সেই শিবের কাছে, সেই মায়ের কাছে, সেই রামের কাছে,

সেই কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়—আমায় উদ্ধার কর, আমাকে লইয়া চল "প্রচোদয়াৎ"। আমি জানিতেছি আমি স্বরূপে তুমিই, কিন্তু কার্য্যে আমি মনের গোলাম হইয়া পড়িয়াছি; পড়িয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতেছি—হে আমার আমি, হে আমার দেবতা, তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই, তুমি আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল; তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার কোলে তুলিয়া লও; তুমি আমাকে তোমার চরণ সেবার অধিকার দাও। আমি তোমায় ভুলিয়া শত শত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি—আর আমি অপরাধ করিতে চাই না—আর আমি তোমায় ভুলিয়া থাকিতে চাই না। সত্য সত্যই আমার আর কেহ নাই, তুমি আমার প্রভু, তুমিই আমার আমি; যাহা করিলে আমার পরম মঙ্গল হয়, তুমি তাহাই আমা দ্বারা করাইয়া লও—আমি সকল কষ্ট সহ্য করিয়া হরি হরি করি, মা মা করি—নিরন্তর করি; তুমি আমাকে তোমাতে—আমার স্বরূপে পৌঁছাইয়া দাও। —জ্ঞানমার্গে ভক্তির স্থান ইহাই। ভক্তিশূন্য জ্ঞান-পথ জ্ঞান-পথই নহে আবার জ্ঞানশূন্য ভক্তি ভক্তিই নহে। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ থাকেন না। এইজন্য ঋষিগণ বলেন "জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ। জপ-ধ্যান-পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ"। অধিকারী-ভেদে একটিকে মুখ্য রাখিয়া গৌণভাবে সবগুলিই করিতে হইবে—ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থালাভ হইলে নীচের গুলি আর করিতে হইবে না। সর্ব্বশেষে স্বরূপ-বিশ্রান্তি। তাই বলা হয় "তরতি শোকমাত্মবিৎ"।

জপ করি আর ধ্যানও করি কিন্তু বিচার জাগে নাই—এই অবস্থায় দীর্ঘ-সংসার-রোগ ছাড়িতেই পারে না। একক্ষণে ভাল, পরক্ষণেই মন্দ—প্রতিদিনই ইহা হইবে আর ইহাতেই বুঝিতে হইবে জ্বর ছাড়ে নাই।

সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করা চাই, সেইজন্য প্রতিসন্ধ্যায় দীর্ঘকাল জপ করাও চাই। নতুবা সর্ব্বদা জপ থাকিতেই পারে না। আবার এমন অভ্যাসটি হওয়া চাই, যাহাতে লৌকিক কর্ম্মের বিরাম হইলেই আবার জপ উঠে। প্রথম প্রথম আপনা হইতে উঠিবে না, চেষ্টা করিয়া তুলিতে হইবে। অভ্যাস পাকা হইলে আপনা হইতে উঠিবে।

যাঁহাদের সময় আছে, তাঁহারাও সর্ব্বদা জপ লইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য জপে পরিশ্রান্ত হইলে ধ্যান করা চাই। রূপের ধ্যান, গুণের চিন্তা, লীলাচিন্তা, ও স্বরূপ-ভাবনা—এই সমস্তই ধ্যান। ইহাদের সুবিধার জন্য ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করা উচিত বা শ্রবণ করা উচিত এবং শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মনন করা চাই-ই।

বিচার উঠা কাহার নাম?—আমি কে, সংসার কি—জগৎ কি, ইহার বিচারকেই বিচার বলে। বিচার তাঁরই সফল যাঁহার বিবেক জাগিল। বিচার বা বিবেক তাঁহারই জন্মিয়াছে, যাঁহার ভোগগৃধ্নতা—ভোগলাম্পট্য দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছে। তাঁহার বিবেকই সফল যাঁহার ইন্দ্রিয়-জয় অভ্যস্ত হইয়াছে।

উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে যেমন দেহ সুস্থ হয়, সেইরূপ

ইন্দ্রিয়ের জয় অভ্যাস করিতে পারিলে, বিবেক ঈশ্বর মিলাইয়া দেয়, বিবেক ফলিত হয়।

বচনে বিবেক এটা অবিবেকই। শাস্ত্র ব্যাখ্যা বেশ চলে কিন্তু কার্য্য হয় অন্যরূপ—এক্ষেত্রে বচন-বিবেকে দুঃখ যায় না। বায়ুর সত্তা যেমন স্পর্শদ্বারাই অনুভূত হয়, বাক্যে হয় না, সেইরূপ ইচ্ছার ক্ষীণতা না হইলে বিবেক জন্মে নাই জানিও।

যাঁহারা কিছু উপরে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের ও দেখা উচিত,—ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই, কিন্তু আপনা হইতে ভোগ প্রাপ্ত হইলে, বেশ রুচি করিয়া ভোগ করাটি আছে, এ ক্ষেত্রেও বিবেকটি বচন-বিবেক মাত্র।

চিত্রে অঙ্কিত অমৃত যেমন অমৃত নহে, চিত্রাঙ্কিত অগ্নি যেমন অগ্নি নহে, চিত্রাঙ্কিতা নারী যেমন নারী নহে, সেইরূপ "বাচা বিবেক স্তু বিবেক এব" বচন-বিবেকটা অবিবেকই। ভোগ আপনা হইতে আসিলেও সেখানে বিবেক থাকিবে—বিচার ভুল হইলেই জানিতে হইবে, বিবেক জন্মে নাই। কোন প্রকার ভোগ আসিলেই, বিচার আসিবে, এই ভোগের যে ক্ষণিক সুখ, এটা দুঃখই—এটা বর্জ্জন করাই চাই। ঘন ঘন ঈশ্বর-স্মরণে, ঘন ঘন নাম-জপে—কাতর প্রার্থনায়, সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ভোগের প্রশ্রয় দিতে নাই। অজ্ঞাতসারে ভোগের দিকে আকৃষ্ট হইলেও—একি করিতেছি বলিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত—ভাল করিয়া বিচার করিয়া জপ, ধ্যান, আত্মবিচারের আশ্রয় লওয়া উচিত।

আমি কে ?—এই বিচারে দেখা যায়, আমি চৈতন্য— আমাতে কোন ভোগ নাই—আমি আত্ম-তৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড় আর এই জগৎটা চৈতন্যের উপর মায়া-রচিত ইন্দ্রজাল। মায়ার ইন্দ্রজাল দূর করিলে দেখা যাইবে—এ জগৎটা ব্রহ্ম।

এক পরমশান্ত সর্ব্ববিধ চলনরহিত পরিপূর্ণ সৎ চিৎ আনন্দ পরমপদই ভিতরে বাহিরে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন ইনিই ঋক, ইনিই অক্ষর, ইনিই পরমব্যোম—সমস্ত দেবতা ইনিই। সকলের স্বরূপ ইনিই। আমিই এই পরমপদ স্বরূপে,—আমিই স্বরূপে আমার ইষ্টদেবতা। আমি পূর্ণ হইয়াও কল্পনাবশে, অবিদ্যাবশে, মায়ার ঘোরে, এক কথায়—আপনাকে আপনি স্মরণ না করিতে পারা রূপ অজ্ঞানে যেন অপূর্ণ হইয়া গিয়াছি। বহুদিন ধরিয়া, বহুযুগ ধরিয়া এই স্মরণ ভুলে মরণ লইয়া আছি। এখন আমাকে বাঁচিতে হইবে এই স্বরূপের সর্ব্বদা স্মরণে—এই বিদ্যার অভ্যাসে। একদিক স্মরণের অভ্যাস, অন্যদিকে পরমপদ ব্যতীত যাহা কিছু তাহাতেই অনাস্থা—তাহাতেই বৈরাগ্য।

আত্মার অভ্যাস ও অনাত্মার বৈরাগ্য, এই দুই সমকালে—ইহাই আমার বাঁচিবার উপায়। পরমশান্ত পরমেশ্বরকে ভিতরে শান্তভাবে অবস্থিত বিশ্বাস করিয়া—তাঁহাকে প্রত্যক্ষে দেখিবার জন্য সকল কর্ম্মে, সকল বাক্যে, সকল ভাবনায় তাঁহাকেই 'নেত্রান্তসংজ্ঞা' করিতে করিতে জীবন কাটান—এইরূপে আত্মরসে মন একাগ্র করিয়া, শেষে আত্মা হইয়াই, নিরোধ অবস্থায় যতক্ষণ পারা যায় থাকা এবং বাহিরে 'সব তুমি, সব তুমি 'অভ্যাস করিয়া, নাম করিতে করিতে, সর্ব্বদা নাম করিয়া করিয়া ভিতরে পরমশান্তে ডুবিয়া যাওয়া—ইহাই কার্য্য।

জপ উত্তমরূপে করিতে হইলে ধ্যানের সহিত জপ করা আবশ্যক। ধ্যান সহ যে জপ, তাহাতে নাম বা নামীর স্বরূপচিন্তা, নাম বা নামী যে

স্থাবর, জঙ্গম, দ্যাবা, অন্তরীক্ষ সর্ব্বব্যাপী তাহার চিন্তা, নাম বা নামী যে সকলের মধ্যে আত্মারূপে আছেন তাহার চিন্তা এবং নাম বা নামী যে মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার-লীলা করেন তাহার রূপ, গুণ ও লীলা চিন্তা করিতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, জপের সঙ্গে নাম বা নামীর নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতারভাব চিন্তা করিয়া লইয়া জপ করা আবশ্যক।

এই নামই ভগবান, এই নামই স্বয়ং অক্ষর ব্রহ্ম, এই নামই অনন্ত শক্তিমান আত্মা—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীগুরু-আদিষ্ট প্রণালীতে নাম-জপ করিয়া চলিলে নামীর বিশিষ্ট দৈবী শক্তিসমূহ জাপকের অন্তরে জাগরিত হয়। এই নাম জপ দ্বারা সাধক যাহা ইচ্ছা করেন, ক্রমে তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। শ্রীশ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-ক্রমে একাগ্রচিত্তে অর্থাৎ ধ্যানসহ ভক্তিপূর্ব্বক নাম-জপ করিয়া চলিলে চিত্ত শুদ্ধ (পবিত্র) ও শান্ত হয়, এবং ক্রমে শুদ্ধাভক্তি ও ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উদিত হইয়া নামীকে পাওয়া যায়।

নাম ও নামী অভেদ, নামের সহিত নামী আছেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস মনে রাখিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাঁর প্রত্যক্ষদর্শনের আগ্রহ সহ নাম-জপের অভ্যাস করিতে থাকিলে, মনে ভক্তির প্রবাহ আসিবে, এবং ইহাতে মন ঈশ-ভাবে ভাবিত ও ভরিত হইয়া শুদ্ধ ও শান্ত হইবে, ও ক্রমে ভক্তি ও জ্ঞানের আবির্ভাবে জীব-ভাব গলিয়া গিয়া সিদ্ধিলাভ হইবে অর্থাৎ আত্মদর্শন হইবে। "জপাৎসিদ্ধিঃ, জপাৎসিদ্ধিঃ, জপাৎসিদ্ধিঃ, ন সংশয়ঃ —এই বাক্য সহস্রবার সত্য। ভক্তিপূর্ব্বক আত্মসংস্থ হইয়া নাম-সাধনে নামী প্রকাশিত হ'ন, নাম হইতেই নামীকে পাওয়া যায়,—ইহা অনুভূত সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

বৈরাগ্য, দীনতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তিসহ নামীতে

(ভগবানে) চিত্ত অর্পণ করিয়া, একাগ্র মনে যত্ন ও নিষ্ঠাপূর্ব্বক নাম-জপ অভ্যাস করিলে, ক্রমে মনের সমস্ত রাজসিক বাসনা ও মলিন অহমিকা ক্ষীণ ও লীন হইয়া, মন সংযত শান্ত নিস্তরঙ্গ ও পবিত্র হয় এবং যথাকালে পরাজ্ঞান ও ব্রহ্মত্বলাভে জাপক কৃতার্থ হ'ন। অর্থাৎ তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। সেই সময় "সোঽহং" জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সে অবস্থা লাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আকুল আগ্রহে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই ফল পাওয়া যায়। প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত নাম-সাধন করিতে হয়। নাম সাধনে ভক্তি, আগ্রহ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব হইলে ফল তাদৃশ হয় না। নাম-সাধন প্রাণবন্ত হওয়া চাই। শিশু যেমন মাকে ডাকে, তেমনিভাবে সরলপ্রাণে কাতর হয়ে তাঁকে ডাক। তিনি ত অহৈতুকীকৃপাসিন্ধু—করুণাবরুণালয়। তাঁর কত দয়া! তাঁর দয়ার শেষ নাই। বিশ্বাস করে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁকে ডাক্‌লে নিশ্চয়ই তিনি দেখা দেন। সরলভাবে তাঁকে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। "ডাক দেখি মন ডাকার মতন, কেমন মা তোর থাকতে পারে"—এ অতি সত্য কথা। একটিবার তেমন ভাবে তাঁকে ডেকে দেখ, নিশ্চয়ই তিনি দয়া করবেন।

'নাম' শব্দের অর্থ কি? "নমন্তি অর্থভাবেন" যাহা অর্থভাব দ্বারা নত হয় (অধিগত হয়, প্রাপ্ত হয়) তাহা 'নাম',—'নিরুক্তে' নাম শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। নামই বাক্। আবার "বাক্ বৈ বিশ্বজগৎ"। সুতরাং, এই নাম ছাড়িয়া আর কি করা যাইবে? নাম বা বাক্-এর পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। 'নামকীর্ত্তন' বলিতে কেবল নামের বৈখরী অবস্থার কীর্ত্তনই বুঝায় না। তুমি যখন জপ, ধ্যান বা জ্ঞানের বিচার কর, তখনও তুমি নামকীর্ত্তনই করিয়া থাক,—তখন

নামের মধ্যমা প্রভৃতি যে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থা সকল আছে, তুমি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাক মাত্র।

'নাম' বিশ্লেষ করিলে কি পাওয়া যায়? ধাতু—প্রত্যয়—বিভক্তি। 'ধাতু' কি বস্তু? ধাতু শব্দের অর্থ কি? 'ধা' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধাতু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ধা' ধাতুর অর্থ ধারণ করা, পোষণ করা; অতএব, যিনি সকলকে ধারণ করেন, পোষণ করেন, যিনি সকল ভাব-পদার্থকে সত্তা প্রদান করেন, তিনিই মূল ধাতু। তিনি কে?—তিনি ব্রহ্মই। শব্দের যাহা মূল, শব্দকে যাহা পোষণ করে, যাহা শব্দের রক্ষা সাধন করে, তাহাই শব্দের ধাতু। সুতরাং, নামের মধ্যেই সব আছে।

নামের সহিত অর্থের কি প্রকার সম্বন্ধ? জগৎপিতা শঙ্কর এবং জগজ্জননী পার্ব্বতী যেমন নিত্যসম্বন্ধ, সেইরূপ বাক্য বা নাম এবং তাহার অর্থ নিত্যসম্বন্ধ। ধর 'রাম' শব্দ। 'রম্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই যে 'রাম' শব্দ, বা পদ বা নাম বা বাক্য, ইহা 'দ্রব্য' পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন যেমন দ্রব্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনও তেমনি বলিয়াছেন,—দ্রব্য আর গুণ লইয়া 'নাম' হইয়াছে।

গুণ বা শক্তি এবং দ্রব্য, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? শক্তি (গুণ) এবং দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ নয়। দাহিকাশক্তি ব্যতিরিক্ত অগ্নি-পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় কি? যখন আমাদের 'শক্তি' এবং 'আধার' এই উভয়ের একসঙ্গে উপলব্ধি হয়, তখন আমরা বলি, 'অগ্নি দেখিতেছি'। শক্তি আর শক্তিমান একই বস্তু। শক্তি ছাড়িয়া শক্তিমান অথবা শক্তিমান ছাড়িয়া শক্তি কোথাও দেখা যায় না।

শক্তি থাকে কোথায়? শক্তি বা গুণ আধাররূপী নাম বা দ্রব্যে লীন থাকে; যখন অভিব্যক্ত হয় তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন। এই সগুণ ছাড়িয়া কে কবে কোথায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন ?

ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া নামে পৌছানই সকল উপাসনার মূল। সকল নাম বা শব্দই মূলতঃ ব্রহ্মবাচী ; কোন এক শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে শেষে গিয়া ব্রহ্মে পৌছিবেই। এই কথাটি বুঝাইবার নিমিত্ত 'ঐতরেয় আরণ্যক' একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—"তস্য বাক্‌তন্তি র্নামানি দামানি, তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভি র্দামভিঃ সর্ব্বং সিতং সর্ব্বং হীদং নামনি সর্ব্বং বাচাঽভিবদতি" (২-১-৩)। ইহার 'সায়ণ ভাষ্যে' বলা হইয়াছে,—"যথা বহুবলীবর্দ্দস্বামিনো বনিজন্তব্বন্ধনার্থা কাচিদ্রজ্জুঃ শঙ্কুদ্বয়ে বধ্বা প্রসারিতা ভবতি। তস্যাং রজ্জৌ প্রত্যেকং বন্ধনায় পৃথক্ পাশা ভবন্তি। এবং 'তস্য' প্রাণস্য 'বাক্‌তন্তিঃ' শব্দসামান্যং প্রসারিতদীর্ঘরজ্জুস্থানীয়ং দেবদত্ত-যজ্ঞদত্ত-'নামানি' 'দামানি' দামস্থানীয়ানি, 'তৎ' তথাসতি 'অস্য' প্রাণস্য 'ইদং' সম্বন্ধিন্যা 'বাচা' বাক্‌সামান্যরূপয়া দীর্ঘ 'তন্ত্যা' 'নামভিঃ' নামবি 'র্দামভিঃ' 'সর্ব্বমিদং' স্থাবরজঙ্গমরূপং অভিধায়কে 'নামনি' 'সিতং' ব্যবস্থিতমিতি লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ। অতএব 'সর্ব্বং' বস্তু উদ্দিশ্য, সর্ব্বোঽপি পুরুষঃ 'বাচা' তত্তন্নাম্না 'অভিবদতি'। যদীয়েন নাম্না পুরুষমাকারয়তি স এব পুরুষো, রজ্জু বন্ধনেনাকৃষ্ট ইব সহসা আগচ্ছতি"। ইহার ভাবার্থ এই যে,—এক বলীবর্দ্দ স্বামীর বহুসংখ্যক বলীবর্দ্দ ছিল। সকলের সহিত সমকালে সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত তিনি নিজহস্তে এক মূলরজ্জু সংলগ্ন করিয়া রাখিতেন, এবং সেই মূলরজ্জুর সহিত অনেক শাখারজ্জু সংলগ্ন করা ছিল। এই সকল শাখারজ্জুর অন্তভাগসকলের সহিত বলীবর্দ্দগুলি সংযুক্ত ছিল। বলীবর্দ্দস্বামীকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত শাখারজ্জু টানিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ, শাখারজ্জুগুলি মূলরজ্জুর সহিত সম্বদ্ধ থাকাতে শাখা-রজ্জুতে টান পড়িলেই মূলরজ্জুতে টান পড়িত। সেই প্রকার, কোন

এক বেদোক্ত বা সাধুশব্দের অর্থ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী প্রভৃতি অবস্থা পার হইয়া গিয়া শেষে পরব্রহ্মে পৌঁছিবেই। কোন এক নাম-রজ্জু ধরিয়া টান দাও, মূলরজ্জুতে টান পড়িবে, উত্তর আসিবে,—"কি চাহিতেছ ?"

শিবনাম, দুর্গানাম, কালীনাম, রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম, এ সকল নামের সার্থকতা কি ? এক নামে ও অন্য নামে পার্থক্য কি ?—'কাল' শব্দ ভগবদ্বাচক, স্ত্রীলিঙ্গে 'কালী'। বিভেদ কি ? মূলতঃ কিছুই নয়। তুমি যাহাতে ডাক, তাহাতেই দেখা দিবেন। তুমি 'কালী' বলিয়া ডাক, স্ত্রীরূপে দেখা দিবেন, 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাক, পুরুষরূপে দেখা দিবেন। বেদে (শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ) কালকে স্তব করা হইয়াছে— "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ"—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ ; তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। বিশ্বতোমুখ তুমি ! তুমি মায়া অবলম্বনে যেন জাত হইয়া জরাজীর্ণমত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ডগ্রহণ করিয়া যাতায়াত কর— ইহাই তোমার বঞ্চনা। 'বাক্যপদীয়'তে ভর্ত্তৃহরি এই কারণে বলিয়াছেন— "নিয়তং সাধনে সাধ্যং ক্রিয়া নিয়তসাধনা। সন্নিধানমাত্রেণ নিয়মঃ সন প্রকাশতে ॥" অর্থাৎ যাদৃশ রূপাভিব্যক্তিতে যাদৃশ সাধনের প্রয়োজন, যে ভাবসিদ্ধির জন্য যেরূপ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব পরিস্পন্দনের (Vibratory motionএর) মেলন অর্থাৎ সংঘাত (Aggregation) আবশ্যক, তাহা নিয়ত (স্থির) আছে।

সাধনায় রূপভেদ হয় কেন ? হিন্দুজাতি একদিন জগৎস্বামীকে ভাল বাসিয়াছিল, তাই জগৎস্বামীর যাহা কিছু সকলই তার প্রিয় ছিল। হিন্দু-জাতি সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে জগৎস্বামীর সম্বন্ধ জানিয়াছিল। এই জাতি নগরকে প্রণাম করিত, গ্রামের কাছে প্রার্থনা করিত, গঙ্গা যমুনাকে প্রণাম

করিত, আকাশ, বায়ু, সাগর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, মাটি সকলকে ভালবাসিত—সকলেই তার স্বামীর প্রিয় বস্তু বলিয়া। হিন্দুজাতি প্রকৃতিকে ভালবাসিত—প্রকৃতির প্রতি বস্তুকে ভালবাসিত। হিন্দুজাতি জানিয়াছিল—"আনন্দচিদ্‌ঘনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্" (শৈবাগমে) সেই আনন্দজ্ঞানঘন জগৎস্বামীই সর্ব্বশক্তিমান অর্থাৎ তিনি "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ" তিনি কোন কিছু করিতে বা না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ,—এই জগৎস্বামীই প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়া জগৎরূপে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—নরনারীরূপে সাজিয়াছেন, এই নরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তি, এই আকাশ, সাগর, নদী, পর্ব্বত, তরুলতা, চন্দ্রসূর্য্য, তারকা, পুষ্প প্রভৃতি—আহা "জগচ্চিত্র-চিত্র-দর্পণরূপিণী পরচিন্ময়ী কারণানন্দরূপিণী" তিনিই রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—হিন্দুজাতি একদিন ইহা জানিয়াছিলেন। জানিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন—"যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি" যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা জগৎস্বামীই সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছেন। জগৎস্বামীই বিশ্বাকারে ধরা দেন। এই জগচ্চিত্র-চিত্রদর্শনরূপিণী জগদম্বাকে হিন্দু জানিয়াছিলেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি"—ইনি সচ্চিদানন্দরূপিণী, ইনি জগৎ-প্রতিবিম্ব মাখিয়া জগৎমূর্ত্তি। এই প্রকৃতিরূপধারী ভগবানের যত বহির্ম্মুখী অবস্থা হয়, ততই ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হয়। একই ভগবান্ পৃথক পৃথক্ ভাবনা দ্বারা ভিন্ন হইয়া থাকেন। ইষ্টের রূপভেদ উপাসকের প্রকৃতিভেদ অনুসারে হইয়া থাকে। সেইজন্যই দীক্ষার ভেদ হইয়াছে। যাহার প্রকৃতিতে ভগবানের যে রূপ ভাল লাগে, যে লীলা ভাল লাগে, তাহাকে সেইরূপ দীক্ষা দিতে হয়। তাহার পর সাধনা করিতে করিতে যখন সাধক অগ্রসর হইয়া যায়, তখন আর ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাকে নিজ প্রকৃতি (পূর্ব্বসংস্কার) অনুযায়ী সাধনা করিতে হইবে।

নাম কোন্ পদার্থ? ভগবান্ এবং তাঁহার নাম এই দুইয়ে সম্বন্ধ কি? নামই রূপে পরিণত হয়। ভগবানের নাম জপ করিতে করিতেই তাঁহার রূপদর্শন হয়। রূপ যাহা, তাহা পূর্ব্বে নামেই বিদ্যমান থাকে; নাম দ্বারাই নামীর কাছে পৌঁছান যায়। 'বাক্যপদীয়' টীকাতে বলা হইয়াছে—"০০০ বাগেবাবিভাগাপন্না গবাদিরূপেণাবতিষ্ঠতে। গবাদয়শ্চ বাহ্যার্থবিভাগাঃ পুনঃ.শ্রুতিরূপত্বেন পরিণমন্তে। অতএব শব্দার্থয়োঃ কার্য্য-কারণভাবসম্বন্ধ ইত্যেকে। শ্রুতিরপি—'নামেদং রূপত্বেন চ বৃত্তরূনং চেদং নামভাবেন তস্থে'। একে তদেকমবিভক্তং বিভেজুঃ প্রাগেবান্যে ভেদরূপং বদন্তি।" ইহার ভাবার্থ এই যে,—গবাদিশব্দই গবাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকে। এই বিশ্বজগৎ সূক্ষ্ম বেদরূপা 'বাক্' এরই প্রকটিত রূপ; (স্থূল, প্রকটিত) রূপ যাহা, তাহা আবার (প্রলয়কালে) নামে পর্য্যবসিত হয়, সূক্ষ্ম বাগাত্মাকে লীন হয়। যে রূপ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তাহা পূর্ব্বে নাম-ভাবে বিদ্যমান থাকে—বীজে যেমন অঙ্কুরাদি বিদ্যমান থাকে। যে নিয়মে দৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করিয়া থাকে, সেই নিয়মেই যথাছন্দে, যথাস্বরে উচ্চরিত দেবতার নাম দেবতার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। তবে জপ যথাছন্দে হওয়া চাই, নাম শাস্ত্রপ্রোক্ত হওয়া চাই, জপ 'দশ নামাপরাধ'-বর্জ্জিত হওয়া চাই।

দশপ্রকার নামাপরাধ কি কি?—(১) সৎপুরুষের নিন্দা. (২) শিবনাম ও বিষ্ণুনামে উচ্চ-নীচ ভাবনা [শাস্ত্র বলিতেছেন—"যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্। যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥ যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্। যে রুদ্রং নাভি জানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥" (রুদ্রহৃদয়-উপনিষৎ)], (৩) শ্রীগুরুদেবের অপমান, (৪) বেদাদি শাস্ত্র- সমূহের অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) 'ভগবানের নামের যে এরূপ মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, ইহা কেবল

স্তুতিমাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নামের এরূপ মহিমা নাই'—এইভাবে ভগবানের নামে অর্থবাদের কল্পনা করা, (৬) 'ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে পাপের নাশ হয়ই হয়, কাজেই পাপ করিয়া ভগবানের নাম নিলে পাপ নষ্ট হইয়া যাইবেই, পাপ আমার কি করিবে?'—এইভাবে ভগবানের নামের আশ্রয় নিয়া নামের বলে পাপ করা, (৭) যজ্ঞ, তপ, দান, ব্রত আদি শুভকর্ম্ম সমূহকে ভগবানের নামের সমান বিচার করা, (৮) শ্রদ্ধাহীন ও শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে নামের উপদেশ দান, (৯) নামের মহিমা শুনিয়াও নামে প্রীতি না করা, এবং (১০) 'আমি' ও 'আমার' মোহে ডুবিয়া বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়া।—এই দশটি নাম-অপরাধ। নাম-অপরাধ হইতে মুক্তি, 'আর অপরাধ করিব না' এইরূপ অনুশোচনাপূর্ব্বক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া, নাম-জপ ও কীর্ত্তন দ্বারাই হয়। নিরন্তর ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিলে সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অনেকের ধারণা, নামজপরূপ সাধনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে, ইহা চৈতন্যদেবের সময় হইতেই বিশেষভাবে জ্ঞাত।—এই ধারণা নির্মূল। নামজপরূপ সাধনা বেদেও আছে; ঋগ্বেদ দ্বিতীয় অষ্টকের ('মন্ত্র ৩৭, ঋক্‌সূক্ত ৫৬') এই মন্ত্রই তাহার প্রমাণ—"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তনমহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥" ইহার অর্থ—হে স্তোতাগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে আপনারা যেরূপ জানেন, সেইরূপেই স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করুন। বিষ্ণুর নাম জানিয়া অর্থাৎ নামের মহিমা জানিয়া তাঁহার 'নাম' কীর্ত্তন করুন। হে বিষ্ণু! আপনি মহানুভব, আপনার সুবুদ্ধির আমরা উপাসনা করি॥

ঐতরেয় আরণ্যকের "তস্য বাক্‌তন্তি র্নামানি দামানি" ইত্যাদি বচন ও ইহার প্রতিপাদক। "কলিসন্তরণোপনিষৎ" কে ত নামজপোপনিষৎই বলা যাইতে পারে।

ভগবান্ ভগবান্ যে লোকে করে, এই ভগবান্ কোথায়? ভগবান্ অনলে অনিলে নীলনভস্তলে সাগরে পর্ব্বতে তরুলতায় গগনে ভুবনে সর্ব্বত্র আছেন সত্য—সমস্তই তাঁহার উপরে ভাসিয়াছে সত্য—সর্ববত্র তাঁহাকে স্মরণ করায় সুখ আছে সত্য কিন্তু **তাঁহাকে ধরিতে হইবে মনের ভিতরে।** মন যাঁহার উপরে ছুটিতেছে, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, মনের ছুটাছুটি বন্ধ করা চাই। তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—কেবল একটা চঞ্চলতাই ইহাকে শান্ত জল হইতে ভিন্ন করিয়া তরঙ্গ নামে অভিহিত করিতেছে। এই চঞ্চলতা দূর কর, যাহা চাও পাইবে।

নিবৃত্তি-মার্গে যাইবার উপায় হইতেছে, সত্যবস্তু গ্রহণ এবং অসত্যবস্তু ত্যাগ। সত্যের গ্রহণ আদৌ কঠিন নহে কিন্তু মিথ্যা-ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে, পরে মিথ্যাকে অজস্র উপেক্ষা করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। আত্মাই সত্য—আর সমস্তই যাহা "দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" সমস্তই মায়া-কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। একেবারে তাড়াইতে না পার, সব মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য কর আর সঙ্গে সঙ্গে সত্য যাহা ধরা আছে, তার নাম ঘন ঘন কর—একসঙ্গে দুইই চলুক। তখন মন নষ্ট হইয়া যিনি আছেন, তাঁহাতে স্থিতি হইবে।

নাম যে করা হয়, এই নামই অখণ্ড চৈতন্যের নাম। অখণ্ড চৈতন্যকে ভাবিতে ভাবিতে নাম কর। নামের সঙ্গে রূপ—অরূপের রূপ ইহা। নাম, রূপের সঙ্গে গুণ, লীলা আছে। এই সব চিন্তা নামীর ভাবনার সুবিধার জন্য। নাম, রূপ, গুণ, লীলা—এই সমস্ত ভাবনা,

স্বরূপ ভাবনার জন্য। স্বরূপ ভাবনা যে যত ভাল করিয়া করিতে পারিবে, সে ততই স্বরূপ-বিশ্রান্তির দিকে অগ্রসর হইবে। স্বরূপ-বিশ্রান্তির জন্যই এই মানব-দেহ-ধারণ। ভিতরে স্বরূপ ভাবিয়া ভিতরে স্থির হইয়া যাও, বাহিরের কর্ম্ম করিয়াও কখন স্বরূপচ্যুতি হইবে না।

সমুদ্র সর্ব্বদাই উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তরঙ্গ ভুলিতে হইবে। গতিশীল জগৎ নিরন্তর কত রঙ্গ করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তরঙ্গ ভুলিয়া স্থির সমুদ্র দেখিতে হইবে, জগৎ ভুলিয়া চলনরহিত আত্মাকে দেখিতে হইবে। কি করিয়া দেখিবে? আকাশ যেমন এক অচঞ্চল অবস্থায় স্থির আছে, কত মেঘ ইহাতে উঠে, কত বিদ্যুৎ চমকায়, কত বজ্র শব্দ করে, কিন্তু আকাশ একই থাকে,—সেইরূপ অখণ্ড আত্মা ভগবান্, তাঁহার এক অতি সূক্ষ্ম দেশে কত জগৎ উঠে, কত জগৎ নষ্ট হয়,—একমাত্র ভগবানের ভাবনায় দেখা যায় জগৎ নাই, তিনিই আছেন। মায়া আপনার বিচিত্র রচনা তাঁহাতে উৎক্ষেপ করিয়া তাঁহাকেই জগৎরূপে দেখাইতেছে। ভগবানের ভাবনায় সব ভুল করায় সমাধি। ভগবান্ নামী, তাঁহার ভাবনার সুবিধার জন্যই নাম অবলম্বন। জগৎ নাই বলিলে তুমি হাঁসিয়াই বাঁচ না। তুমি ভাব—এই উষা নাই, এমন চাঁদনী রাত নাই, এমন মলয় বাতাস নাই, এমন কোকিলের কুহুতান নাই! আহা, 'জগৎ নাই'-বাদীরা তোমাকে কতই হাঁসায়! সত্যই। জ্ঞানীর চক্ষে জগৎ নাই, বিচারবানের চক্ষে জগৎ অনির্ব্বচনীয়, আর অজ্ঞানীর চক্ষে জগৎ সত্য। তাঁর ভাবনা ভাবিয়া নাম কর; নাম করিতে করিতে দেহ ভুল হউক, জগৎ ভুল হউক, সব হইল।

এই নামের সাধনা বড় অপূর্ব্ব। পাপী তাপী জীবের এই নাম-সাধনাই উদ্ধারের উপায়। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলম্।

তেষং মধ্যে পরং নাম বশেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ ॥” শ্রদ্ধায়, বা হেলায়, যে কেহ এই নাম জপ করে, নামের সহিত নামী তাহারই হৃদয়ে বাস করেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ নাম-জপে প্রাণের উৎক্রামণ নিবারিত হয়, মরণ-বিভীষিকা ঘুচিয়া যায়। এই নামের বলে সাধক আপন অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, জন্ম-জন্মান্তরের অর্জ্জিত সংস্কার খণ্ডাইতে পারেন। নাম করিতে করিতেই নামীর কৃপা লাভ হয়। যখন আর কেহ থাকে না সেই অন্ধকারময় অসহায় পথে, নামই বৈতরণীপারের সহায় হয়,—নামই ভবপারের ভেলা, নামই দুর্ব্বলের বল।

এই সংসারের মিথ্যা অভিনয়ে আপনাকে না হারাইয়া, একমাত্র নিত্য চিরমধুর শ্রীভগবানের নিত্যমঙ্গল নাম, অনুরাগসহ জপ করিলেই, সকল সাধ আশা পূর্ণ হয়, এই নামরসে ভরিত হইয়া থাকিলে কোন অভাব আর থাকে না, এই নামের তলে অফুরন্ত রত্ন, সাধনসমুদ্রে ডুবিয়া, যত্ন করিয়া সে রত্ন আনিতে হয়। সে যে সাধনার ধন, সাধনালব্ধ বস্তু, বিনা সাধনে তাহাকে পাইবার উপায় নাই। বায়ু যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকল সময় অনুভব হয় না, পাখার বাতাস দ্বারা অনুভব হয়, —তেমনি সাধনা করিলে তবে নামের মধুর আস্বাদ লাভ হয়। গ্রহণ ভিন্ন কি বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়? জলের সহিত ঘর্ষণের দ্বারা যেমন চন্দনের সৌগন্ধ বিস্তারিত হয়, শ্রীভগবানের মৃতসঞ্জীবনী মধুর নামে, ভক্তিবারি সিঞ্চনে অবিরত জপিতে জপিতে, তবে মধুর রস প্রবাহিত হয়—তখনই ভক্তের মন প্রাণ মাতাইয়া তোলে। দিবানিশি এই নাম জপ করিতে পারিলে, ‘ক্ষুরের ধার’ সংসার হইতে, ‘চুলের সেতু’ দিয়া, শ্রীভগবান্ ভক্তকে হাতে ধরিয়া পার করিয়া দেন।

এইবার ভক্তশিরোভূষণ শ্রীভরতের প্রার্থনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। “ত্বন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব বাণী করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্”—হে প্রভো

শ্রীরাম! আমার কথা কেবল যেন তোমার নাম সংকীর্ত্তন করে, আমার কর্ণযুগল যেন তোমার অমৃত কথা সর্ব্বদা সেবন করে। আর করযুগল যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মের অর্চ্চনাতে নিযুক্ত থাকে, "শিরশ্চ তে পাদ-যুগপ্রণামং" আমার মস্তক যেন সর্ব্বদা ওই শ্রীচরণে লুণ্ঠিত থাকে—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আমি যেন তোমার সেবাতেই নিযুক্ত থাকি। "প্রপন্নং পাহি মাং রাম" আমি তোমার শরণাগত, আমায় রক্ষা কর। আমি যেন এইরূপে আমার আত্মারামে যুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বদা তোমার স্পর্শ স্মরণ করিয়া, মলিনতার শত ব্যবধান, সমস্ত অন্তরায় ঘুচাইতে পারি। তোমার নাম বিস্মরণই ত মরণ। তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে, প্রকৃতির শত কোলাহলেও, আপন শান্তস্বভাব হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥

——○:০:○——

সাধন-সহায়ের

শুদ্ধিপত্র

(ক)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫ — ১০	বঙ্গদশের	বঙ্গদেশে
৬ — ১৬	সর্ব্বোভ্যা	সর্ব্বেভ্যো
৯ — ৯	পঞ্চব্যক্ত্র	পঞ্চবক্ত্র
১২ — ১৭	সম্প্রদায়োৎস্ব	সম্প্রদায়োঽস্য
১২ — ২০	সুম্যনসং	সুমানসং
১৩ — ১৩	আম্নয়	আম্নায়
২১ — ৫	ঢাক	ঢাকা
২৬ — ৪	ভগবার্চ্চিন্তন	ভগবাচ্চিন্তন
২৭ — ২১	৬৪	২৪
৩২ — ৭	মাননীয়	মননীয়
৩২ — ১৮	বহিদ্দ ষ্টি	বহির্দ্দৃষ্টি
৩৬ — ৮	হর্দ্দি	হার্দ্দিক
৩৬ — ২১	সম্ভব্যতার	সম্ভাব্যতার
৩৭ — ১১	জীবনীর	জীবনী
৩৯ — ৪	সে	সে চেষ্টা
৪৬ — ১৩	আপৎকালে	আপৎকাল
৪৭ — ২২	বা,নাত্র	বাঽন্যত্র

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭ — ২২	শুভার্থিনঃ	শুভার্থিনা
৪৮ — ৩	গুরুর	ব্যক্তির
৪৯ — ৭	(৩)	(৪)
৬৬ — ৭	দ্যোৎয়তি	দ্যোতয়তি

৬৭ — ৩ হইতে 'সম্পূর্ণ' এই পদটি তুলিয়া দিতে হইবে।

(১)

সাধন-সহায়

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২ — ৪	ছক্র	চক্র
২১ — ১৩	আপনায়	অপানায়
২৬ — ১	যত্তু	যস্তু
২৯ — ৩	এন্‌ভেলোপ	এন্‌ভেলাপ্
৩৫ — ১৭	পৌরুষু	পৌরুষং
৩৬ — ৯	বিষ্ণুগুরু	বিষ্ণুগু´রু
৩৭ — ১২	বিষ্ণুগুরু	বিষ্ণুগু´রু
৩৯ — ৮	ভক্তিঃ	ভক্তি-
৪০ — ৪	আচার্য্যবান	আচার্য্যবান্
৫৩ — ২০	দাসত্বং	দাসত্বং দদাতি

(২)

কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের চিহ্ন

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮ — ১৮	মুচ্ছা	মূর্চ্ছা
৭১ — ৬	সুষ্ট	সুস্পষ্ট

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭ — ৫	বিকাশ),	বিকাশ), কম্প,
৭৯ — ৩	বৈধ	বেধ
৮১ — ১২	১০৮	১০০৮
৯৩ — ১৭	বায়	বায়ু
১০৪ — ৬	বিষাদ	বিবাদ
১০৫ — ৮	গুরূকে	গুরুকে
১০৫ — ৯	পূ্র্ব্ব	পূর্ব্ব
১০৫ — ১৬	হহতে	হইতে
১১০ — ১৭	যতি	যতিঃ
১১১ — ১৬	গুর্ব্বত্বীন	গুর্ব্বধীন
১১৪ — ১৫	অস্তিক	আস্তিক
১১৫ — ২	২৪১	২।২৪১
১১৯ — ১৪	দ্র	শূদ্র

(৩)

“প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব”

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৯ — ৬	(ইচ্ছায় ।	(ইচ্ছায়)
১৩১ — ১৩	সংযোগা	সংযোগো
১৩২ — ১	ব্র-হ্মচর্য্য	ব্রহ্মচর্য্য
১৩২ — ৪	যম পঞ্চক	যমপঞ্চক

(৪)

“বিমুক্তি বা মোক্ষ”

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৬ — ১৫	আত্মনং	আত্মনঃ

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৯ — ১০	কলাম	কলাম্
১৫০ — ৯	যেমনি	তেমনি
১৫২ — ১৩	?	;
১৫৭ — ৪	তদ্ভবাভাবিতঃ	তদ্ভাবভাবিতঃ
১৬০ — ৩	বিদ্য	বিদ্যা
১৬০ — ৫	।	ভালই করিবে,
১৬৩ — ৩	সমুদ্ধ,দ্ধ	সমুদ্ব,দ্ধ
১৬৩ — ১৮	সংবরণ	সংচরণ
১৬৭ — ১৯	।	—
১৭৩ — ১২	মমারম্ভং	মনারম্ভং
১৭৩ — ২০	হৃদয়স্থ ও	হৃদয়স্ত ও
১৭৯ — ১৫	হইবে, যে	হইবে যে,
১৮৫ — ১৯	ভগবান্	ভগবন্ !

(৫)

"মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য"

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯০ — ১৮	নৃষু	নৃষু
১৯৩ — ৯	অসিয়া	আসিয়া
১৯৫ — ৫	অভ্যাসবত	অভ্যাসরত
২০৫ — ৮	বাত্তা	বাত
২০৬ — ১৮	মনং	মনঃ
২০৮ — ১৪	রসাস্বাদাং	রসাস্বাদাৎ

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৯ — ২১	হরি	হরিঃ
২১৪ — ১	দুঃখেঃ	দুঃখে

"উপাস্য—ধ্যান ও স্মরণের বস্তু"

(৬)

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৩ — ৯	সবিতু	সবিতুর্বরেণ্যং
২২৩ — ১০	র্ভর্গো	ভর্গো
২২৩ — ১৩	ন	নঃ
২২৭ — ৭	তদ্বণ্ডিকে	তদ্বন্তিকে
২৩১ — ৩	ন	না
২৩১ — ৮	স্মৃতা	স্মৃত্বা
২৩১ — ২০	স্বমহম্নি	স্বমহিম্নি
২৩২ — ১৮	স্পন্দশক্তি	স্পন্দশক্তি
২৩৪ — ২১	গুরোমূর্ত্তি	গুরোর্মূর্ত্তি
২৩৭ — ১৩	না।	,কখন থাকে না।

৭

নাম-সাধন

পৃষ্ঠা—পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪২ — ১৪	ক্রিয়াতে	ক্রিয়তে
২৪৩ — ৯	(অঃ বাঃ)	(অঃ রাঃ

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদি সকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ, স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥" ২

—শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য।

—ইহলোকে যে ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়।

"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥" ৬

—শিক্ষাষ্টক

—যে ব্যক্তি নামের বলে পাপে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 'হরিনাম যখন সর্ব্বপাপ ধ্বংস করে, তখন নাম নিলেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে' এইরূপ জ্ঞানে যে ব্যক্তি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অথবা 'আমি এত হরিনাম করিতেছি, পাপে আর আমার কি করিবে?' এইরূপ ভাবনায় যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে থাকে—তাহারা চিরকাল যম যাতনা ভোগ করিলেও, তাহাদের শুদ্ধি হয় না।

"ক্ষত্র-বিট-শূদ্র-জাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ।"

—নারদপঞ্চরাত্র

—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তির প্রতিলোমক্রমে দীক্ষাদান কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ নীচ বর্ণের ব্যক্তির উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে মন্ত্রদান করা উচিত নহে (যেহেতু এইরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য এই-প্রকার গুরু ও শিষ্য উভয়পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে হানিকর)। অতএব, শাস্ত্রোক্তবিধি অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য—"তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।" (নারদ পঞ্চরাত্র)।

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ লিখিত গ্রন্থপঞ্চক—

১। সাধন-সহায় ৩৲

২। 'সাধন-সহায়' পরিশিষ্ট ১৲

৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ||০

যন্ত্রস্থ { ৪। জগতের মূলকারণ ২৲

৫। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲ }

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসত্যেন্দ্র প্রকাশ রায়

২৩নং রুস্তমপুর, গোরক্ষপুর।